জীবনবৃত্তান্ত

ড. উম্মে বুশরা সুমনার জন্ম গাইবান্ধার হাতিয়া গ্রামে, তার নানা বাড়িতে। পিতা মুহম্মদ মকবুল হোসেন আর মাতা নুরজাহান আক্তার। শিক্ষক পিতার অনুপ্রেরণাতেই তার লেখালেখির যাত্রা শুরু। পৈতৃক বাড়ি গাইবান্ধার ফুলছড়ি থানার ঘাঘট নদীর পার্শ্ববর্তী 'হোসেনপুর' গ্রামে। শৈশব কৈশোরের অনেকটা সময় কেটেছে এই গ্রামে। গাইবান্ধা সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে সাত বিষয়ে লেটারসহ স্টার মার্কস নিয়ে এস.এস.সি এবং গাইবান্ধা সরকারী মহিলা কলেজ থেকে চার বিষয়ে লেটারসহ স্টারমার্কস নিয়ে এইচ.এস.সি পাশ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী অনুষদে ভর্তি হন।

ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফোর্থ হয়ে মাস্টার্স পাশ করেন এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী অনুষদের ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী ও ফার্মাকোলজী ডিপার্টমেন্ট থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। পেশায় তিনি একজন শিক্ষিকা। বর্তমানে একটি বেসরকারী ইউনিভার্সিটির ফার্মেসী ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য আর ধর্মের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে ক্লাস এইটে পড়া অবস্থায় ডেইলি স্টার পত্রিকার 'রাইজিং স্টার' পাতায় তার লেখা ক্ষুদে গল্প প্রকাশিত হয়। এরপর পড়াশুনার ব্যস্ততায় আর তেমন লেখা হয়ে উঠে না। পি.এইচ.ডি ডিগ্রী শেষ করে তিনি আবার লেখায় মনোনিবেশ করেন। দৈনিক যুগান্তর, ইত্তেফাক, নয়া দিগন্ত, বাংলাদেশ প্রতিদিন, জনকণ্ঠসহ বেশ কিছু জাতীয় পত্রিকায় আর ব্লগে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের উপর তার লেখা কলাম এবং গল্প প্রকাশিত হয়। 'বলয় ভাঙার গল্প' তার লেখা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গল্পে ভরা প্রথম গল্পগ্রন্থ। এই সমাজের মানুষদের আরোপিত রীতি নীতি, কুসংস্কার আর কুপ্রথার বলয় ভাঙার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ফুটে উঠেছে এই গল্পগ্রন্থে।

"সমাজের মানুষদের আরোপিত রীতি নীতি, কুসংস্কার আর কুপ্রথার হাজার বৃত্তের শৃঙ্খলে আমরা বন্দী। সমাজ কী বলবে, লোকে কী বলবে, সেই ভয়ে আর এই অন্ধকারের বলয় ভাঙা হয়ে উঠে না। তবুও স্রোতের বিপরীতে হাঁটা কিছু সাহসী মানুষ এই বলয়ের শৃঙ্খল ভেঙে আলোতে আসার চেষ্টা করেন। তারা কী আদৌ পেরেছেন এই বলয় ভাঙতে?"

বলয় ভাঙার গল্প

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

দ্বিতীয় সংস্করণ

বলয় ভাঙার গল্প

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

এক গুচ্ছ ছোট গল্পের মাধ্যমে এ সমাজের কুপ্রথা, কুসংস্কার, বিভিন্ন অসংগতি, পুঁজিবাদ, ভোগবাদিতা, ভারসাম্যহীনতা, নারীর প্রতি অবিচার, ভিন্ন সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আঘাত হানা হয়েছে। মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দ আর টানা-পোড়নের সত্য কাহিনীগুলো গদ্যশিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। প্রতিটি গল্প শেষে টিকা আকারে কুরআন আর হাদিসের কোটেশন গল্পগুলোকে শিক্ষণীয় করে তুলেছে। একেকটি গল্প একেক ধরনের বার্তা বহন করেছে। প্রতিটি গল্প পড়া শেষে মনে দাগ কাটবে, নিজের ভিতরেও জেগে উঠবে বলয় ভাঙার প্রয়াস। 'বলয় ভাঙার গল্প' এই গল্পগ্রন্থ পড়ার মাধ্যমে আপনিও এই বন্দী বলয় ভেঙে বেরিয়ে একজন আলোকিত মানুষ হতে পারেন।

প্রকাশক
মোঃ মোস্তফা

বলয় ভাঙার গল্প

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

ভূমিকা

“এক গুচ্ছ ছোট গল্পের মাধ্যমে এ সমাজের কুপ্রথা, কুসংস্কার, বিভিন্ন অসংগতি, পুঁজিবাদ, ভোগবাদিতা, ভারসাম্যহীনতা, নারীর প্রতি অবিচার, ভিন্ন সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আঘাত হানা হয়েছে। মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দ আর টানা-পোড়নের সত্য কাহিনীগুলো গদ্যশিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। প্রতিটি গল্প শেষে টিকা আকারে কুরআন আর হাদিসের কোটেশন গল্পগুলোকে শিক্ষণীয় করে তুলেছে। একেকটি গল্প একেক ধরনের বার্তা বহন করেছে। প্রতিটি গল্প পড়া শেষে মনে দাগ কাটবে, নিজের ভিতরেও জেগে উঠবে বলয় ভাঙার প্রয়াস। ‘বলয় ভাঙার গল্প’ এই গল্পগ্রন্থ পড়ার মাধ্যমে আপনিও এই বন্দী বলয় ভেঙে বেরিয়ে একজন আলোকিত মানুষ হতে পারেন।“

বলয় ভাঙার গল্প

ড. উম্মে বুশরা সুমনা

লেখক পরিচিতি

ড. উম্মে বুশরা সুমনার জন্ম গাইবান্ধার হাতিয়া গ্রামে, তার নানা বাড়িতে। পিতা মুহম্মদ মকবুল হোসেন আর মাতা নুরজাহান আক্তার। শিক্ষক পিতার অনুপ্রেরণাতেই তার লেখালেখির যাত্রা শুরু। পৈতৃক বাড়ি গাইবান্ধার ফুলছড়ি থানার ঘাঘট নদীর পার্শ্ববর্তী 'হোসেনপুর' গ্রামে। শৈশব কৈশোরের অনেকটা সময় কেটেছে এই গ্রামে। গাইবান্ধা সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে সাত বিষয়ে লেটারসহ স্টার মার্কস নিয়ে এস.এস.সি এবং গাইবান্ধা সরকারী মহিলা কলেজ থেকে চার বিষয়ে লেটারসহ স্টারমার্কস নিয়ে এইচ.এস.সি পাশ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী অনুষদে ভর্তি হন। ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফোর্থ হয়ে মাস্টার্স পাশ করেন এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী অনুষদের ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী ও ফার্মাকোলজী ডিপার্টমেন্ট থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারী ইউনিভার্সিটির ফার্মেসী ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন।

ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য আর ধর্মের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে ক্লাস এইটে পড়া অবস্থায় ডেইলি স্টার পত্রিকার ‘রাইজিং স্টার’ পাতায় তার লেখা ক্ষুদে গল্প প্রকাশিত হয়। এরপর পড়াশুনার ব্যস্ততায় আর তেমন লেখা হয়ে উঠে না। পি.এইচ.ডি ডিগ্রী শেষ করে তিনি আবার লেখায় মনোনিবেশ করেন। দৈনিক যুগান্তর, ইত্তেফাক, নয়া দিগন্ত, বাংলাদেশ প্রতিদিন, জনকন্ঠসহ বেশ কিছু জাতীয় পত্রিকায় আর ব্লগে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের উপর তার লেখা কলাম এবং গল্প প্রকাশিত হয়। ‘বলয় ভাঙার গল্প’ তার লেখা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গল্পে ভরা প্রথম গল্পগ্রন্থ। এই সমাজের মানুষদের আরোপিত রীতি নীতি, কুসংস্কার আর কুপ্রথার বলয় ভাঙার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ফুটে উঠেছে এই গল্পগ্রন্থে।

প্রকাশক
মো. মোস্তফা
জ্ঞান বিতান প্রকাশনী
১৬/১৭ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

Contact: 01638297301
bushra3march@gmail.com
fb.com/sumona.bushra

প্রথম প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০১৮
দ্বিতীয় প্রকাশকাল
জুলাই ২০১৯

স্বত্ব
লেখক

কম্পোজ
রাবেয়া কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স

পরিবেশক
আলীগড় লাইব্রেরী

শরঈ সম্পাদনা
ডঃ মোঃ আব্দুস সামাদ

প্রচ্ছদ
সানজিদা সিদ্দিকী কথা

মুদ্রণ
আমানত প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

উৎসর্গ

"নিশ্চয়ই **আমার** নামায, **আমার** কুরবানী, **আমার জীবন** ও **আমার** মরণ সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য"

সূরা আনআম : ১৬২

mwPcÎ

১. দুই মেরুর দুই বাবা # ০৯

২. ঘর ভাঙানিয়া মানুষেরা # ১৪

৩. দহন # ২২

৪. কৃষ্ণকলি# ৩২

৫. দুঃখবিলাসী # ৪২

৬. ব্যভিচারিণী ও একজন পবিত্র সখিনা # ৫০

৭. ছেলেপক্ষ বনাম মেয়েপক্ষ # ৫৬

৮. নীল সময় # ৬১

৯. অপরাজিতা # ৬৭

১০. সবুজ শাড়ি # ৭৩

১১. খিলাড়ি # ৭৯

১২. রত্নগর্ভা # ৮৫

১৩. সখী ভালোবাসা কারে কয় # ৮৮

১৪. ভালোবাসা সঞ্চয় # ৯৬

১৫. রুমা ও শ্রমিক দিবস # ১০২

১৬. যৌতুকের কৌতুক# ১০৬

১৭. নারী দিবস # ১১১

১৮. কোরবানি # ১১৫

১৯. রুই আর পুঁটি মাছের গল্প # ১২০
২০. একটি মধুর প্রেম কাহিনী এবং অতঃপর # ১২৭
২১. প্রথা ভাঙার বিয়ে # ১৩৩
২২. সায়িমের সিয়াম উদযাপন # ১৪৬
২৩. তনুর বাড়ি # ১৫১
২৪. স্বাদ # ১৬২
২৫. প্রথা ভাঙবেই # ১৬৯
২৬. আমাদের বাবু ও বই # ১৮০
২৭. রত্ন না হৃদয় কাটা কাঁচ # ১৮৬
২৮. ক্ষমা # ১৯৪

দুই মেরুর দুই বাবা

বন্ধুর বিয়েতে আজ ও বরিশাল যাবে, জানের দোস্ত এর বিয়ে বলে কথা, কত আয়োজন। সব বন্ধুরা একই রকম পাঞ্জাবি কিনেছে, গায়ে হলুদ, বিয়ে, বউভাত মিলে অফিস থেকে সাত দিনের ছুটি মঞ্জুর করে নিয়েছে। কিন্তু কয় দিন ধরে মুনিয়াটা তো শ্বাসকষ্টে ভুগছে, তবুও কি ও যাবে?

এর আগেও বাচ্চাটা অবশ্য অসুস্থ হয়েছিল। ওর কোনো খেয়ালই নেই। চাকরি, বন্ধু, আড্ডা, খেলা এসব নিয়েই ব্যস্ত, ৯-৫ টা অফিস, তারপর হয় বন্ধুদের সাথে আড্ডা, নয় তো খেলা দেখা, এক ছাদের নিচে দুইজনের বসবাস, তবুও যেন অনেক দূরে তাদের বাস।

এসবই ভাবছিল সাথী, হঠাৎ হেলালের ডাকে সে চমকে উঠল।

'শুনছ, আমার ব্যাগ টা একটু গুছিয়ে রেখ, আজ রাতেই আমরা যাচ্ছি।'

'মুনিয়াটার যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তবুও তুমি যাবে?'

'ও কিছু হবে না, খুব বেশি হলে হাসপাতালে নিয়ে যেও, এটিএম কার্ড রেখে যাচ্ছি। টাকা লাগলে খরচ করো।

হেলালের খুব তাড়াহুড়া, লঞ্চ ধরতে হবে, যাওয়ার সময় মেয়েটার কাছ থেকে বিদায়ও নেয়া হলো না। পূর্ণিমার রাত, অদ্ভুত সুন্দর চাঁদের আলো লঞ্চের ছাদে ছড়িয়ে পড়েছে, লঞ্চে সব বন্ধু মিলে গল্প আর গানের আসর জমিয়ে ফেলেছে। ব্যাপক মজা চলছে, হেলালের ফোনটা অনবরত বেজেই চলছে। মোবাইলটা সাইলেন্ট করে রাখল, ফোন ধরলেই ঘ্যান ঘ্যান, একটুও এনজয় করতে দেয় না। বউ এর বাজারের লিস্ট, ঘ্যান ঘ্যানানি, বাচ্চার কান্না, চিৎকার এসব আর ভালো লাগে না। বন্ধু, মাস্তি একসাথে ঘোর ফিরো, মজা করো, লাইফটা কত এনজয়াবল, বয়স তো মাত্র আটাশ, এখন নয় তো, কখন?

মুনিয়ার শ্বাস কষ্ট বাড়ছে। হায় আল্লাহ, এত রাতে একা কোন হসপিটালে যাব, ওর বাবা তো ফোনও ধরছে না। একটু পরামর্শ করতেও পারছি না, মুনিয়ার ফরসা মুখটা যেন কালো হয়ে উঠছে, কষ্টে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'এইতো মা, ভোর হলেই আমরা ডাক্তার আঙ্কেলের কাছে যাব, তুমি ভালো হয়ে যাবে। দেখো, কী সুন্দর চাঁদের আলো, দেখো, বারান্দায় যাবে? ওখানে সুন্দর বাতাস, তুমি চেয়ারে বসে গায়ে আলো মাখবে। আমি গান গাইব আর তুমি বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবে। ঠিক আছে মা, সোনামনি আমার।'

সকালেই মুনিয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো। এত বাতাস, তবুও মুনিয়া নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। অক্সিজেন মাস্কেও কাজ করছে না, ছোট্ট বুকটা উঠা নামা করছে। হে আল্লাহ্, তুমি ওর কষ্ট দূর করে দাও, আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না। সকাল ১১ টায় মুনিয়ার সব কষ্ট দূর হলো, ছোট্ট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুক্তি পেল।

দুপুর ৩টায় বাসা ভর্তি মানুষ,হেলালের সব বন্ধু, কলিগ, আত্মীয়, প্রতিবেশী আরও কতজন এসেছে। হেলালের চোখে পানি, বুকটা খাঁ খাঁ করছে, অপরাধ বোধও কাজ করছে। শুধু সাথী নির্বিকার, এক ভাবি ওকে কাঁদানোর চেষ্টা করছে। ওর শূন্য চোখ দুটি কাকে যেন খুঁজছে। হঠাৎ একজন কে দেখে ও পাগলের মতো ছুটে গেল। একজন সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত সাদা শশ্রু মন্ডিত বয়স্ক মানুষকে জড়িয়ে ধরে ও কাঁদছে।

লোকটা হাতের ব্যাগ ফেলে দিয়ে ছোট্ট মেয়ের মতো সাথীকে আদর করছে, চোখ মুছে দিচ্ছে, কপালে

চুমু দিচ্ছে, ফিসফিস করে বলছে, তুই তো ভাগ্যবতী, তুই তো জান্নাতির মা, ধৈর্য ধর মা, আল্লাহ যে তোকে ভালোবেসে পরীক্ষা করেছেন, সহ্য কর, উত্তম প্রতিদান পাবি, আর কাঁদিস না, মা আমার।

পাঁচ দিন পরের কথা। আজ সাথীর বাবা গ্রামে চলে যাবে। বের হবার সময় দেখে তার ব্যাগের পাশে আরেকটা ব্যাগ।

'বাবা, আমিও যাব তোমার সাথে।'

হেলাল কী যেন বলতে যাচ্ছিল, সাথীর বাবা তাকে থামিয়ে বললেন, 'বাবা হেলাল, আমি আমার মেয়েকে একাই বড় করেছি, ওর সব কষ্ট, দুঃখ আমি এই বুকটাতে ধারণ করেছি, চাকরি, বন্ধু, আত্মীয় সব কিছুর উপরে আমি ওকে প্রাধান্য দিয়েছি, কারণ ও আমার আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত, কখনো আমি ওকে অবহেলা, অযত্ন করি নি। আমার এই হাত টা ধরলে ও নির্ভরতার শক্তি পাবে, এই হাত ধরেই ও একদিন হাঁটতে শিখেছিল, আজ আবার এই কঠিন সময়ে ও এই হাত ধরেই উঠে দাঁড়াতে পারবে ইনশাআল্লাহ, কারণ আমি যে ওর বাবা।'

প্রকাশকালঃ এই গল্পটি বাবা দিবস উপলক্ষে ১৮/৬/২০১৭ তারিখে দৈনিক নয়াদিগন্তে প্রকাশিত হয়।

টিকাঃ বাবা সন্তানের ভরণ পোষণ করবেন। তার আর কোনো দায়িত্ব নাই এটাই আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষদের ধারণা। অথচ, পরিবারের সামগ্রিক দায়িত্ব প্রধানত বাবার, মা তার সহযোগী মাত্র। বাবা হচ্ছেন একটি পরিবারের অভিবাবক, পরিচালক ও দায়িত্বশীল। তিনি যদি যথাযথভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তবে তাকে আল্লাহর কাছে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'পুরুষ তার স্ত্রী, পরিজন (সন্তান ও অধঃনস্ত) এর পরিচালক এবং এ দায়িত্ব

পালনের ব্যাপারে তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে’ (বুখারী)

আল্লাহ্ পিতাকে তার পরিবার পরিজনের শুধুমাত্র ইহকালীন শান্তির পথই নয় বরং পরকালীন শান্তির পথও তৈরি করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। একজন কর্তা অবশ্যই তার পরিবার-পরিজনকে ধর্মীয় শিক্ষা দিবে যাতে তারা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালা বলেন, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।’ (সূরাঃ আত তাহরীমঃ ৬)

এছাড়া সন্তানের পরিচয় দানের ক্ষেত্রেও নাম হবে পিতার, মাতার নয়। অনেক নারীবাদীরা দাবি করেন যে মা এত কষ্ট করে গর্ভধারণ, জন্মদান, দুগ্ধপান, সন্তান লালনপালন করেন অথচ বাবার নামে সন্তানের পরিচয় দেওয়া, মোটেই ঠিক নয়। কিন্তু যেহেতু সন্তানের ইহকালীন ও পরকালীন দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বাবাকে, সমস্ত দায়ভার বাবার। তাই পরিচয়ও হবে বাবার নামে, এটা খুব সাধারণ ক্যালকুলেশন।

যাদের কোনো পিতৃপরিচয় নাই তারাই মায়ের নামে পরিচিত হতে চায়। আমেরিকার ৪৩% শিশুর পিতৃপরিচয় নাই। এটা ওদের জন্য, মুসলিমদের জন্য নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালা বলেন, ‘তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহ্র কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু-বান্ধব হিসেবে গণ্য হবে।’ (সূরা আল আহযাবঃ ৫)

মেয়ে সন্তানেরাও বাবার নামে পরিচিত হবে। বিয়ের পরও পিতৃপরিচয় থাকবে। মিসেস অমুক কাফেরদের সৃষ্ট কালচার। আমাদের উপমহাদেশের অনেক মুসলিম নারী খৃষ্টানদের এই কালচার অনুসরণ করে থাকেন। বিয়ের পর নিজের নামের শেষে স্বামীর নাম বা পদবী ধারণ করে থাকেন। অথচ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা রাঃ ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর কন্যা। তিনি মহানবি মুহাম্মদ (সাঃ) এর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নামের শেষে মুহাম্মদ নাম যোগ করেন নি। মুসলিমদের পৃথিবীতেও বাবার পরিচয়ে পরিচিত হতে হবে এবং বিচার দিবসেও বাবার পরিচয়ে ডাকা হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন,

‘কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নাম ধরে এবং তোমাদের পিতার নাম ধরে ডাকা হবে।’ (সহি বুখারীঃ ৬১৭৭)

ইসলাম ধর্মে একজন পিতার দায়িত্ব অনেক। শুধু অর্থ উপার্জন আর সংসারের ব্যয় ভার বহন করাই তার প্রধান দায়িত্ব নয়, পরিবার পরিজনের ইহকালীন ও পরকালীন শান্তির পথ তৈরী করে দেওয়াই তার প্রধান দায়িত্ব।

ঘর ভাঙানিয়া মানুষেরা

'মুখের উপর ডিভোর্স পেপার ছুঁড়ে মারতে পার না? মীরা, তোমার কি কোনো আত্মসম্মান নাই, তোমার চাকরি আছে, তুমি স্বাবলম্বী, তাহলে ভয় কিসের? এভাবে পড়ে পড়ে মার খাওয়ার কোনো মানে হয়?'

মীরা ঠোঁট কামড়ায়। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে রানু আপার দিকে। খুব কনফিউজড দেখায় মীরাকে। এতদিনের সম্পর্ক, ছুঁড়ে ফেলতে যেমন কষ্ট হয় তেমনি ভয়ও হয়। আবার নতুন করে শুরু করতে পারবে তো?

মীরার কলিগ হাসান জোর গলায় বলল, 'কী এত ভাবো, মীরা? আমরা তো তোমার পাশেই আছি। এই অফিসের সবাই তোমাকে ভালোবাসে, তোমার বিপদে পাশে দাঁড়ায়। আর আমি তো সবসময়ই তোমার পাশে ছায়ার মতো আছি।'

অফিসের কলিগ, বন্ধুসম হাসানের কথায় মীরা মুখে কষ্ট ভুলানো হাসি এনে বলল, 'এই তো কিছু না। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি আর কী?'

রানু আপা আত্মবিশ্বাসী সুরে বললেন, মীরা, এত কিছু ভাবাভাবির কিছু নাই। শফিকের সাথে তোমার

আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে না। সম্পর্কটা তুমি ভেঙে দিতেই পারো। এভাবে অপমানিত জীবন বহন করার কোনো মানে হয় না। আত্মসম্মান আর আত্মমর্যাদা বোধ তো থাকা চাই।

হাসানের গলাতেও একই সুর শোনা যায়, 'হ্যাঁ, মীরা, ঠিক তাই। ভাবাভাবির কিছুই নাই।'

মীরা আমতা আমতা করে বলল, 'না, আমার টুকটুকির কথা ভাবছি। বাবা ছাড়া মেয়েটা কিভাবে বড় হবে? মানুষ হতে পারবে তো?'

রানু আপা হেসে উঠে বললেন, 'এখন কি খুব ভালো ভাবে বড় হচ্ছে? এরকম অসুস্থ পরিবেশে কি বাচ্চা সুস্থ ভাবে বেড়ে উঠতে পারছে? সঠিক পরিচর্যা পাচ্ছে?'

মীরা ভাবনার অতল থেকে উঠে এসে বলল, 'হ্যাঁ, এরকম অসুস্থ পরিবেশে মেয়েটার আসলেই মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। সেদিন রাতে বাচ্চাটা আমাদের ঝগড়া শুনে পাশের রুমের দরজার আড়ালে যেয়ে কাঁদছিল।'

রানু আপা মাথা নেড়ে বললেন, 'এভাবে মেয়েকে বড় করতে পারবে না। বাবা মায়ের খারাপ সম্পর্কের মাঝে বড় হলে বাচ্চা মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে যাবে। তার চেয়ে আলাদা ভাবে বড় করাও ভালো।'

লাঞ্চ আওয়ার শেষ হলে সবাই অফিস ক্যান্টিন থেকে যার যার জায়গায় চলে গেল। মীরা একটা মাল্টিন্যাশনাল অ্যাড ফার্মে চাকরি করে। নিজের সিটে বসে ল্যাপটপের স্ক্রিনে চোখ রাখল। সুখী সংসারের সাথে একটা ভোজ্য তেলের বিজ্ঞাপনের ডকুমেন্ট দাঁড় করাতে হবে। আগামীকাল প্রেজেন্টেশন, আজকের মধ্যেই কাজটা দাঁড় করাতে হবে। মীরা ভাবতে থাকল। হ্যাপী ফ্যামিলি, সুখী সংসার। সিনেমা, নাটক আর বিজ্ঞাপনের মতো তারও তো একটা সুখী সংসার ছিল।

সংসার, হায় লাল-নীল সংসার! শফিক-মীরার প্রেমের বিয়ে। ভার্সিটিতে পড়ার সময় পরিচয়, তারপর প্রেম। প্রেমটাকে বিয়েতে রূপ দিতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। দুইপক্ষকে ম্যানেজ করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। নীলক্ষেতের খুপড়ি বিরিয়ানি ঘরে বসে খেতে খেতে দুইজন কত স্বপ্ন দেখেছিল এই লাল-নীল সংসারের, কিভাবে গোছাবে, পর্দার রঙ কেমন হবে, কাঠের না রড আয়রনের সোফা কিনবে,

কোথায় গেলে সস্তায় ভালো ফার্নিচার কিনতে পারবে, সব ঠিক করে রেখেছিল। সেই স্বপ্নের সংসার এখন রুদ্ধশ্বাস সংসার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘরে ঢুকতেও মন চায় না, ঘরের বাতাসেও যেন পচনের গন্ধ। সম্পর্কের পচন কবে থেকে শুরু হয়েছিল ঠিক মনে করতে পারছে না।

গতকাল রাতে সেই পচনের গন্ধটা তীব্রভাবে বেরিয়ে এসেছিল। শফিককে সে উদারমনা ভেবেছিল। কিন্তু গত রাতে তার কদর্য রূপটা বেরিয়ে এসেছিল।

ঝগড়ার এক পর্যায়ে শফিক চেঁচিয়ে উঠে বলেছিল, ‘তোমার কলিগ হাসানের সাথে এত মাখামাখি কিসের? এজন্য তো আর সংসার ভালো লাগে না। পরপুরুষের সাথে লটর পটর, আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ?’

মীরাও চিৎকার করে পাল্টা জবাব দিয়েছিল, ‘নোংরা কথা বলবে না, বুঝলে? নিজে নোংরা তো তাই সব কিছুতেই নোংরামী দেখো।’

গতরাতে ঘুম হয় নি। প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করছে। শরীরটাও খারাপ লাগছে। মীরা অফিস থেকে ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় চলে গেল। ফেরার পথে ডে কেয়ার সেন্টার থেকে টুকটুকিকে নিয়ে আসল। বাসায় বসে চিন্তা করতে থাকে, কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। মাকে একটা ফোন দিল। দুইবার বাজতেই ফোন ধরল,

‘হ্যালো, মা, আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছো?’

‘কে, মীরা? ভালো আছিস?’

‘হ্যাঁ, মা, আমি। তেমন ভালো নাই।’

‘কেন কী হয়েছে রে?’

‘তোমাদের জামাই শফিক, আমার সাথে শুধু খারাপ আচরণ করে।’

‘কী করে? আমরা তো তোকে আগেই নিষেধ করেছিলাম, ঐরকম ফ্যামিলিতে বিয়ে না করতে। আমাদের কথা তো শুনলি না, এখন তো ঠেলা বুঝবিই।’

‘তখন তো বুঝি নি মা, শফিক আর তার ফ্যামিলি এত খারাপ। গতরাতে আমার সাথে এত নোংরা ভাষায়

কথা বলল, বাবা-মা তুলে পর্যন্ত গালি দিল ।'

'কী গালি দিল? অসভ্য ছেলে কোথাকার! যেরকম মা, সেরকম ছেলে! গতবার তোর শাশুড়ি আমাকে যে কী অপমানটাই না করল । এটা দেন নি, সেটা দেন নি, আরো কত কথা । মেয়েকে রান্না শিখাননি, আরো কত কী! আমার মেয়েকে আমি মাস্টার্স পাশ করিয়েছি, ভালো চাকরিতে ঢুকিয়েছি । এই বিংশ্ব শতাব্দীতে এসে তিনি কত কিছু আশা করে! বউ মশলা বাটবে, দশ পদ রেঁধে খাওয়াবে, স্বামীর সেবা করবে, বাচ্চা পালবে, আরো কত আবদার! চাকরিজীবী বউ হলে যে ছাড় দিতে হয় সেটা যেমন শফিক জানে না ওর মা টাও জানে না । অশিক্ষিত, গেঁয়ো, ছোটলোক কোথাকার ।'

'হ্যাঁ, মা, আমি যে এখন কি করি! আমার উপর সে সব চাপিয়ে দিয়ে চলে যায় । বাজার, রান্না-বান্না, ঘর গুছানো, টুকটুকিকে ডে কেয়ারে আনা-নেওয়া সবই আমার করতে হয় । দায়িত্বহীন অথর্ব ছেলে একটা ।'

'আসলেই অথর্ব ছেলে । ওর মায়ের কত উঁচা গলা । আমার ছেলে হ্যান, ত্যান । এক গ্লাস পানি পর্যন্ত ঢেলে খাওয়ানো শেখায় নি, বাজার করা শেখায় নি, নুলা বানায় রাখছে । নুলার মায়ের বড় গলা । ছু!'

মীরা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'মা, আমি আর এত ভার নিতে পারছি না । আমি আর ওর সংসার করতে চাচ্ছি না ।'

মীরার মা আশ্বাস দেবার সুরে বলল, 'হ্যাঁ, চলে আয় । আমাদের কি আর কম আছে, নাকি? তোকে আমরা পালতে পারব না? তুই বাড়ি চলে আয় । এখানের কোনো চাকরিতে ঢুকিস । যোগ্যতা আছে, নতুন চাকরি ঠিক খুঁজে পাবি । ওর সংসারে এত কথা শোনার দরকার নাই ।'

'না মা, আমি গ্রামের বাড়ি যাব না । মানুষজন নানা কথা বলবে । তার চেয়ে আমি ঢাকাতেই রানু আপার বাসায় সাবলেট থাকব । উনিও একা বেশ ভালোই আছেন ।'

'আচ্ছা, যা । আমাকে সব সময় সবকিছু জানাবি । কোনো সমস্যা হলে আমরা না হয় ঢাকায় যাব ।'

'আচ্ছা' বলে মীরা ফোনটা রেখে দিয়ে দ্রুত ব্যাগ গুছিয়ে ফেলল । একটা ট্যাক্সি ঠিক করে টুকটুকিকে নিয়ে মগবাজারে রানু আপার বাসা অভিমুখে রওনা দিল । মিরপুর থেকে জ্যাম ঠেলে মগবাজার পৌঁছতে

সন্ধ্যে হয়ে গেল ।

শফিক সন্ধ্যে বেলায় অফিস শেষে বাড়ি ফিরল । ঘরে তখনো তালা ঝোলানো । তালা খুলে বিরক্তি নিয়ে ঘরে ঢুকল । মীরা কেন এখনো ঘরে ফিরে নাই, বুঝতে পারল না । আজকাল বড্ড বেশি বেপরোয়া হয়ে গেছে, কোথায় যায়, কার সাথে ঘোরে, কিছুই বলে না । মীরার সাথে জুটেছে এক ডিভোর্সী বড় আপা, কি যেন নাম, রানু না বানু মনে করতে পারল না । পকেট থেকে ফোন বের করতে যাবে ঠিক এই সময় বেড রুমের সাইড টেবিলের উপর একটা ভাঁজ হওয়া চিঠি পড়ে থাকতে দেখল । চিঠি খুলে পড়তে লাগল,

শফিক,
আমি আর তোমার সাথে থাকব না, ঠিক করেছি । তোমার মতো অথর্ব, দায়িত্বজ্ঞানহীন আর নোংরা মানসিকতার মানুষের সাথে আমার আর থাকার ইচ্ছে নাই । আমাদের আর কোনো খোঁজ নেবে না । ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দেবো ।

ইতি
মীরা

চিঠি পড়ে শফিক রাগে কাঁপতে লাগল । গতরাতের কথা মনে পড়ে গেল । গত রাতে সে না হয় একটু বেশি রিঅ্যাক্ট করেছে । কিন্তু তাই বলে এভাবে চলে যাবে । তার রাগ সে বোঝে না । তার বাহিরের রাগটা আসলে মনের কথা নয় । রাগ উঠলে সে উল্টা-পাল্টা বকে, পরে আবার ঠিক হয়ে যায় । যে আমাকে বোঝে না, সে যাক । আমি আর তাকে আদরাতে যাব না । খুব দেমাগ হয়েছে, না । যে আমাকে বোঝে না, আমার যত্ন নেয় না, তার সাথে থেকে কী লাভ । এসব ভেবে সে তার মাকে ফোন দিল,

‘মা, আসসালামু আলাইকুম । কেমন আছ?’

‘হ,বাজান,ভালা । তুই কেংকা আছিস? তোর গলাটা এংকা শুনা যায় ক্যা?’

'মা, মীরা টুকটুকি কে নিয়ে চলে গেছে। আমার সাথে আর সে ঘর করবে না।'

'মুই আগেই কইছিলাম, ঐ ছেমড়ী সংসার করবার পাবার নয়। স্বামীর খেদমত জানে না। ভালা রাঁন্ধন জানে না। তোক বাসি তরকারি খিলায়। এক গ্লাস পানি পর্যন্ত তোক ঢালি খিলায় না। তোর গায়ত একটা চাদর পর্যন্ত দিয়া দেয় না। তুই ঠান্ডাত কুকড়ি থাকিস, সেদিক খোঁজও রাখে না। নেজে ঠিকই ভালা খাবারটা খায়, মাছের মাথা পেটি সব খায়। তোর আগেই ভাত খায়া ফেলায়। এরকম খাকী আর দজ্জাল মেয়েলোক মুই জেবনেও দেখম নাই। কী দেইখ্যা যে তুই ওরে বিয়া করছিলি রে বাপ?'

'তখন তো বুঝি নি মা, এত দজ্জাল হবে। বিয়ের আগে তো ভালোই মনে হয়েছিল।'

'বিয়া বসার জন্যি অংকা ভালা সাজছিল। তোর নাখান সোনার টুকরা ছেলে কই পাবে? গ্যেছে, ভালাই হচে, ল্যাটা চুকে গ্যাছে। তুই আবার ওর পাও ধরবার যাস না। তাইলে কিন্তু সারা জেবন বউয়ের গোলাম হইয়্যা থাকন লাগব।'

'আচ্ছা মা, রাখি' বলে শফিক বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। মীরার খোঁজ সে আর রাখে নি। দুই মাস পরে ডিভোর্স লেটার সে হাতে পেয়েছিল। রাগে আর আত্মঅহংকারে সে একবারও ফোন দেয় নি। মীরা রাগ করে আশা করেছিল যে উকিল নোটিশ পেয়ে হয়ত শফিক সংসার বাঁচাতে দৌড়ে আসবে, কিন্তু শফিক আসে নি। সেও তার ইগোর কারণে ফোন দেয় নি। তাই নব্বই দিন পার হলে আপনা আপনি ডিভোর্স হয়ে গেল। ঘর ভাঙানিয়া মানুষেরা মীরা-শফিকের মনোমালিন্যের চাপা আগুনটাকে উসকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘরটাতে আগুন ধরাতে সক্ষম হয়েছিল। সম্পর্কটাকে ছাড়াছাড়ি করিয়ে ছেড়েছিল।

টিকাঃ আমাদের সমাজে ডিভোর্স এখন খুব সহজ হয়ে গেছে। অথচ ডিভোর্সের ইস্যুগুলো খুব মারাত্মক কিছু নয়। সামান্য মনোমালিন্য হলে স্বামী-স্ত্রী দুইজনে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা না করে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির সাথে শেয়ার করে, আর তারাও অতি উৎসাহে কুপরামর্শ দিয়ে চাপা আগুনটাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। অথচ ছোট-খাটো ভুলত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে অন্যদের কাছে বলে বেড়ানো ঠিক নয়, পরনিন্দা, কুধারণা, গীবত আমাদের ধর্মে পুরোপুরি নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেছেন, 'হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।'(আল হুজুরাত : ১২)

আবার আমাদের এই ভারত উপমহাদেশীয় কনটেক্সটে ছেলে সন্তানদেরকে একদম প্রতিবন্ধী আর অথর্ব হিসেবে গড়ে তোলা হয়। কাপড় ধোয়া, বিছানা গুছানো, নিজের জুতা পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে এক গ্লাস পানি পর্যন্ত ঢেলে খেতে দেওয়া হয় না। তাদের এমন অথর্ব বানানো হয় যে তারা নিজের জীবনে সব কিছুতেই অন্যের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়ে।

সংসারে তখন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দাসীর মতো আচরণ করতে শুরু করে। অথচ নিজের কাজ নিজে করা সুন্নাহ। আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহম্মদ (সা:) নিজের কাজ নিজে করতেন, অন্যকে কখনো কষ্ট দেওয়া তো দূরে থাক বরং তিনি তাঁর স্ত্রীদের গৃহের কাজেও সাহায্য করতেন। এ সম্পর্কে আয়েশা (রা:) বলেন, 'তিনি ঘরের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন আর যখন আযান শুনতেন, তখন বেরিয়ে যেতেন।' (বুখারী: ৪৯৭২)

নারীর বাহিরে চাকরি আর ভারসাম্যহীন জীবন ব্যবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে ডিভোর্সের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নারীরা শিক্ষিত হয়ে উঠছেন। উচ্চ শিক্ষিত চাকরিজীবী নারীরা বাহিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে ক্লান্ত হন

না, কিন্তু ঘরের কাজ তাদের বিরক্তি এনে দেয় । রান্না, বাথরুম ধোয়া, কাপড় কাচা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া এমনকি শিশু সন্তানের ন্যাপি পাল্টানোর কাজটাও তাদের অসহ্য লাগে । আবার অনেক শিক্ষিত নারী শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সামর্থের গরম দেখাতে গিয়ে সংসারই করতে পারছে না, সুখ হারিয়ে যাচ্ছে তার নিজের আত্মঅহমিকায় । শিক্ষার সাথে নিজের মানবিকতা ও মানবতাকে এডাপ্ট করতে না পারায় সংসারের দায়িত্ব তার কাছে বোঝার মতো হয়ে দাঁড়ায় । পরিণতিতে সংসারে ভাঙন দেখা যায় ।

দহন

টুকটুকি কে নিয়ে মা কোথায় যাচ্ছে, টুকটুকি কিছুই বুঝতে পারে না। গাড়িতে করে যেতে যেতে সে মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, আমরা কোথায় যাই? নানু বাড়িতে? বাবা যাবে না?'

মীরা ধমক দিয়ে বলল, 'এত কথা বলো না তো। চুপ হয়ে থাকো। সেই কখন থেকে একই প্রশ্ন করে যাচ্ছ।'

ট্যাক্সি চলতে লাগল। সন্ধ্যের সময় একটা সাততলা বিল্ডিং এর সামনে এসে ট্যাক্সিটা থামল। অপরিচিত জায়গা দেখে টুকটুকি আবার জিজ্ঞেস করল, 'মা, এটা কার বাসা? আমরা কোথায় যাচ্ছি? এটা তো নানুবাড়ি নয়?

মীরা বিরক্তি ভাবটা লুকিয়ে মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এটা তোমার রানু আন্টির বাসা। এখন থেকে আমরা এখানেই থাকব। চলো, ভিতরে চলো। তোমার রানু আন্টিরও একজন মেয়ে আছে, তোমার চেয়ে একটু বড়। দুইজন মিলে খেলবে, কেমন?'

টুকটুকি আবার বলল, 'মা, আমাদের সাথে বাবা থাকবে না? আমরা এখানে কয় দিন থাকব?'

মীরা কলিংবেল চাপতে চাপতে বলল, ‘বেশি বাবা বাবা করো না তো। তোমার বাবা আমাদের সাথে আর থাকবে না। এখন থেকে শুধু তুমি আর আমি থাকব, বুঝলে? এখন একটু হাসো, তোমার আন্টি তোমাকে ভালো বলবেন।’

রানু আপা দরজা খুলে দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে টুকটুকিকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, ‘টুকটুকি মামনি, তুমি তো দেখি অনেক বড় হয়ে গেছ? স্কুলে ভর্তি হবে? তোমাকে নতুন স্কুলে ভর্তি করাব। দারুন মজার স্কুল। রাইম শোনাবে, মাথা নেড়ে গান গাইবে, খুব আনন্দের স্কুল। যাবে? তোমার ছোঁয়া আপুর সাথে যাবে, ঠিক আছে?’

ছোঁয়া নামের একজন আট বছরের মেয়ে দৌড়ে এল। তারপর টুকটুকিকে সে বারান্দায় নিয়ে গেল। ওখানে ঝুল দোলনায় দুইজন দুলতে লাগল। একটু পর দুইজন পাজল মিলানো খেলা খেললো। তারপর ব্লক সেট দিয়ে বিল্ডিং বানিয়ে খেলতে লাগল। দুইজনের মধ্যে খুব দ্রুত ভাব হয়ে গেল। মীরা আড়চোখে ওদের খেলা দেখতে লাগল। টুকটুকির হাসি মুখ দেখে তার মনের ভিতরের কালো মেঘটা সরে গেল।

রাতে মেয়েটা ক্লান্ত হয়ে ঘুমাতে এল। টুকটুকির ঘুম এল না। সে প্রতি রাতে একটা পা বাবার গায়ে আর আরেকটা পা মায়ের গায়ে দিয়ে ঘুমায়। তার একপাশটা ফাঁকা ফাঁকা মনে হলো। সে এপাশ ওপাশ করে ছটফট করতে লাগল। পাঁচ বছরের জীবনে সে খুব কম রাতই তার বাবাকে ছাড়া ঘুমিয়েছে। যে রাতগুলোতে তার ঘুম আসত না, সে রাতগুলোতে তার বাবা তাকে বারান্দায় নিয়ে যেয়ে আকাশের চাঁদ দেখাত, তারা দেখাত আর টুইংকেল টুইংকেল ছড়া শুনিয়ে ঘুম পাড়াত।

বাবার কথা মনে হতেই সে ভ্যা করে কেঁদে বলল, ‘আম্মু, আমি বাবার কাছে যাব। এখানে থাকব না। বাসায় চল।’

মীরা মেয়ের কান্না থামাতে চেষ্টা করল। এত রাতে কান্নার শব্দে সবার ঘুম ভেঙে যাবে যে। মেয়েকে কোলে নিয়ে টুইংকেল টুইংকেল ছড়া শুনিয়ে পায়চারি করতে লাগল। এত ভারী বাচ্চা, কোলে নিয়ে হাঁটতে তার খুব কষ্ট হলো। একসময় টুকটুকি ঘুমিয়ে গেল।

মীরার দিন গুলো বেশ ভালোই কাটছিল। শুধু রাতের বেলায় মেয়েকে ঘুম পাড়াতে তার কষ্ট হচ্ছিল। কিছুদিন পর মেয়ের শুধু মাকে জড়িয়ে ঘুমানোর অভ্যেস হয়ে গেল। মীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দেখতে দেখতে এক বছর পার হয়ে গেল। একদিন হঠাৎ রানু আপা হাসি মুখে ঘরে ফিরে বললেন, 'মীরা, একটা খুশির খবর আছে। আমি স্কলারশীপ পেয়েছি, সামনের মাসে পিএইচডি করতে অস্ট্রেলিয়া চলে যাব।'

মীরার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তার এত চমৎকার আশ্রয়টা সে হারাতে যাচ্ছে। সে রানু আপাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপা, ছোঁয়ার কী হবে?'

রানু আপা হেসে বললেন, 'ওর জন্যই তো এদেশ ছাড়ছি। মেয়েটার স্কুলে প্রায়ই ওর বাবা যায়, ফুপি যায়। আমার নামে উল্টা-পাল্টা কথা বলে। মেয়েকে এটা সেটা গিফট দেয়, যাতে মেয়ে একেবারে তার কাছে চলে যায়। আমাদের ডিভোর্সের সময় তো আদালত থেকে আমি অনুমতি পেয়েছিলাম যে আমার কন্যা আমার হেফাজতে থাকবে। অথচ তার বাবা এখন ঝামেলা বাঁধাতে আসছে। আমার মেয়ে আমাকে ভুল বুঝতেছে। আমি আমার মেয়েকে ওদের কাছ থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাব, কেউ জানতেও পারবে না যে আমরা কোথায় যাচ্ছি।'

রানু আপা পরের মাসে ছোঁয়াকে নিয়ে একেবারেই চলে গেলেন। যাওয়ার সময় অনেক কাঁদলেন। টুকটুকি অনেক কাঁদল তার খেলা আর পড়ার সাথী ছোঁয়া আপুর জন্য। মগবাজারের এত বড় ফ্ল্যাটের ভাড়া দেবার সামর্থ্য মীরার নাই, অন্য কোনো অপরিচিত মানুষকে সাবলেট দিতেও সে ভয় পায়। ঢাকা শহরে স্বামী ছাড়া একটা মেয়ের একা চলা অনেক কঠিন। সে ছোট বাসা খুঁজতে বের হলো। একা একজন মহিলা স্বামী ছাড়া শুধু বাচ্চা নিয়ে থাকবে এটা কোনো বাড়িওয়ালা মেনে নিতে পারে না। টুকটুকির বয়স তখন ছয় পেরিয়েছে। সে একা একাই অনেক কাজ করতে পারে। মীরা ফোনে শফিকের সাহায্য চাইল। শফিক নতুন বিয়ে করেছে। বউ নিয়ে হানিমুনে ব্যস্ত। সে শুধু টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারবে, বাচ্চার দায়িত্ব নিতে পারবে না। শেষে মীরা একজনের পরামর্শে টুকটুকি কে একটা নামী-দামি স্কুলের বোর্ডিং রেখে দিল। শফিক প্রতিমাসে স্কুলের খরচ দেওয়া শুরু করল। মীরা মিরপুর কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে উঠে গেল।

আজ টুকটুকির প্যারেন্টস ডে। টুকটুকির বয়স এখন তেরো বছর। সে অনেক ম্যাচুয়্যুর হয়ে গেছে। হোস্টেলের অধিকাংশ বাচ্চাই ব্রোকেন ফ্যামিলির। টুকটুকির অনুরোধে আজকে শফিক-মীরা দুইজনেই একসাথে প্যারেন্টস ডে তে যাবে। শফিক-মীরার এতবছর মুখ দেখাদেখি হয় নি। টুকটুকিকে দেখতে একমাসে শফিক যেত আর তার পরের মাসে মীরা যেত। তাই কারো সাথে কারো দেখা হতো না। আজ এত বছর পর দুইজন মুখোমুখি হবে।

মিরপুর মহিলা হোস্টেলের নীচতলার গেস্টরুমে শফিক বসে আছে। মীরা বক্সে করে নুডুলস, সেমাই আর কিছু নাস্তা নিয়ে চারতলা থেকে নিচে নামছে। অনেক বছর আগে, ছাত্রী অবস্থায় সে এমনি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের চারশ তিন নাম্বার রুম থেকে নিচে নামত। শফিক হলের গেটে দাঁড়িয়ে থাকত। ৪০৩ লেখা স্লিপ আপুদের হাতে ধরিয়ে দিত, তখন মোবাইলের চল ছিল না। আপুদের ডাকে মীরা শিহরিত হতো। এই রুম নম্বর নিয়ে শফিক খুব ক্ষেপাত আর বলত, দেখো আমি কিন্তু চারটা বিয়ে করব। তুমি তো এখন থেকেই চার সতিনের ঘরেই আছ, তাহলে পরবর্তীতে মানিয়ে নিতে আর সমস্যা হবার কথা নয়।'

মীরা খুব ক্ষেপে যেত। তার শফিক অন্য কারো হবে এটা সে ভাবতেও পারত না। দুপুরে না ঘুমিয়ে সে শফিকের জন্য নিজ হাতে বিভিন্ন রকমের নাস্তা বানাত। তারপর দুইজন হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সামনে চলে যেত। ওখানে বসে মীরা শফিককে নাস্তা খাওয়াত আর গল্প করত।

কত স্মৃতি এসে ঝাপটা মারছে। মীরার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। চশমা খুলে সে চোখ মোছে। হায়, সেই শফিক, হৃদয়ে যে শিহরণ ছড়াতো, যার ভরাট কণ্ঠের কবিতা তার হৃদয় জুড়াতো। যাকে একটু দেখার জন্য সে দুপুরের ঘুমে ছটফট করত, বিকেলে একটু খানি দেখা হবার প্রত্যাশায়। তাকে সে পেয়েও ছুঁড়ে মেরেছে। আজ তারা যোজন যোজন দূরে বাস করে। প্রায় আট বছর পর গেস্ট রুমে দুইজন দুইজনকে দেখে চমকে উঠল।

শফিকই প্রথমে আগ বাড়িয়ে কথা বলল, 'এই ক'বছরে তুমি এত পাল্টে গেছ মীরা? হঠাৎ দেখে তো

তোমাকে আমি চিনতেই পারি নি। এত শুকিয়ে গেছ? এত ভেঙে গেছ কেন তুমি?'

মীরা কষ্ট লুকিয়ে হেসে বলল, 'তুমিও তো অনেক পাল্টে গেছ। চুলে পাক ধরেছে। স্বাস্থ্যটা বেশ ভালো দেখাচ্ছে। মুখে দাড়ি রেখেছ। কাটার আলসেমী, ফ্যাশন নাকি সত্যি ধর্ম কর্মতে ঝুকেছ?'

শফিক চাপা হেসে বলল, 'যা খুশি ধরে নাও।'

'তোমার জন্য কিছু খাবার এনেছিলাম, খাবে?'

'না, এখন খাবো না। দেরি হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

মীরা কান্না চেপে বলল, 'মেয়েটা শুধুই তোমার?'

শফিক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'না, আমাদের মেয়ে ছিল। কিন্তু এখন একমাসে বাবার রাজকন্যা আর পরের মাসে সে মায়ের আশার আলো কন্যা হয়ে দেখা দেয়।'

মীরা চুপ হয়ে গেল। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। শফিকের দ্বিতীয় বউ, সংসার নিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে। সে কি খুব সুখে আছে? তার সামনে বেরিয়ে আসা ভুড়িটা কি সুখের চিহ্ন? মোটা তাজা পুরুষ, বউ কি খুব ভালো রাঁধে? অতি কৌতূহল লুকিয়ে মীরা শান্ত গলায় বলল, 'তোমার বউ আর ছেলে মেয়েরা ভালো আছে?'

শফিক হেসে মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ, সবাই ভালো আছে। তুমি কেন আর বিয়ে করলে না? তোমারও তো নতুন সংসার হতে পারত। এমন করে কেউ থাকে? আত্মীয় স্বজন ছাড়া একা একা হোস্টেলে, খুব কষ্ট হয় তোমার, না? কিভাবে এত বছর একা একা কাটালে? বিয়ে করলেই পারতে।'

মীরা চুপ হয়ে গেল। ডিভোর্সের পর ঢাকার বাসিন্দা এক খালা তার পুনঃবিবাহের জন্য অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেরকম ভালো বা যোগ্য পাত্র পান নি। ডিভোর্সী শুনলে সবাই নাক কুচকাতো।

ঘটকালী করতে যেয়ে খালাকে অনেক কটু কথা হজম করতে হয়েছিল। এক ছেলের মা তো নোংরা ভাষায় মুখের উপর বলেছিল, 'ছ্যা ছ্যা, অন্যের ছাড়া ভাত আমার ছেলে কেন খাবে? তার উপরে বাচ্চাওয়ালী মহিলা, নিশ্চয় চরিত্র খারাপ, না হলে কেউ সংসার ছাড়ে?' তারপর অফিসে জানাজানি হলে, কিছু লোলুপ

পুরুষরা ছোঁকছোঁক করেছিল যেন সে একটা সস্তা মেয়েলোক আর তাদের 'সার্বজনীন বউ' । মীরার জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল । মাথার উপর না আছে ছাদ, না আছে কোনো নিরাপত্তা । বঞ্চিত আর লাঞ্চিত মীরা, যে সম্মানের জন্য ঘর ছেড়েছিল, তা যেন আরাধ্যই থেকে গিয়েছিল । গরম কড়াই থেকে সে জ্বলন্ত উনুনে যেয়ে পড়েছিল । কন্যা টুকটুকিকে বোর্ডিং এ রেখে পরে সে কর্মজীবী হোস্টেলে উঠেছিল । এখানে কেউ কাউকে খোঁচাত না । তাই এটাই তার নিরাপদ আবাস হয়ে গিয়েছিল ।

মীরা তার অতীত কাউকে বলতে চায় না । শফিক তার জীবনটা দেখে আফসোস করছে না কী করুণা করছে কে জানে । শফিকের গাড়ি এসে সামনে দাঁড়াল । শফিক ড্রাইভারের পাশের সিটে যেয়ে বসেন । মীরা পিছনে আরাম করে গা এলিয়ে বসল । বাসে আর বড় জোর সিএনজি তে অভ্যস্ত মীরা গাড়িতে বেশ আরামবোধ করল । গাড়ির লুকিং গ্লাসে মীরার চোখ বারবার চলে যাচ্ছিল । যে ছিল শুধুই তার, আজ সে আরেকজনের প্রিয় স্বামী, তার পাশে বসাও পাপ । গাড়ি এসে স্কুলের সামনে দাঁড়াল । টুকটুকি দৌড়ে এল । টুকটুকি কাকে আগে জড়িয়ে ধরে সেটা মীরা দেখবে বলে ঠিক করেছিল । কিন্তু সে কাউকেই জড়িয়ে ধরল না । একপাশে বাবার আর আরেকপাশে মায়ের হাত ধরে ঘুরতে লাগল । বান্ধবীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল । খুব আনন্দে কাটল সময়টা । বিদায়ের সময় দুইজনকেই একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমরা দুইজন এক সাথে পড়বে । আমাদের স্কুলের পিছনে একটা বড় পার্ক আছে । ওখানে বসে ঠান্ডা মাথায় পড়বে, কেমন?'

টুকটুকি কাঁদো কাঁদো চোখে ভিতরে চলে গেল । মীরার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল । বাচ্চাটার কত কষ্ট । বাবা-মা ছাড়া একা একা বড় হচ্ছে । মীরা-শফিক দুইজনেই পার্কের বেঞ্চে বসে খাম খুলে চিঠি পড়তে শুরু করল,

আব্বু ও আম্মু,

তোমরা দুইজনেই খুব ভালো আছো, তাই না? আমি কেমন আছি, কখনো জানতে চেয়েছ? আমার এই ছোট্ট জীবনটা কত কষ্টে ভরা তোমরা তা কখনো অনুভব করতে পারবে না। নিজেদের ইগো আর রাগ-অভিমানের বলি হয়েছি আমি। তোমরা তো সুখেই আছ। মাঝখান থেকে আমার জীবনটা এলোমেলো করে দিয়েছ। তোমাদের এত সমস্যা ছিল, তাহলে আমাকে পৃথিবীতে এনেছিলে কেন? তোমরা পুতুল খেলেছ, আমার জীবনটাকে নিয়ে। আমি তোমাদের কখনোই ক্ষমা করব না।

মাত্র ছয় বছর বয়সে আমাকে এই হোস্টেলে রেখে গিয়েছিলে। আমি একা ঘুমাতে ভয় পেতাম। প্রতিটা রাতে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতাম। হোস্টেল সুপার ম্যাডাম ধমক দিতেন। বালিশে মুখ গুঁজে দম বন্ধ করে কাঁদতাম যাতে কোনো শব্দ বাহিরে না যায়। কোলবালিশটাকে জড়িয়ে ধরতাম, সেটাকে আব্বু ভাবতাম। মনে হতো আব্বু আমাকে রাইম শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছেন।

যখন ডাইনিং এ খেতাম, চামচ থেকে ভাত পড়ে যেত। ঠিকমত খেতে পারতাম না। মাকে খুব মনে পড়ত। মা কত গল্প করে করে ধৈর্য নিয়ে খাওয়াতেন। একদিন চামচটাকেই মায়ের হাত হিসেবে কল্পনা করতে শুরু করলাম। তারপর একদিন কল্পনার আব্বু-আম্মু আমার সাথেই থাকা শুরু করে দিল। আমি যখন খাই তখন আমার কল্পনার আম্মু আমার পাশে বসে থাকে। যখন পড়ি তখন আমার কল্পনার আব্বু আমার পাশে বসে থাকে। ঘুমাতে গেলে আব্বু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। রাইম শোনায়।

আব্বু, আম্মু, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমার সাথে কল্পনার আব্বু-আম্মু সবসময়ই থাকে। তারা আমাকে শাসন করে, আদর করে, পড়া দেখিয়ে দেয়, ঘুম পাড়িয়ে দেয়, সব

কাজেই তারা আমার পাশে থাকে। কল্পনার এই আব্বু-আম্মুকে আমি যতটুকু ভালোবাসি ঠিক তার বিপরীত বাস্তবের আব্বু-আম্মুকে আমি ঘৃণা করি। ভালোবাসা আর ঘৃণা যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

তোমরা আমার জন্য প্রতি মাসে দামি দামি খাবার, জামা কাপড়, গল্পের বই, রঙ পেন্সিল আরও কত কী আনো। আমাকে দামি স্কুলে পড়িয়ে তোমরা আনন্দ পাও, তৃপ্তি পাও। নিজেদের অনেক দায়িত্বশীল প্যারেন্টস ভাবো।

অথচ তোমরা আমার কাছে কতই না নিকৃষ্ট তা তোমরা জানো না। আমি আর তোমাদের সাথে অভিনয় করতে পারছি না। হাসিমুখে তোমাদের সামনে দাঁড়াতে আমার কষ্ট হয়। তোমরা যখন বাস্তবে আসো, তখন আমি আমার কল্পনার আব্বু-আম্মুকে হারিয়ে ফেলি। তাদেরকে আবার সামনে আনতে আমার কষ্ট হয়। প্যারালাল দুই জোড়া আব্বু-আম্মু কে নিয়ে মাথার ভিতরটা তোলপাড় করে। আমার মাথা প্রচণ্ড ব্যথা করে। তোমরা দেখা দেবার পরের দুই দিন আমি আর ঘুমাতে পারি না।

প্লীজ তোমাদের একটা অনুরোধ করব, তোমরা আর এসো না। তোমরা এলে আমি পাগল হয়ে যাব। প্লীজ আমাকে ভালো থাকতে দাও। আমাকে আমার কল্পনার আব্বু-আম্মুর সাথেই থাকতে দাও।

ইতি,

কোনো এক অচেনা মেয়ে

শফিক-মীরার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। নিজেদের সামান্য ইগো আর অহংকারের জন্য তারা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। 'নো কম্প্রোমাইজ' স্লোগান বুকে নিয়ে তারা সংসার যুদ্ধ শুরু করেছিল। মাঝখান থেকে একটা নিষ্পাপ শিশুর জীবন ধ্বংস হয়ে গেল। বাচ্চাটার জন্য মীরা কি একটু ছাড় দিতে পারত না?

শফিক কি আগ বাড়িয়ে ফোন দিতে পারত না? সরি বলে রাগ ভাঙিয়ে মীরাকে ফেরাতে পারত না? যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন আর ফেরার পথ নাই। আকাশ থেকে টপটপ করে বৃষ্টি নামছে। দুইজনেই ভিজছে। ভিতরের জমানো ইগোর আগুন আজ নিভে যাচ্ছে। এত দিনের দহন ঝুম বৃষ্টিতে আজ ছাই হয়ে বাতাসে মিলে যাচ্ছে।

✓ টিকাঃ সন্তান প্রতিপালনে বাবা-মায়ের উপস্থিতি, স্নেহ, মায়া, ভালোবাসা আর শাসন খুবই জরুরী। তাই এসবের অভাবে ব্রোকেন ফ্যামিলির অধিকাংশ সন্তানেরাই নষ্ট হয়ে যায়। আবার চাকরিজীবী ব্যস্ত বাবা-মায়ের সন্তানদের প্রতি চরম উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়, যা কোনো ভাবেই কাম্য নয়। সন্তানের পিছনে অর্থ ব্যয় করলেই তারা ভাবেন আসল দায়িত্ব পালন হয়ে গেল। এক সময় এই সব সন্তানেরা মায়াহীন, ভালোবাসাহীন আর কঠোর মনোভাবের হয়ে পরে। তারা একসময় ভারসাম্যহীন জীবন যাপন শুরু করে দেয়।

অথচ সন্তানকে ইসলামিক ফরজ জ্ঞান দেওয়া তথা নামায, রোযা, যাকাত, যিকির, সৃষ্টির সেবা, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ ইত্যাদি সকল কিছু শেখানো এবং তাকে একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পিতা মাতার।

সন্তানদেরকে মুসলিম হিসেবে তৈরি করা পিতা ও মাতার উপর অন্যতম ফরয আইন। এই ফরয দায়িত্বে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নাই। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা নিজদেরকে এবং পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।' (সূরা তাহরিম : ৬)

পিতা-মাতার অবহেলায় সন্তানেরা এক সময় অকালে ঝরে যায়, তাদের আত্মিক মৃত্যু ঘটে। ব্যস্ত, স্বার্থপর আর সম্পদের পিছনে ছুটে বেড়ানো পিতা-মাতাকে অবশ্যই একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। নিজেদের সুখ, আনন্দ আর ভালো থাকার স্বার্থপরতা কাটিয়ে উঠে স্বামী-স্ত্রী থেকে দায়িত্বশীল পিতা-মাতা তে পরিণত হতে হবে। মনে রাখতে হবে আল্লাহ প্রদত্ত আমানত স্বরূপ এই সন্তানদের জন্য বিচারদিবসে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

কৃষ্ণকলি

আজ বিকেলে ছেলে পক্ষ শ্যামাকে দেখতে আসবে। ছোট মামি প্রস্তাবটা এনেছেন। ছেলে একটু গরিব, শ্যামাদের সাথে ঠিক যায় না। কিন্তু তাতে কী? শ্যামার তো চেহারা অত সুন্দর নয়। শ্যামা কালো, খাটো আর শুকনা। গত বছর মাস্টার্স কমপ্লিট করেছে। গত দুই বছর ধরে তার অভিভাবকরা বিয়ের চেষ্টা করছেন। এ পর্যন্ত মোট বারো জন তাকে দেখতে এসেছে। এবার তেরোতম বর পক্ষ দেখতে আসবে। মামি শ্যামাকে সাজিয়ে দিচ্ছেন।

মামি শ্যামাকে বললেন, “এই শ্যামা, এই কাতানটা পর দেখি, কেমন দেখায়?”

ভারী হালকা গোলাপী কাতানটা দেখে শ্যামা ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, “উহ্! এত ভারী শাড়ি, গরম লাগবে যে। তার চেয়ে বরং তোমার ঐ আকাশ নীল সিল্কের শাড়িটা দাও, পরি।”

মামি বিরক্ত হয়ে বললেন, “ভারী দেখেই তো পরতে বলছি। পর, ভালো দেখাবে। তুই যে শুকনা কেউ তা বুঝতেই পারবে না। আজকালকার ছেলেগুলো বড্ড পাঁজি। উচ্চ শিক্ষিত, ভালো বংশ, মেয়ের বাপের টাকা কড়ি, মেয়ের ফিগার সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। নিজে বান্দরের মতো হলেও মেয়ে হতে হবে

ঐশ্বরিয়ার মতো মুখ, কারিনার মতো জিরো ফিগারের। ছেলে ছোকরার চোখ দেখলেই আমি ঠিক বুঝতে পারি। ছোক ছোক করা চোখ, বড্ড পাঁজি, লুলামীর জাত কোথাকার।"

শ্যামা কানে আঙ্গুল দিল। মামি অকথ্য ভাষায় এই প্রজন্মের ছেলেদের গালি দিয়ে যাচ্ছেন। মামির সাথে তর্ক করে সে পারবে না। তার চেয়ে বরং এই ভারী শাড়িটা পরে নিলেই হয়। শ্যামা শাড়িটা ঝটফট পরে নিল। এখন মামি তাকে সাজাতে বসবেন। গায়ের রঙটা তার কালো। মামি ফেসপাউডার আর কী সব ফেস প্যাকের আস্তরণ দিয়ে সেটাকে উজ্জ্বল শ্যামা বানিয়ে ফেলবেন। তারপর ঠোঁট গুলো গাঢ় লাল রঙ দিয়ে সাজাবেন আর চোখগুলোর উপর কালো মাশকারা, কাজল আর কী সব দিয়ে অত্যাচার চালাবেন। শ্যামা না করতে পারবে না। এ রকম মোট বারো বার তার উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে। নিজেকে সঙের মতো লাগে। প্রচণ্ড বিরক্ত লাগে। সাজানোর পর মামি তাকে হাসতে বলবেন। বিরক্তি ভাব লুকিয়ে হাসাটা যে কত কঠিন এটা মামি বুঝবেন না। তারপর মামির অর্ডার দিয়ে বানানো স্পেশাল উঁচু জুতা পরে নিঃশব্দে রুমময় হেঁটে বেড়াতে হবে।

ছোট বোন রানী এসে উঁকি ঝুকি মারছে। রানী এক গাল হেসে বলল, "আপা তোমাকে না গোলাপী বেগমের মতো লাগছে। 'গোলাপী এখন মামির পার্লারে'-নামে সিনেমার শুটিং চলছে, বুঝছ?'

মামি সাজাতে সাজাতে রাগী চোখে রানীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই, ঘর থেকে যাবি? ফাজিল কোথাকার। বড়দের মাঝে পাকনামী করতে এসেছিস।"

রানী ঝাড়ি খেয়ে দাঁত বের করে হাসছে। মেয়েটা শ্যামার ঠিক বিপরীত সত্যিকারের রানীর মতোই চেহারা পেয়েছে, ফুটফুটে ফর্সা, গোলাপী ঠোঁট। দুই বোনের বিপরীত চেহারা। একই মায়ের পেটের দুই বোন। এক বৃন্তে যেন দুই ফুল-কালো আর সাদা।

রানী হাসতে হাসতেই বলল, "মামি, পাকনামী করতে আসিনি। ছেলে পক্ষ মোড়ের বিক্রমপুর মিষ্টান্ন

ভান্ডারের কাছে চলে এসেছে। রনি ভাই তাদের আনতে গেছে। আপা কতখানি রেডি হল তাই জানতে এলাম। মা দেখতে পাঠাল। খবরটা দিয়েই আমি পাশের ফ্ল্যাটের তমাদের বাসায় চলে যাব, বুঝলে? এখানে থাকতে আসিনি।” মামি হাত নেড়ে বললেন, “যা! তোর মাকে যেয়ে বল যে শ্যামা রেডি।”

শ্যামা রানীর দিকে তাকাল। কিশোরী কৌতূহলে ভরপুর দুইটা চোখ। প্রতিবারই সে দেখতে চায় কীভাবে ছেলেপক্ষ মায়ের বানানো এত সুস্বাদু খাবার চেটেপুটে খেয়ে যায়। তারপর আপাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আর খাবারের ঢেঁকুর তুলতে তুলতে হাত নেড়ে জানিয়ে দেয় যে তার এত ভালো আপাকে তাদের পছন্দ হয়নি। কিন্তু কোনো বারেই তাকে থাকতে দেওয়া হয় না। এটা মামির নির্দেশ। মা আলেয়া বেগম সরল সহজ। এই জগৎ সংসারের জটিল হিসেব নিকেষ তিনি বুঝেন না। রানী রান্না ঘরে তার সাহায্য করুক। পাশে বসে থাকুক এটা তিনি চান।

কিন্তু মামি এ যুগের মহিলা, শিক্ষিত, সব প্যাঁচ ঘোচ তার জানা। রানী শ্যামার পাশে ঘুর ঘুর করলে ছেলে পক্ষের কুটিল চোখ রানীর উপর পড়তে পারে। কম্পেয়ার করতে পারে। তাই মামি প্রতিবারেই রানীকে বান্ধবীর বাসায় পাঠিয়ে দেন।

একটু পর দরজার কলিং বেল বাজল। একবার বাজতেই আনোয়ার সাহেব দরজা খুলে দিলেন। বিগলিত হাসি হেসে অতিথিদের বসতে দিলেন। সবাই গল্প করছেন। মাঝে মাঝে হাসির শব্দও শোনা যাচ্ছে। আলেয়া বেগমের বুকটা ধ্বক ধ্বক করছে, তেরোতম পাত্র পক্ষ! পছন্দ করবে তো? ছবি দেখে নাকি পছন্দ করেছে। মেয়ে যে কালো তাও তারা জানে। ছেলে রনি মিষ্টির প্যাকেট ভিতরে নিয়ে এসে বলল, “মা চার প্যাকেট মিষ্টি এনেছে, হাফ কেজি করে প্যাকেট করেছে, যাতে বেশি দেখা যায়। সবচেয়ে সস্তা মিষ্টি নিয়েছে। কঞ্জুস কোথাকার !”

আলেয়া বেগম রাগী চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, “চুপ, হতচ্ছাড়া, দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের মিষ্টি কেনা দেখেছিস। আস্তে বল, শুনলে কষ্ট পাবে যে।”

রনি ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, “শুনলে শুনুক, আমার একটুও পছন্দ হয়নি। কী বিশ্রী চেহারা লোকটার, টাকলু

কোথাকার । টাক ঢাকতে পাজামা পাঞ্জাবির সাথে টুপি পড়ে আসছে । জোচ্চর কোথাকার !"

আলেয়া বেগম রনির দিকে কড়া চোখ পাকিয়ে বললেন, "না জেনে মানুষকে ছোট করতে হয় না, বুঝলি? আর একটা বাজে কথা বললে তোর দাঁত ভেঙে দেব । যা সামনে থেকে ।"

আলেয়া বেগমের বুকের ধ্বক ধ্বকানি আরো বেড়ে গেল । নিজের হার্টবিট যেন নিজেই শুনতে পাচ্ছেন । ছেলে কি আসলেই খুব কুৎসিত? শ্যামার পাশে মানাবে তো? তার মায়াবী কালো মুখের শান্ত মেয়েটাকে কার কাছে বিয়ে দিতে যাচ্ছেন । আল্লাহ! রক্ষা কর । যেটা মঙ্গল সেটাই কর । ছেলে ভালো হলে যেন বিয়েটা হয় আর খারাপ হলে যেন ভেঙে যায় । আল্লাহ তোমার উপর ছেড়ে দিলাম । বিড় বিড় করে দোআ পড়তে লাগলেন । রনি আবার এসেছে । বিরক্তমুখে রনি বলল, "মা, উনারা আপাকে ডাকছেন ।"

শিরিন মামি শ্যামাকে নিয়ে ডাইনিং রুমে এসে দাঁড়ালেন । ডাইনিং আর ড্রয়িং রুমের মাঝে পর্দা বুলানো । শ্যামা ট্রেতে সাজানো চা নিয়ে ভিতরে যাচ্ছে । মামি হতাশ চোখে তাকিয়ে আছেন । আলেয়া বেগম আর শিরিন নিঃশব্দে ডাইনিং এর দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে পাশাপাশি বসলেন ।

মামি চাপা গলায় ফিস ফিস করে বললেন, "বুঝলেন বুবু, পছন্দ হলে বিয়েটা আজই হতে পারে । ছেলের মায়ের সাথে আমার কথা হয়েছে । গত বছর শ্যামাকে আমার বাবার বাড়ি মানিকগঞ্জ নিয়ে গিয়েছিলাম, তখন ছেলের মা মানে হাসনা আপা শ্যামাকে দেখেছেন । আজকে শুধু ফরমালিটি ।"

আনোয়ারা বেগম বললেন, "আল্লাহ ভরসা, আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছি । যেটা ভালো সেটাই হোক । এই শিরিন, ছেলে কি খুব অসুন্দর? আমাদের শ্যামার পাশে কি মানাবে না?"

শিরিন হালকা হেসে বললেন, "না বুবু, অত অসুন্দর নয় । টাইফয়েড হয়েছিল তাই সব চুল পড়ে গেছে, বুঝলে? তাই দেখতে বেশি বয়সী মনে হয় । কিন্তু ছেলেটা খুব ভালো । যদি বিয়েটা হয় তবে দেখ আমাদের শ্যামা ওখানে খুব ভালো থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ । চেহারাই কী সব, বুবু? আমাদের শ্যামা কত ভালো । শুধু গায়ের রঙটা কালো । তাই দেখো, মেয়েটা কতটা ছোট হয়ে থাকে । কতজন দেখে গেল, মেয়েটার মনটাই ভেঙে গেছে । ওর ভিতরের কষ্টটা দেখেছ কখনো? সবাই শুধু সুন্দরই খোঁজে । ভিতরের সৌন্দর্য কেউ খোঁজে

না ।”

শিরিন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন । ড্রয়িং রুমের কোলাহল থেমে গেছে । ছেলে পক্ষের কেউ একজন গলা খাকারি দিয়ে কী যেন বলছেন । শিরিন কান পাতল-

“বুঝলেন ভাই জান, মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়েছে । আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌ । আপনারা চাইলে আজই বিয়েটা পড়াইতে চাই । ছেলের বড় মামা মানিকগঞ্জের মাদ্রাসা মসজিদের ইমাম । উনিও সাথে আছেন । আপনারা রাজি থাকলে উনি বিয়ে পড়াইতে পারবেন ।”

শ্যামার বাবা কী বলবেন বুঝতে পারছেন না । তিনি ইতস্তত করে বললেন, “আমি একটু ভিতরে যাই, আমার বড় ভাই মানে শ্যামার চাচার সাথে কথা বলি । ওর আরো চাচারা আছেন, মামারা আছেন । একটু পরামর্শ করে জানাই আর কী ।”

ছেলের মামা ইমাম সাহেব এবার মুখ খুললেন, “মেয়ে আপনার, সিদ্ধান্ত তো আপনাকেই নিতে হবে ভাইজান । তবে পরামর্শ করা সুন্নত । আমরা এই এলাকায় ঘণ্টা দুই থাকি । আপনি এই সময়ে সবার সাথে কথা বলে ডিসিশন নেন । আমরা মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত মসজিদেই থাকব ।”

সবাই চলে গেল । বাবা শ্যামার দিকে তাকালেন, মেয়েটা থম থমে মুখ করে বসে আছে । আনোয়ার সাহেব আলেয়া বেগমকে ভিতরে ডাকলেন । বললেন, “মেয়ের অনুমতি নাও । মেয়ের পছন্দ হইছে কিনা শোন । পছন্দ না হলে আমি প্রস্তাবটা ভেঙে দেব । আমার মেয়ের মন না চাইলে আমি বিয়ে দেব না । মেয়ে আইবুড়ো হোক আর যাই হোক । আমার মেয়ে আমারই থাক ।”

শিরিন মামি মুখ খুললেন, “দুলাভাই, মেয়েরা কি আর মুখ ফুটে হ্যাঁ বলে । আর সবাই আপনারা শুধু ছেলের বাহ্যিক রূপটাই দেখছেন । ছেলে, শুনেছি খুব ভালো আর পরহেজগার । তার মাও খুব পর্দানশীন ভালো মানুষ । আপনি রাজি থাকলে, বুবু রাজি থাকলে আমি শ্যামাকে রাজি করাই ।”

আনোয়ার সাহেব শিরিনকে থামিয়ে দিলেন, "শিরিন এখানে জোরাজুরির কিছু নেই। শ্যামার মন যা বলে তাই শুনি। বিয়েটা শ্যামা করবে, তুমি নও।"

শিরিন মামি চুপ হয়ে গেলেন। শ্যামার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। কষ্টে না আনন্দে কেউ তা জানে না। শ্যামা মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানিয়ে দিল। বাড়ি ভর্তি মানুষ। ফোন পেয়ে সবাই চলে এসেছে। আজ রাতেই শ্যামার বিয়ে পড়ানো হবে। ছেলের নাম আব্দুল্লাহ। মানিকগঞ্জে বাড়ি। পিতৃহীন ছেলে মাতুলালয়ে বড় হয়েছে। ছেলের মা অনেক কষ্ট করে ছেলেকে বড় করেছেন। মাস্টার্স পাশ করে এখন একটা বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতা করছেন। স্বচ্ছলতা এসেছে কিন্তু প্রাচুর্য নেই।

শ্যামার মেজ চাচা-চাচি এসেছেন। এই চাচি সব সময় শ্যামার ব্যাপারে নাক ছিটকাতো। চাচাতো ভাই আবির শ্যামাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। চাচির রক্তচক্ষুতে আর সে প্রস্তাব এগোয়নি। চাচির যেমন নাক উঁচু স্বভাব তার মেয়েরও ঠিক একই। চাচাতো বোন আশাও এসেছে। আশা আর শ্যামা একই বয়সী। আশা দেখতে খুব সুন্দর। তাই অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছে এক ধনকুবের সাথে। গা ভর্তি গহনা আর দামি সাজ সজ্জায় আবৃত হয়ে এসেছে। মেজ চাচি আর ছোট চাচি দুই জন মিলে নাক ছিটকানো গল্প করছে।

"শুনলাম ছেলে নাকি এতিম, মামার বাড়িতে আশ্রিত ওরা। ছেলের মা নিশ্চয়ই ঐ বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করার বিনিময়ে আশ্রয় পেয়েছিল। শ্যামারও কী চাকরানি মার্কা কপাল। ছি! কি ছেলের সাথে ওরা বিয়ে দিচ্ছে।"

ছোট চাচি মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঐ যে শ্যামার মামি আছে না, শিরিন, ঐ তো প্রস্তাবটা এনেছে। ওর নাকি দূরসম্পর্কের আত্মীয় হয়। নিজে ছোট ঘর থেকে এসেছে, শ্যামাকেও ছোট ঘরে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে।"

মেজ চাচি শ্যামাকে শুনিয়েই যেন বললেন, "আহ্ ! আমার মেয়েটার কী কপাল ! কত বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে। রাজ রানীর মতো থাকে। শরীরের ওজনে গহনা দিয়ে বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছে। এরা কী এনেছে রে? কোনো সোনা দানা আনে নি?"

ছোট চাচি শিরিন মামির দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমি কী আর অত কিছু জানি? যে ঘটক তাকেই জিজ্ঞেস করেন না?”

শিরিন মামির থমথমে মুখটা যেন আরো গম্ভীর হয়ে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “না তেমন কিছু আনে নি। একটা সোনার চেইন আর দুইটা কানের দুল। এক ভরির কাছাকাছি সোনা দিয়ে দেনমোহর উসুল করবে। ছেলে তার সাধ্যমত এনেছে।”

দুই চাচি গা দুলিয়ে মুখ টিপে হাসলেন। শ্যামার কান দুটো গরম হয়ে উঠলো। সুন্দরী সুসজ্জিত কাজিন আশা এসে পাশে বসল। আর কী খোঁচা দিবি রে তোরা। কালো মেয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। খুশি হ, তা না, তোদের বংশের বোঝা নেমে যাচ্ছে। একটা পাত্র তো এ পর্যন্ত জোগাড় করতে পারিস নি আবার এত খুঁত ধরতে বসে গেছিস। পাঁজি কোথাকার। মনে মনে বকে দিল শ্যামা। আশা শ্যামার হাত ধরল, আহ্লাদি গলায় বলল “শ্যামা তুই বিয়েটা মন থেকে করছিস তো?”

শ্যামা চুপ হয়ে গেল। নিজের ভিতরের দ্বিধা দ্বন্দ্ব সে কাউকে দেখাতে চায় না। চাপা রাগ অভিমান সব তুষের মতো ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। আশা কি সেই আগুনে ঘি ঢালতে এসেছে। শ্যামা শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

শ্যামার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। রনির আওয়াজে রুমের ভিতরের সব গল্প, কানাকানি, হাসাহাসি থেমে গেল। ছেলের বড় মামা ইমাম সাহেব আর স্থানীয় কাজী আসছেন। তারা বিয়ে পড়াবেন। মহিলারা মাথায় বড় ঘোমটা টানলেন। শিরিন মামি শ্যামার পাশে গিয়ে বসলেন। ওর পিঠে একটা হাত রাখলেন। কাজী সাহেব বলছেন, “বলেন কবুল, বলেন কবুল......”

শ্যামা যেন কিছুই শুনতে পারছে না। তার মাথার ভিতর শোঁ শোঁ শব্দ করছে। ঠোঁট কাঁপছে। শিরিন মামি পিঠে আলতো চাপড় দিয়ে বললেন, “ শ্যামা, বল আলহামদুলিল্লাহ্।” শ্যামা মৃদু কান্না জড়িত কণ্ঠে কবুল বলল। সবাই আলহামদুলিল্লাহ্ বলে চলে গেল।

রাতের খাবারের পর শ্যামাকে সবাই বিদায় দিতে নিচে নামল। একটা রঙ চটা ভাড়া করা মাইক্রোবাস

গেটের সামনে দাঁড়ানো ।

শ্যামা ঝাপসা চোখে তাকাল । একটা পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চেপে সুদর্শন কোনো রাজপুত্র এসে শ্যামাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে । গা ভর্তি গহনা আর দামি কাতানে সুসজ্জিত থাকবে সে । ফুল দিয়ে সাজানো ব্র্যান্ডের কোনো গাড়িতে চেপে বসবে রাজপুত্রের পাশে । কত স্বপ্ন যে বুনে ছিল বিয়ে নিয়ে । তার বান্ধবীদের আর কাজিনদেরও আড়ম্বর পূর্ণ বিয়ে হয়েছে । শুধু তারই বিয়েটা হচ্ছে ফকিরের মতো । কোথাকার কোন এতিম ছেলেকে নিয়ে এসে ধরে বেঁধে দিয়ে কালো মেয়ের বোঝাটা নামিয়ে দিচ্ছে ।

শুধু গায়ের চামড়াটার জন্য, কৃষ্ণবর্ণের জন্য তাকে ছোট বেলা থেকে কত কথা শুনতে হয়েছে। তার নিজের দাদি, চাচিরাও বলত এ মেয়ে পার করতে বেগ পেতে হবে ।

অথচ, সে নিজেকে কৃষ্ণকলি ভাবত । হয়ত কোনো উদার মনা তার মনের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হবে । না সে রকম কেউ আসে নি । 'কৃষ্ণকলি' বলতে আসলে কিচ্ছু নাই । সব ভাওতা । সবাই কালো মেয়েকে কালো পেত্নীই ভাবে । পেত্নীকে আর কে বিয়ে করবে?

কত প্রস্তাবই তো এসেছিল । সবাই সুন্দর মেয়ে খোঁজে । দ্বীনদার ছেলেপক্ষও এসেছিল । তারাও একই । আবার উদার মনা, সংস্কৃত মনারাও এসেছিল । তারা মুখে ভাব ধরলেও ভিতরে সৌন্দর্যের পুজারী । কত জনের কাছে রিজেক্ট হতে হয়েছে । কত কষ্ট সে পেয়েছে, কেউ তা জানে না । সব কষ্ট হৃদয়ের গোপন প্রকোষ্ঠে সে সাজিয়ে রেখেছে ।

এ রকম গরিব বর আর কুৎসিত ছেলে ছাড়া আর কে আসবে? শ্যামার চাপা গুমোট কান্নাটা চোখ বেয়ে নেমে অঝোরে ঝরতে লাগল । শিরিন মামি কাঁদতে নিষেধ করেছিলেন । মেকআপ নষ্ট হয়ে আসল কালো চামড়াটা না বের হয় । সে কথা বার বার মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ।

মেয়েরা বিদায়ে কাঁদে । বাবা, মা, ভাই, বোন, চেনা পরিবেশ, চেনা ঘর সব ফেলে যাবার কষ্টে কাঁদে । আর শ্যামা কাঁদতেও পারছেনা । তার এই কালো চামড়াটার জন্য । সব দোষ এই কৃষ্ণবর্ণের । না হলে কি তার এমন বিয়ে হয় ।

টিকাঃ আমাদের সমাজে কালো মেয়ের বিয়ে দেওয়া অনেক কষ্টকর। সবাই শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য খোঁজে। অথচ বর্ণবাদ একটা সুস্পষ্ট জাহেলিয়াত। আসলে এইসব মানুষ আসাবিয়্যাহ রোগে আক্রান্ত। কনের গায়ের রঙ যদি কালো হয় সে কী করবে? তার মালিক যদি তাকে কালো বানায় তাহলে তো কিছুই বলার থাকে না। কারন ফায়ালুল্লিমা ই'উরিদ্ব (তিনি আল্লাহ যা খুশি তাই করেন)। সাদা চামড়া এতোই দামি? সাদা চামড়া হলেই সে কি সুন্দর? সুন্দর তো সেই যার তাকওয়া বেশি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এঁর দুধমা হালিমাতুস সাদিয়া (রাঃ) কালো মানুষ ছিলেন। বিলাল (রাঃ)ও কালো মানুষ ছিলেন। কাবা বাইতুল্লাহ কালো। যে জান্নাতি পাথরে চুমু দেওয়া হয় সেটিও কালো। বর্ণবাদকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভেঙে চুরমার করেছেন। সেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উম্মত হয়েও আমরা নিজেদের পরিবর্তন করি না। আবার অনেকেই মেয়ের বাড়ি কোন অঞ্চলে, সেটাও বিবেচনা করে থাকে। এই আঞ্চলিকতাবাদও তো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভেঙে চুরমার করেছেন, কারণ এটাও একটা জাহেলিয়াত।

ইসলাম ধর্মে বিয়ের বেলায় পাত্রীর মধ্যে ধর্মভীরুতা, জ্ঞান, রূপ-সৌন্দর্য, বংশমর্যাদা ও ধন-সম্পদ এ পাঁচটি গুণ দেখতে বলেছে। আমাদের সমাজে বিয়ের পাত্রী হিসেবে শুধু সৌন্দর্যকেই বেশি মূল্যায়ন করা হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ(সাঃ) পুরুষকে ধর্মপরায়ণ নারী নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবি (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, চারটি বৈশিষ্ট্যের কারণে কোন মেয়েকে বিয়ে করা যায়। ১.তার সম্পদ। ২.বংশ-মর্যাদা। ৩. রুপ-লাবণ্য। ৪.তার দ্বীনদারী। তন্মধ্যে দ্বীনদার নারীকে বিয়ে

করে দাম্পত্য জীবনকে সফল ও বরকতময় করে তোলে। [তিরমিযী:১/২০৭]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই হাদিসে স্বাভাবিক অবস্থার প্রতি খেয়াল করে কনের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ ধর্মপরায়ণতাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। রাসূল (সাঃ) বলেন, এমন সতী-সাধ্বী স্ত্রী বরণ করা উচিত, যে তোমাকে তোমার দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে সাহায্য করে; যা সব সম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।'

অন্য হাদিসে রাসূল (সাঃ) সৎ আমানতদার নারী বিয়ের ঈঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ধর্মভীরু স্ত্রী এক সৌভাগ্যের সম্পদ; যাকে তুমি দেখে পছন্দ করো এবং যে তোমার মন মুগ্ধ করে, আর তোমার অবর্তমানে তার ব্যাপারে ও তোমার সম্পদের ব্যাপারে সুনিশ্চিত থাকে। পক্ষান্তরে ধর্মহীন স্ত্রী দুর্ভাগ্যের আপদ; যাকে দেখে তুমি অপছন্দ করো এবং যে তোমার মন মুগ্ধ করতে পারে না। যে তোমার ওপর মানুষের হামলা চালায়। আর তোমার অনুপস্থিতিতে তার ও তোমার সম্পদের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে পারে না।' (সিলসিলা সহিহা ১৮২, ইবনে হিব্বান)।

বর্তমান সময়ে অনেকেই দ্বীনদারী না দেখে অর্থ সম্পদ আর সৌন্দর্যকেই মুখ্য হিসেবে গণ্য করে থাকে। বিয়ের আগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রূপ-সৌন্দর্য আর কে বেশি যৌতুক দিতে পারবে তাই দেখে থাকে। ছেলেকে ভালো একটা চাকরি পাইয়ে দেয়ার মতো ক্ষমতাবান বাবা রয়েছে কার। সংসারের টানাটানি পড়লেই বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনতে পারবে কিনা। এসব কারণে আজকাল সংসারের সুখ নামের পাখি উধাও। রাত দিন ঝগড়া ফাসাদ লেগেই থাকে অধিকাংশ সংসারে। অথচ এই লোভকে দূরে রেখে ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী বিয়ে করা গেলে সংসার সুন্দর ও সুখের হবে বলে দাবি করেছেন রাসূল (সাঃ)। আসুন বিয়েতে পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কনে কালো না ফর্সা, গরিব না ধনী এসব বিবেচনা না করে তাকওয়া মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করি।

দুঃখবিলাসী

আজ তারা হ্যাং আউটে গেছে। দামি রেস্টুরেন্টে চেক ইন দিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে। হাসিমুখে কতগুলো ছবি আপলোড করেছে। শ্যামা তার ভাঙা অ্যান্ড্রয়েড সেটটাতে সুন্দরী কাজিন আশা আর জুয়েলের জুটিবদ্ধ হাসিমুখের ছবিগুলো দেখছে। কী সুন্দর! পিছনের জায়গাটা কত সুন্দর! নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, আলো ঝলমলে সোনালি সকালে তাদের দুইজনকে কত রোমান্টিক আর সুন্দরই না লাগছে। আহঃ তার জীবনটা তো এমনই হতে পারত। এমন সুন্দর, রঙিন আর স্বাচ্ছন্দ্যময়। সাতসকালে এইরকম ছবি দেখে শ্যামার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

তার সংসারে স্পষ্ট দারিদ্র্যের ছাপ। দোচলা ঘরের মাঝে একটা পার্টিশন দিয়ে দুইটা রুম বানানো হয়েছে। একপাশের রুমে তারা স্বামী-স্ত্রী আর অন্য পাশের রুমে তার শাশুড়ি আর ননদ থাকে। টিনের চালে পুটিং দিয়ে বড় বড় ফুটা গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবুও ছোট ছোট ফুটা দিয়ে আলোর কিরণমালা ঘরে ঢুকে পরে। সেদিকে তাকিয়ে শ্যামা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ছুটির দিনে এরকম রৌদ্রজ্জ্বল সকালে ঘুরতে কার না ইচ্ছে করে। বিয়ের প্রায় একবছর হয়েছে, সবাই যখন হানিমুনে যায়, এখানে সেখানে ঘুরতে

যায় আর চেক ইন লিখে ফেসবুকে ছবি আপলোড দেয় শ্যামার তখন কান্না পায় ।

তারও তো খুব ঘুরে বেড়ানোর শখ ছিল । স্বামীর হাত ধরে কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে হাঁটুজল লোনা পানিতে দাঁড়িয়ে থাকার ইচ্ছে ছিল । জ্যোৎস্না রাতে সমুদ্রজল আর চাঁদের মিতালী দেখার ইচ্ছে ছিল । উঁচু পাহাড়ে দুইজন গল্প করতে করতে চূড়ায় উঠার শখ ছিল । সেই নির্জন চূড়ায় দাঁড়িয়ে তার সঙ্গী চিৎকার করে 'ভালোবাসি' বলে ডাক দেবে, পাহাড়ে সে ডাক প্রতিধ্বণিত হয়ে ফিরে আসবে । কত রোমান্টিক চিত্রনাট্য সে মনে মনে এঁকেছিল । হায়! সবই গুড়েবালি ।

শ্যামার প্রচণ্ড কান্না পাচ্ছে । রান্নাঘর থেকে তার শাশুড়ি ডাকছেন । শীতের সকালে কাঁথার মধ্যে আরো কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে ফেসবুকিং করতে ইচ্ছে করছে । তা আর হলো না । নিতান্ত অনিচ্ছায় বিছানা ছেড়ে সে রান্না ঘরের দিকে হাঁটা দিল ।

উঠোনে খরের চালার ছোট্ট রান্না ঘর । বাঁশের বেড়া দিয়ে এক পাশে ঘেরা যাতে বাতাস এসে চুলা না নিভে যায় । রান্নাঘরে ঢুকতেই সে অবাক হয়ে গেল । তার শাশুড়ি বিভিন্ন রকমের পিঠে তৈরি করেছেন । তিনি সেগুলো মাটির পাতিলে সাজিয়ে রেখেছেন । ভাপা পিঠে, দুধচিতই পিঠে, তেলভাজা পিঠে, নকশী পিঠে, কুলি পিঠে আরো কত নাম না জানা সুদৃশ্য পিঠে । এতগুলো উনি একা একা কখন বানালেন । শাশুড়ি শ্যামার বিস্ময় মাখা মুখ দেখে বললেন, 'বৌমা, দেখেছ, কত পিঠে বানিয়েছি । আব্দুল্লাহ নাকি তোমাকে নিয়ে আজ ঢাকা যাবে, তোমার বাবার বাড়িতে নিয়ে যাবে । দেখো, আমি তোমার আব্বা-আম্মার জন্য কত পিঠে বানিয়েছি ।'

শ্যামা ঢোক গিলল । মিষ্টি কেনার মুরোদ নাই, মাকে দিয়ে সাত সকালে ছাইপাশ পিঠে ভেজে নিয়েছে । কঞ্জুস কোথাকার! শ্যামা চুপ হয়ে রইল । শাশুড়ি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বউমা, তোমার আব্বা-আম্মা এগুলো খাবেন তো? তুমি না হয় শহরে বড় হয়েছ কিন্তু তারা তো গ্রাম থেকেই এসেছেন । তারা নিশ্চয় পছন্দ করবেন ।'

শ্যামা হ্যাঁ সূচক মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, খুব পছন্দ করবেন। আমাকে দিন, আমি এগুলো বেঁধে ফেলি।'

পাতিলের মুখ পুরাতন পেপার আর পাটের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। শ্যামা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হাঁড়িটার মতো তারও মাঝে মাঝে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে। লজ্জা আর দারিদ্র্যের অসম্মানতায়। সে কোনো আত্মীয় স্বজনের বাসায় বেড়াতে যেতে পারে না। তার কোনো দামি শাড়ি নাই, গহনা নাই। তার প্রায় সব আত্মীয়দের ঢাকায় বাড়ি আছে, গাড়ি আছে। তার সমবয়সী কাজিন আশা আর তার স্বামী জুয়েল কত জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে যায়, আত্মীয়রাও তাদের বাড়িতে আসে, পার্টি হয়, হই হুল্লোড়, খাওয়া দাওয়া হয়। ফেসবুকে খাবারসহ গ্রুপ ছবি, বেড়াতে যাবার ছবি, মজা করার ছবি আপলোড করে। টাকা আর প্রাচুর্যের দেখানোর প্রতিযোগিতা হয় যেন।

তার ধনী চাচারা, মামারা তাকে প্রায় ভুলেই গেছে। জন্মদিন, বিয়ে, আকিকা, ঈদ পরবর্তী পুনর্মিলনী, বিভিন্ন অকেশনের গেট টুগেদারে সব কাজিনেরা এক হয়, শুধু শ্যামা বাদ থাকে। তারা জানে শ্যামা গরিব, আসার সামর্থ্য নাই, তাই তাকে কেউ ফোনও দেয় না। এখন আত্মীয়তাও মেইনটেইন হয় সম্পদের স্ট্যাটাস দেখে। একই স্ট্যাটাস বা উঁচু স্ট্যাটাসের আত্মীয়রা পূজনীয় আর নিচু স্ট্যাটাসের আত্মীয়রা যেন অচ্ছুৎ কিছু। এদের দেখলেও যেন বিরক্ত লাগে, মনে হয় হাত পাতার জন্য এসেছে। তাদের সাথে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায় না। হাতে কিছু ধরিয়ে দিয়ে বিদায় দিতে ইচ্ছে করে।

শ্যামার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে গেল। দরিদ্রতার অসম্মান তাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তার স্বামী ঠিক উল্টা। আব্দুল্লাহ রিযিকের সংকোচনকে ভালোবাসে। প্রায়ই বলে সম্পদ কম থাকাই ভালো, আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহিতা কম করতে হবে। আমার যা আছে তাতেই আলহামদুলিল্লাহ্। কত মানুষ না খেয়ে আছে, ঘর নাই, কাপড় নাই, আমার তো সব আছে। আব্দুল্লাহকে কখনো হতাশ হতে দেখে নি সে। সব অবস্থায় মুখে একটু মৃদু হাসি লেগেই আছে। প্রশান্ত চেহারার অধিকারী সে।

আব্দুল্লাহ ঘরে এসে ঢুকেছে। এই শীতেও তার গায়ে একটা পাতলা গেঞ্জি। সবজি ক্ষেতে কাজ করে এসেছে বোধ হয়। ছুটির দিনে সকালে সে বাগানে কাজ করে। ফুল আর শীতের সবজিতে তার বাগান ভরে

গেছে। ঘরে ঢুকে ভেজা হাত মুখ মুছতে মুছতে বলল, ‘শ্যামা, দ্রুত রেডি হও। আমরা তো আজকে ঢাকায় যাব।’

শ্যামা রাগ চেপে বলল, ‘গতরাতেই তো বলতে পারতে? ঢাকায় কি কোনো কাজ আছে? কলেজ সরকারীকরণের আন্দোলন, অনশন বা অফিসে ফাইল সাবমিটের দৌড়াদৌড়ি আছে নাকি?’

শ্যামার খোঁচাটা গায়ে না মাখিয়েই আব্দুল্লাহ বলল, ‘আরে না। কোনো কাজ নাই। তোমাকে অনেকদিন কোথাও নিয়ে যাই না। তাই একটু নিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম আর কী। মন টন কেমন খারাপ করে থাকো, তাই ভাবলাম মায়ের বাড়ি বেড়াতে নিয়ে গেলে হয়ত ভালো লাগবে।’

শ্যামা মুখে কটাক্ষের হাসি এনে বলল, ‘বাহ! আমার মনের তো ভালোই খবর রাখা শুরু করেছ?’

আব্দুল্লাহ শ্যামার রাগটা ভাঙার চেষ্টা করে বলল, ‘হুম, না রাখলে চলবে। তুমি তো আমার একমাত্র বউ।’

‘বউ কি মানুষের দশটা থাকে নাকি? একটাই তো থাকে।’

‘থাকে, থাকে, রাজা-বাদশাদের অনেক রানী থাকে। গল্পের বইয়ে পড় নাই, বড়রানী, মেজরানী, ছোটরানী, সুয়োরানী, দুয়োরানী আরো কতরানী!’

‘তুমি কি রাজা নাকি?’

আব্দুল্লাহ শ্যামার কাছে ঘনিষ্ট হয়ে কাঁধে হাত রেখে বলল, ‘কেন? আমি কি তোমার রাজা নই? আমি তো এই কুঁড়ে ঘরের রাজা আর তুমি আমার হৃদয়ের রানী।’

শ্যামা হাত সটকে দূরে সরে গিয়ে বলল, ‘যত্তসব আদিখ্যেতা। যাব যে তা কী পরে যাব শুনি?’

‘কেন, বোরকা পরে যাবে?’

‘আরে, তার নিচে কী পরব?’

‘কি পরবে, জামা না হয় শাড়ি পরবে। তোমার যেটা ভালো লাগে।’

‘আমার কি ভালো কোনো জামা আছে না শাড়ি? সেই যে বিয়েতে দুইটা শাড়ি দিয়েছিলে আর কী দেবার

নাম আছে? পুরাতন শাড়ি পরে গেলে মা ভাববে আমাকে তুমি ভালো রাখো নাই, বুঝলে?'

'আহঃ, ভালো রাখার মানদণ্ড কি নতুন জামাকাপড়ে নাকি? কী যে সব উল্টা-পাল্টা বকো না। নতুন কাপড় লাগবে আগে বললেই তো একটা না হয় কিনে দিতাম।'

'থাক, লাগবে না। বলেছ তাতেই আমি উদ্ধার হলাম। পুরাতনটাই পরে যাব।'

'হুম, ঝটফট রেডি হয়ে নিও। ঢাকায় যেয়ে জুমুআর জামাত ধরতে হবে।'

শ্যামা পুরাতন ট্রাংকটা খুলল। শীতের কাপড়ের সাথে তার শাড়ি দুটো উঁকি দিল। নীল সিল্কের শাড়ি আর গোলাপী কাতানটা টেনে বের করল। সিল্কের শাড়িটা মেলে ধরতেই একটা ছোট ফুঁটা দেখতে পেল। না, এটা পরা যাবে না। তেলাপোকা কেটেছে। শিরিন মামীর দেওয়া গোলাপী শাড়িটা যেটা পরে তার বিয়ে হয়েছিল, সেটাই পরতে হবে। গোলাপী ঝকমকে কাতানটা পরে সে আয়নার সামনে দাঁড়াল, একটু কাজল আর লিপস্টিক দিল। শ্যামলা মায়াবতী মুখটা কী সুন্দর দেখাচ্ছে। সকালের ঝলমলে রোদে ঝকমকে সাজও দুঃখ বিলাসী শ্যামার মুখে হাসি ফুটাতে পারল না। নতুন শাড়ি না পাবার দুঃখে হাসিমুখটা নিমিষেই আঁধারে ছেয়ে গেল। একটা দুঃখের কথা মনে পড়লেই সব দুঃখ যেন মেঘের দলের মতো ছুটে আসা শুরু করে। হানিমুনে না নিয়ে যাবার দুঃখ, বিয়েতে দামি শাড়ি-গহনা না পরার দুঃখ, প্রাচুর্যহীন আটপৌরে টানাটানির জীবনের দুঃখ, মায়ের বাড়িতে মিষ্টি না নিয়ে যেতে পারার দুঃখ, আরো কত দুঃখ মিলেমিশে এক হয়ে কালো বিশাল মেঘের আকার ধারণ করে বৃষ্টি হয়ে ঝরতে থাকল।

মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারা একটা লক্কর ঝক্কর মার্কা বাসে উঠল। শ্যামা জানালার পাশে বসল। আব্দুল্লাহ খুব খুশি খুশি মনে পাশে এসে বসল। লোকটার মনে এত আনন্দ, সবসময় হাসিমুখে থাকে। পুরাতন পাঞ্জাবিটা গায়ের সাথে লেপ্টে আছে। এটা তো সেই পাঞ্জাবিটা যেটা পরে সে তাকে বিয়ে করতে এসেছিল। শ্যামার দেখে খুব মায়া লাগল, চোখে পানি চলে এল। আহঃ তার যদি টাকা থাকত তাহলে সে কয়েকটা নতুন শার্ট-প্যান্ট আর পাঞ্জাবি কিনে দিত। শ্যামা মায়াভরা চোখে আব্দুল্লাহকে

দেখল। রোদ এসে মুখে পরেছে। ফর্সা সুন্দর, নিষ্পাপ প্রশান্ত মুখ। আব্দুল্লাহর ঠোঁট নড়ছে, বিড়বিড় করে কী যেন পড়ছে। শ্যামা মায়াভরা কণ্ঠে ডাকল, 'কী ভাবছ? কী পড়ছ মনে মনে?'

আব্দুল্লাহ চমকে উঠল, যেন সে অন্য কোনো জগৎ থেকে ফিরে এল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন খারাপ করা কণ্ঠে বলল, 'সূরা কাহাফ পড়ছি। জুমুআ বারে সূরা কাহাফ পড়া একটা সুন্নাহ, তাহলে পরের জুমুআ বার পর্যন্ত ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।'

'পুরোটা তোমার মুখস্ত?'

'হ্যাঁ, আমি এটা অনেক ছোটবেলায় মুখস্ত করে ফেলেছি। ১১০টা আয়াত। আব্বা আমাদের দাদা বাড়ির মসজিদের ইমাম ছিলেন। প্রতি শুক্রবার সকালে মসজিদের চটে বসে তিনি এটা পড়তেন আর আমি পাশে বসে শুনতাম। শুনতে শুনতেই মুখস্ত করে ফেলেছিলাম। আব্বা যখন পড়তেন আমিও তার সাথে মনে মনে ঠোঁট মিলাতাম।'

'বাহ! তোমার তো অনেক মুখস্তশক্তি।'

'আলহামদুলিল্লাহ্, আমার শুধু মুখস্ত শক্তিই নয় আমার স্মরণ শক্তিও প্রখর। আমার আব্বার সাথে কাটানো সব স্মৃতি আমার মনে আছে অথচ তখন আমার বয়স ছিল মাত্র নয় বছর। সেইসব স্মৃতি আমি সযত্নে তুলে রেখেছি।'

'তুমি তখন কোন ক্লাসে পড়তে?'

'আমি তখন ক্লাস ফোরে পড়তাম। আব্বা আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন, কখনো চোখের আড়াল হতে দিতেন না। আমি হবার পর আমার তিনজন ছোট ভাই বোন কী যেন রোগে আঁতুড় ঘরেই মারা গিয়েছিল। তাই হয়ত সব সময় হারানোর ভয়ে চোখে চোখে রাখতেন। শুক্রবারে ছুটির দিনে যখন আমার বয়সী ছেলেরা দল বেঁধে মাঠে ছুটে বেড়াত তখন আমি আব্বার সাথে মসজিদে থাকতাম। গল্প করতে করতে দুইজন মিলে মসজিদটা পরিষ্কার করতাম। তারপর অযু করে চটের উপর বসে আব্বা সূরা কাহাফ পড়তেন আর আমি

আমপাড়া নিয়ে বসতাম। আব্বা ভরাট কণ্ঠে তেলোয়াত করতেন। কী সুর, মসজিদের ভাঙা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে ফিরে আসত। আমিও তার সাথে মনে মনে ঠোঁট মিলাতাম। আমার পুরা সুরাটা মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কখনো তাকে শুনাতে পারি নি। একদিন তাকে আড়াল থেকে শুনিয়েছিলাম।'

'কেন? আড়াল থেকে কেন?'

'এক গ্রীষ্মের শুক্রবারে আব্বা আর আমি বসে পড়ছিলাম। আব্বা পনেরো আয়াত পর্যন্ত পড়ে থেমে গেলেন। তার গা ঘামতে শুরু করল। আমার কাছে খাবার পানি চাইলেন। আমি বাহিরের কলপাড়ে যেয়ে পানি আনলাম। এসে দেখি আব্বা চটের উপর ডান কাত হয়ে শুয়ে আছেন। আমি কয়েকবার ডাকলাম, তিনি কোনো সাড়া দিলেন না। আমি চিৎকার করে ডাকলাম। আশেপাশের মানুষ ছুটে এল। সেই শুক্রবারে আমাদের মসজিদ থেকে জুমুআর আজান দেবার আগে আব্বার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হলো। পাশের গ্রামের ইমাম সাহেব এলেন, দুই গ্রামের মানুষে ছোট্ট মসজিদটা ভরে গেল। মসজিদের মাঠটাতে জানাজা হলো। মসজিদের পাশের জায়গাটাতে আব্বাকে দাফন করা হলো। আকাশের মেঘ ঘন হয়ে জমতে থাকল। সবাই চলে গেল। আমি আব্বার কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সূরা কাহাফের ষোলো আয়াত থেকে তেলোয়াত করা শুরু করলাম। বৃষ্টি টপটপ করে পড়তে লাগল। আমি পড়ছি আর কাঁদছি, মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চেয়ে আল্লাহকে ডাকছি, আমি এতিম, আমি অসহায়। আমার প্রিয় মানুষটা চলে যাবার কষ্টে আমি চিৎকার দিয়ে কাঁদছি। মেঘের গর্জনে আর বৃষ্টির শব্দে সেই কান্না কেউ শুনতে পারল না। পুরা সূরা তেলোয়াত শেষ হলে আমি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।'

আব্দুল্লাহ পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে চোখের পানি মুছছে। শ্যামার চোখ দিয়ে কখন পানি গড়িয়ে পড়েছে, সে নিজেও জানে না। পিতৃহারা মানুষটার ভিতর এত চাপা দুঃখ আর কষ্ট লুকিয়ে আছে, সে তা কখনো দেখার চেষ্টা করে নি। নিজের আলগা দুঃখ সাজাতেই সে ব্যস্ত ছিল তাই এত কাছে থাকা মানুষটার দুঃখভরা সমুদ্রটা সে কখনো ছুঁয়েও দেখে নি।

টিকাঃ শত কষ্টের মধ্যেও যারা আল্লাহ্‌র ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকেন আর প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করেন, শুধু মাত্র তারাই প্রকৃত সুখী আর প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ সুবহানা তায়াল বলেন, 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয় (এরা তারাই) জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই কেবল চিত্ত প্রশান্ত হয় ।' (সূরা রাদঃ২৮)

ভোগ বিলাসে মত্ত বাহ্যিক কৃত্রিম হাসিমুখের মানুষেরা হ্যাং আউট, দামি রেস্টুরেন্টের চেক ইন, খাওয়া-দাওয়া, ঘোরাঘুরি, আনন্দ ভ্রমণে ব্যস্ত । তাদেরকে বাহির থেকে দেখলে সুখী মনে হলেও আসলে তাদের ভিতরটা ফাঁকা । ভোগবাদী এইসব মানুষদের ভিতরে এতটুকু শান্তি নাই । আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে দূরে থাকা মানুষদের হৃদয় প্রশান্ত নয় । কেননা শুধুমাত্র আল্লাহর স্মরণ বা যিকিরেই হৃদয় প্রশান্ত হয় ।

ব্যভিচারিণী ও একজন পবিত্র সখিনা

সাব্বিরের সাথে ফেসবুকে পরিচয় হয়েছিল অনামিকার। চ্যাট বক্সে সারাদিন সাব্বির অনামিকাকে ভালোবাসার গল্প শুনাত, কী সুন্দর কাব্য, কী সুন্দর শব্দ চয়ন, অনামিকা বিভোর হয়ে যেত। কী যে যাদু ছিল সেই মেসেজ গুলোতে!

এভাবে ম্যাসেঞ্জারে মেসেজ আদান-প্রদান করতে করতেই কিভাবে যেন এক মাস চলে যায়। অনামিকা সদ্য এসএসসি পাশ করেছে। এখনো কলেজে ভর্তি হয় নি। সারাদিন কোনো কাজ নাই তাই মোবাইলে ফেসবুক আর ম্যাসেঞ্জার নিয়েই পড়ে থাকে। আর সাব্বির ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ফেসবুক আইডিতে সাব্বিরের ঢাকা ইউনিভার্সিটির ম্যাথের ছাত্র হিসেবে পরিচয় দেওয়া আছে। অনামিকার সাথে বন্ধুত্বটা যেদিন প্রেমে গড়াল, সেদিন সাব্বির ফেসবুকে রিলেশনশীপ স্ট্যাটাস সিঙ্গেল থেকে ইন অ্যা রিলেশনশীপ লিখেছিল। চমৎকার একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিল। অনামিকার প্রথম প্রেম, স্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল। সাব্বির প্রচণ্ড হ্যান্ডসাম, চমৎকার স্ট্যাটাস দেয়। অনামিকারও ঢাবিতে পড়ার খুব শখ। সে গণিতে খুব কাঁচা, তাই সাব্বিরকে তার ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট হিসেবে আরো ভালো লাগে। এখন তারা প্রায়ই ভিডিও কলে কথা বলে।

সাব্বির ফোন দিয়ে বলল, ‘বেবী, তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। প্লীজ চলে এসো আমার সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা আজই শেষ হলো। খুব রিল্যাক্স লাগছে, মাথাটা হালকা হালকা লাগছে। প্রজাপতির মতো তোমার সাথে ঘুরতে ইচ্ছে করছে। প্লীজ কাল টিএসসিতে এসো, প্লীজ, প্লীজ।’

সাব্বিরের আর্তিমাখা কণ্ঠে অনামিকার ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল। সে কখনো একা ঘরের বাহিরে যায়নি। মাকে কখনো ফাঁকি দেয়নি। অ্যান্ড্রয়েড সেটটা তার বাবা কিনে দিয়েছিলেন। এসএসসিতে এ প্লাস পাওয়ার পর তার বাবা এটা শর্ত পূরণ করতে কিনে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনামিকার বাবা সামান্য কর্মচারী, তার নিজের মোবাইলের কয়েকটা বাটন কাজ করে না। অনামিকার মা এই দামি সেট দেখে তার বাবার সাথে চিৎকার-চেঁচামেচি করেছিলেন।

ছা পোষা কেরানি বাবা সেদিন মিনমিন করে বলেছিলেন ‘মেয়েটা এ প্লাস পেল। মেয়েটা এত করে চাইল, তাই একটা উপহার দিলাম। একটা সামান্য মোবাইলের জন্য এত চেঁচিও না তো!’

মা মুখ ঝামটা দিয়েছিলেন। টানাটানির সংসারে বাবা টাকা ধার করে মেয়ের শখ মিটিয়েছিলেন। অনামিকার ফেসবুক আইডি খুলে দিয়েছিল তার এক বান্ধবী। তারপর সেলফি, পিক আপলোড, লাইভ ভিডিও, ম্যাসেঞ্জার সবই সে শিখিয়ে দিয়েছিল। কেউ অ্যাড ফ্রেন্ড দিলে অনামিকা সাথে সাথেই অ্যাক্সেপ্ট করত। বন্ধুর সংখ্যা, লাইকের পরিমাণ বাড়লে তার খুব ভালো লাগত। সাব্বিরের মতো ব্রিলিয়্যান্ট ছাত্র যখন তাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিল, সে সাথে সাথেই অ্যাক্সেপ্ট করেছিল। তারপর হাই, হ্যালোর ধাপ পেরিয়ে খুব কাছের একজন হয়ে গেল। অনেকে বলে ভার্চুয়াল দুনিয়ার বিশ্বাস নেই। কিন্তু সাব্বিরের চেহারা, শিক্ষা, পোষাক, আচরণ দূর থেকে খুবই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল।

অনামিকা পরেরদিন বান্ধবীর বাসায় যাওয়ার কথা বলে বের হলো। সারাটা দিন প্রজাপতির মতো দুইজনে ঘুরে বেড়ালো। দিন শেষে তারা একটা হোটেলে খেতে গেল। হোটেলের নিচে খাবারের দোকান আর উপরে আবাসিকের ব্যবস্থা ছিল।

সাব্বির বলেছিল, ‘এখানে অনেক গরম আর অনেক ভিড়। আমরা উপরে এসি রুমে বসে আরাম করে খাবো। চলো, উপরে চলো।’

অনামিকা সাতপাঁচ না ভেবেই মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেছিল। সাব্বির অনেক ভালো ছেলে। তার টিউশনির টাকা থেকে অনামিকার জন্য অনেক গিফট কিনেছিল। এরকম একজন ছেলেকে না বলা যায় না। সে হ্যামিলনের বাশিওয়ালার ইঁদুরের মতো মোহাচ্ছন্ন হয়ে পিছু পিছু হাঁটা দিয়েছিল। তারপরের ঘটনা সে আর মনে করতে চায় না। পরের দিন কারা যেন রাস্তা থেকে উঠিয়ে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিল। এখন সে হসপিটালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে বেডে শুয়ে আছে। রিপোর্টার তার সাক্ষাৎকার নিল। এখন তারা পাশের বেডের মেয়েটার সাক্ষাৎকার নিচ্ছে। অনামিকা কান খাড়া করে শুনতে লাগল।

‘মুই গ্রামের গরিব কৃষক মোতালিব আলীর মাইয়া, মোর নাম সখিনা। মোক পাড়ার ম্যালা চ্যাংড়া জ্বালাইত। দোকানত গ্যালে পর দোকানদারও জিনিস দেওনের নাম কইরা হাত ধরত, মুই ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়ায় নেতাম।

আব্বা সুদের জালে আইটক্যা গ্যাছে। এত্ত গুলো ভাই বোন মোর। ক্ষুধার কষ্টে কাঁনত, মাতবর এর পোলা থাইকা জাউলার পোলা সবাই মোক কিনবার চাইত। হামরা গরিব। তাই হামাক হগগলে সস্তা ভাবত।

আড়ালে পাইলেই হাতে ট্যাকা গুইজা দিত। রাতে বাঁশ ঝাড়ে আইবার কইত। মুই ট্যাকাত ছ্যাপ মাইরা পায়ের তলায় থুইয়া পিষতাম আর গজরাইতাম।

লাজ শরমের মাথা খাইয়া আব্বারে নিজের বিয়ার কথা কইতাম। আব্বা বড় শ্বাস ফেলাইত আর কইত, ‘মারে, ট্যাকা কই পামু, বিয়াত যে ম্যালা ট্যাকা দেওন লাগে!’

হেই রাতে বেগ পাইল। ছোট ভাইটারে ঠেলা দিনু। উডে না, ঘুমে কাইত। রাগ কইরা একলাই বাঁশ ঝাড়ত গেনু। মাতবরের পোলায় মোর সব্বনাশ করল।’

এটুকু বলেই সখিনা কাঁদতে লাগল। অনামিকা সখিনার দিকে তাকাল। মেয়েটা তারই বয়সী, অশিক্ষিত। কিন্তু ভালো-মন্দের জ্ঞান আছে, তার মতো এতটা বোকা সে নয়। ক্ষুধায় কষ্ট পেয়েছে, তবু কখনো কারো প্রলোভনে রাজি হয় নি। আর সে! মিথ্যা প্রেমের ফাঁদে নিজেই জড়িয়ে গিয়েছিল, তাই আজ তার এই পরিণতি।

পরেরদিন পেপারে অনামিকার খবরটা ছাপাল। নার্স পেপারটা রেখে গেল। সখিনা উৎসাহী হয়ে বলল, 'আফা, মোর খবরটা ছাপায় নাই। মাতবরের পোলার নামটা ছাপায় নাই? ওর শাস্তি হবার নয়?'

নার্স মাথা নেড়ে বললেন, 'না, শুধু অনামিকার খবরটা ছাপিয়েছে। সবার খবর ছাপালে তো পেপার ভরে যাবে।'

প্রতিদিন পেপার আসলে সখিনা আগ্রহ ভরে তা উল্টে পাল্টে দেখে। তার খবরটা খোঁজে। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক নারীকে ধর্ষণ করেছে এক পুরুষ। পরবর্তীতে বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় সেই নারী ধর্ষণের মামলা করেছে। সখিনা অনেকক্ষণ চিন্তা করে মনে মনে বলে, 'জোর করে তো অকাম করে নাই, তাইলে এটা ধর্ষণ হয় কেমনে? প্রেম করছে, বিয়ার আশা দেখাইছে, তারপর ঐ ব্যাটা যদি বিয়া করত তাইলে তো আর মামলা হইত না।'

দুইদিন পর আরেকটা খবর দেখে সে আরো অবাক হলো। ঢাকার একজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পরীক্ষায় বেশি নম্বর দেবার লোভ দেখিয়ে ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্রীদের তার নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে যেয়ে ধর্ষণ করে আসছিল। পরবর্তীতে এক ছাত্রী রাজি না হওয়ায় তা পেপারে আসে। সখিনা মনে মনে ভাবে, এত বড় বড় শিক্ষিত মাইয়ারা কেমনে মাস্টারের সাথে অকাম করবার রাজি হয়। এটা কেমনে ধর্ষণ হয়? জাইন্যা বুইঝ্যা মাস্টারের ঘরেত যায়া অকাম করছে মাইয়াগুলায়। পাস করনের লাইগ্যা কেউ এমন করে?

পরেরদিন আবার সে আগ্রহ ভরে তার খবরটা খোঁজে। যদি মাতবরের পোলার নামটা উঠে। সবাই জানুক, ওর সাজা হোক। বুক ফুলিয়ে এহনো ঘুইর্যা বেড়াচ্ছে। মাতবর তার আব্বাকে বিশ হাজার টাকা

দিয়া সাধতাছে যাতে মামলা না করা হয়। পেপারওয়ালাদেরও মনে হয় টাকা দেছে না হলে তার খবরটা ছাপায় না ক্যান? সখিনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর পাতা উল্টিয়ে দেখে।

এক কোনায় একটা ধর্ষণের খবর দেখে চমকে উঠে। একটা জুয়েলার্সের মালিকের ছেলে আর তার বন্ধুরা নাকি তাদের দুই বান্ধবীকে ধর্ষণ করেছে। আবার সেটা ড্রাইভারকে দিয়ে ভিডিও করেছে। জন্মদিনের পার্টির পর রাতের বেলায় মেয়েবন্ধু দুইজনকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। সখিনা বিড়বিড় করে, তোরা জানিস না এই সব রংবাজ পোলাগুলা খাচ্চর, এদের সাথে ঘুরতে বাহির হইছস ক্যা? পার্টি থাইক্যা সোজা বাড়িত যাবি তা হোটেলে গেছস ক্যা? তগো ইচ্ছা না থাকলে কেউ নিয়া যাইতে পারে? পোলাগুলা যেমন বদমাইশ তোরাও তেমন খাচ্চর। ভিডিও কইর‍্যা ফাঁস হওনের পর এখন মামলা করস?'

সখিনা হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ির পথে ট্রেনে রওনা দেয়। মাতবর হুমকি ধামকি দিয়ে সখিনার আব্বার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। বিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। সেটাও দেয় নি। তার আর কোনো দিন বিয়েও হবে না। এরকম মেয়েকে কে বিয়ে করবে? এখন গ্রামের অসভ্য ছেলেরা অকাম করার জন্য তার পিছনে আরো ঘুরঘুর করবে। সখিনা কষ্টে লজ্জায় মুখ ঢাকে। এই রকম জীবনের কোনো মানে হয়? তার চেয়ে মরে যাওয়ায় ভালো। এই ট্রেনের নিচে গলাটা দিতে পারলে যেন সে এই অপমানিত আর লজ্জিত জীবন থেকে উদ্ধার পেত। তার আব্বা যেন মেয়ের মনের কথা বুঝতে পারেন। মেয়ের হাতটা খপ করে ধরে বলেন, 'মারে, তুই কুনো পাপ করিস নাই। আল্লাহ্‌র কাছত হামরা মজলুম। তোর কুনো ভয় নাই, লজ্জা নাই। মানষের কাছেত হামরা খারাপ হইলেও আল্লাহ্‌র কাছেত হামরা খারাপ নয়াই। হামরা মাতা উঁচা কইর‍্যা বাঁচুম।'

টিকাঃ আমাদের ধর্মে ব্যভিচারিণী ও ধর্ষিতা নারী দুই জন এর সাথে আচরণ দুই রকম। ব্যভিচারিণী শাস্তির যোগ্য ও ঘৃণিত আর ধর্ষিতা নারী মজলুম, বিচার পাবার যোগ্য।

'ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়কে এক'শ ঘা করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকরী করবে এদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের অভিভূত না করে। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাক। ঈমানদারদের একটি দল যেন এদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।' (সূরা আন নূরঃ ২) এটা হচ্ছে অবিবাহিত পুরুষ-মহিলার ব্যভিচারের ইহকালীন শাস্তি। আর হাদিস থেকে জানা যায় যে বিবাহিতদের ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্ত রাঘাতে মৃত্যু।

ব্যভিচারি নারী আর ধর্ষিতা নারীর বিয়ের ক্ষেত্রে, ব্যভিচারি নারী ব্যভিচারি পুরুষকে বিয়ে করবে কিন্তু ধর্ষিতা নারীকে ঈমানদার পুরুষ বিয়ে করতে পারবে কারণ সে মজলুম আর নিষ্পাপ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী নারী ব্যতীত বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ ব্যতীত বিবাহ করে না'(সূরা আন নূরঃ ৩)

ছেলেপক্ষ বনাম মেয়েপক্ষ

‘আপনার মেয়ে তো খাটো, গায়ের রঙও ফর্সা নয়। শুধু আমরা বলেই মেনে নিয়েছিলাম। তার উপর তো রান্না বান্নাও তেমন পারে না। আপনারা ওকে কিছু না শিখিয়েই পাঠিয়েছেন। আমার ছেলেকে তো এক গ্লাস পানি পর্যন্ত ঢেলে খাওয়ায় না।’ আছিয়ার শাশুড়ি রোকেয়া বেগমের কথায় আছিয়ার মা ঢোক গিললেন।

ছেলেপক্ষকে সব সময় উঁচুতেই রাখতে হয়। এটা এ সমাজের রীতি। ছেলেপক্ষরা ধরেই নিয়েছে যে মেয়েপক্ষ নিচু শ্রেণী। মেয়ে পক্ষকে দু একটা কথা বলাই যায়, অপমানিত করাই যায়। তাই আছিয়ার মা কিছু বলতে যেয়েও থেমে গেলেন। মেয়ের সংসারে অশান্তি বাড়ানো ঠিক হবে না ভেবে বললেন, ‘ও তো পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত ছিল, তাই রান্না বান্না তেমন পারে না। দেখবেন আস্তে আস্তে সব পারবে।’

রোকেয়া বেগম ঝাঁঝের সাথে বললেন, ‘কী এমন পড়িয়েছেন? বিসিএস পরীক্ষায় তো পাসও করতে পারল না? একটা ভালো চাকরিও তো জোগাড় করতে পারল না।’

আছিয়ার মা স্বপ্না আক্তার কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। যেটাই বলুক না কেন, আছিয়ার শাশুড়ি রোকেয়া বেগম সেটা পায়ের নিচে দলিত করবেন, কারণ তিনি যে ছেলের মা। স্বপ্না আক্তার শান্ত গলায়

বললেন, 'এখনো তো বিসিএস এর বয়স আছে, আপা। এত হতাশ হচ্ছেন কেন? প্রথমবারেই তো আর কেউ চান্স পায় না। এবারে অভিজ্ঞতা হলো, পরেরবার ঠিকই পারবে, দেখবেন।'

রোকেয়া বেগম হাত নেড়ে বললেন, 'তা আর কিভাবে পারবে? মেয়ে তো আপনার প্রেগন্যান্ট, জানেন না? এরপর তো বাচ্চা-কাচ্চা নিয়েই অস্থির হয়ে থাকবে। পড়াশুনার পাট একেবারেই চুকলো। এযুগের মেয়ে, বিয়ের দুইমাস বাদেই যে কিভাবে প্রেগন্যান্ট হয়, কোনো আক্কেলজ্ঞানও নাই। আমার তো সেই যুগেও বিয়ের তিন বছর পর বাচ্চা হয়েছিল। আপনারাও তো কিছুই শেখান নি, দেখছি!'

স্বপ্না বেগম হকচকিয়ে যান। থতমত খেয়ে বললেন, 'তাই নাকি? আছিয়া তো আমাকে কিছুই বলে নি। মেয়েটা আমার ছোট বেলা থেকেই খুব লাজুক আর চাপা স্বভাবের। নিজের ভিতরের কষ্ট সে কাউকে দেখায় না, একা একাই নীরবে সহ্য করে। তাই হয়ত আমার সাথেও শেয়ার করে নি যদি আমি চিন্তা করি। কিন্তু দেখছেন, আপনাকে সে ঠিকই আপন করে নিয়েছে। আপনার সাথে শেয়ার করেছে।'

রোকেয়া বেগম বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আরে না, আমাকে বলে নাই। সকালে উঠে দেখি গড়বড় করে বমি করছে। তারপর কথা বের করলাম। দুই মাস হলো প্রেগন্যান্ট, বোকার হদ্দ কোথাকার, কিছুই টের পায় নি।'

স্বপ্না বেগম মৃদু হেসে বললেন, 'প্রথম বাচ্চার সময় মেয়েদের বুঝে উঠতেই সময় চলে যায়, পরবর্তীতে দেখবেন আস্তে আস্তে সব বুঝে যাবে। ওর ছোট ভাই বোন গুলোকে তো ঐ মানুষ করেছে। দেখবেন ও পারবে, আপনি অত চিন্তা করবেন না।'

রোকেয়া বেগম বিষাদ মুখে বললেন, 'ভেবে ছিলাম বউ এনে সুখ করব, তা আর কপালে নাই। এখন দেখি আরো ঝামেলা, দুই দিন পর পর বউ এর বাপের বাড়ির লোকজন আসতেই আছে। এখন তো বউ অসুস্থ, এই অছিলায় আরো কতজন যে দেখতে আসবে, কে জানে? আমি এগুলো আর সামাল দিতে পারি না।'

স্বপ্না বেগমকে এভাবে অপমানিত হতে হবে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। বিয়ে বিদায়ের তিনমাস পর

তিনি প্রথম এলেন। গতমাসে একগাদা খাবার রান্না করে আছিয়ার ভাই রেজাকে পাঠিয়েছিলেন। দুইমাসে মাত্র দুইজন এসেছে, তাই তিনি এত কথা বলছেন। স্বপ্না বেগম রেগে গেলেন। বহু কষ্টে রাগটা দমন করে বললেন, 'ঠিক আছে আপা, মেয়েকে তো একবারেই দিয়ে দিয়েছি। আপনারা বিরক্ত হলে আর আসব না।'

রোকেয়া বেগম জিভ কেটে বললেন, 'না, আমি অসুস্থ তো, তাই এমন করে বললাম আর কী!'

স্বপ্না বেগমকে ডাইনিং এ নিয়ে চেয়ারে বসতে দিলেন। ডাইনিং এর শোকেসটা আছিয়ার বিয়ের সময় তারা দিয়েছিলেন। খুব সুন্দর করে কাঁচের জিনিসপত্র সাজিয়ে রেখেছে। আছিয়ার মা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাহ! শোকেসটা তো খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, বেশ ভালোই দেখাচ্ছে।'

রোকেয়া বেগম ঠোঁট উল্টিয়ে বললেন, 'ভালো না ছাই! সেগুন কাঠ তো আর দেন নি, দিয়েছেন তো সস্তা মেহগনি কাঠের ফার্নিচার। আমাদের এত সুন্দর ফ্ল্যাটে আপনাদের দেওয়া একটা ফার্নিচারও মানাচ্ছে না। খাটটার কী বাজে ডিজাইন! আর সোফা সেটটা তো ভালো করে রঙই করে নি। সস্তা কাঠ আর সস্তা মিস্ত্রী দিয়ে করিয়েছেন বোধ হয়।'

স্বপ্না বেগম জীবনে এত অপমানিত আর কারো দ্বারা হন নি। তার চোখ ফেটে পানি আসছে। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। তার সামনে দশ পদের নাস্তা। রোকেয়া বেগম শাড়ির আঁচল ঘুড়িয়ে নাচের ভঙ্গিতে বললেন, 'খান, সবগুলোই কিন্তু একটু একটু করে মুখে দিতে হবে। দেখেন, আমার রান্না খেয়ে দেখেন। গত মাসে যে রেজাকে দিয়ে খাবার পাঠালেন না, আমার ছেলে ফারুক তো একটা খাবারও মুখে দিতে পারে নি। মায়ের হাতের রান্না ছাড়া ও আবার কারো রান্না খেতে পারে না।'

স্বপ্না বেগম অপমানে নীল হয়ে গেলেন। রোকেয়া বেগমের খোঁটায় তার মুখ তিতা হয়ে গেছে। তিনি কোনো মতে খাবার খেয়ে বিদায় নিলেন। একটা সিএনজি ঠিক করে উঠে পড়লেন। সিএনজি তে বসেই বোরকার ওড়না চেপে হু হু করে কাঁদতে লাগলেন।

সময় গড়ায়। স্বপ্না বেগম আর আছিয়ার শ্বশুর বাড়িতে যান না। মেয়ে ফোনে কান্না কাটি করে, তাই মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে যান। গেলেই আছিয়ার শাশুড়ি বুঝিয়ে দেন যে তিনি ছেলের মা, ছেলে মানুষ করতে

কষ্ট হয়েছে, ছেলে তার রুই কাতলা মাছ, সেই তুলনায় আছিয়া কিছুই নয়, আছিয়ার বাবার নিচু চাকরি নিয়েও কটাক্ষ করেন, আরো কত কী!

শেষে স্বপ্না বেগম মেয়েকে দেখতে যাওয়া একেবারেই ছেড়ে দেন। কষ্ট চেপে দূর থেকে দোআ করেন, 'আল্লাহ্, আছিয়াকে তুমি পুত্র সন্তান দিও। মেয়ের মা হবার মতো লাঞ্ছিত আর অপমানিত জীবন ওকে দিও না।'

টিকাঃ ছেলে, বাঁকা হলেও সে তো সোনার আংটি। সবাই ছেলের মা হতে চায়। এ সমাজে মেয়ের যেমন মূল্য নাই, মেয়ের মায়েরও তেমনই মূল্য নাই। তাই যুগ যুগ ধরে কন্যা সন্তনের জন্ম হলেই বাবা-মা মুখ কালো করে ফেলত। আল্লাহ্ এদের বিদ্রুপ করে বলেছেন, 'আর যখন তাদের কাউকে কন্যা-সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শুনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে চেহারা লুকিয়ে রাখে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে রাখবে, না মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।' (সূরা নাহল : ৫৮-৫৯)

কন্যা সন্তানের পিতা-মাতা হতে কেউ চায় না। এর জন্য দায়ী এই সমাজের নোংরা মানুষেরা যারা কন্যা পক্ষকে সম্মান করতে জানে না। অথচ ইসলামে মানুষের ব্যক্তিগত সম্মান নষ্ট করা তো দূরের কথা বরং তা রক্ষা করার জন্য নিকট ও দূর আত্মীয়সহ সকলের সাথে সদয় আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে ও কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরীক

করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশি, দূর প্রতিবেশি, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদাচরণ করবে। আল্লাহ দাম্ভিক ও আত্মগর্বীকে পছন্দ করেন না।' (সূরা নিসা : ৩৬)

ছেলের মায়েদের আত্মঅহঙ্কার যুগ যুগ ধরে এই সমাজ দ্বারা স্বীকৃত অথচ আল্লাহ্ এই অহমিকা স্পষ্ট নিষেধ করে দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কোনো ভাই যাতে করে অন্য মুসলিম ভাইকে ছোট না করে অর্থাৎ তার মান ও সম্মান ক্ষুণ্ন না করে। কেননা প্রত্যেক মুসলিম এর প্রতি অন্য ভাই এর রক্ত, মাল ও সম্মানকে ক্ষুণ্ন করা হারাম করা হয়েছে।' (সহীহ মুসলিম-৪/১৯৮৬, হাদীস-২৫৬৪)। আসুন আমরা অন্যকে সম্মান করতে শিখি।

নীল সময়

আছিয়া প্রথমবারের মতো মা হতে চলছে। তার শাশুড়ি রোকেয়া বেগম ঝামেলা পছন্দ করেন না। বাচ্চা হবে, লোকজন বাচ্চা দেখতে আসবে, গ্যাদারিং হবে, এগুলো তিনি বরদাশত করতে পারবেন না। ছেলে ফারুক কে বিয়ে করে এনেছিলেন যাতে তার কাজের একজন সঙ্গী বাড়ে। কিন্তু উল্টো তো বউ এখন বোঝার মতো হয়ে গেছে। সে ভারী শরীর নিয়ে কিছুই করতে পারে না। ডাক্তার ভালো ভালো খাবার খেতে বলেছে। তাই তাকে বউয়ের জন্য রান্না ঘরে দুই-তিন পদ বেশি রাঁধতে হয়। বউ এতটাই অসুস্থ যে সে কিছুই করতে পারে না। সাত মাসে ব্লিডিং হয়েছিল, তারপর থেকে তার বেড রেস্ট। বউ রাজরানীর মতো শুয়ে থাকে। তা দেখে রোকেয়া বেগমের দাঁত কিড়মিড় করে। এই বোঝাটাকে বাপের বাড়ি পাঠাতে পারলে তিনি শান্তি পেতেন।

সন্ধ্যায় ফারুক ঘরে ফিরলে রোকেয়া বেগম তাকে ডেকে নিজের রুমে বসিয়ে বললেন, ‘ বাবা, আমার শরীর তো আর চলে না। তোর বউকে তুই বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দে, সেটাই ভালো হবে। এত ঝামেলা আমরা পোহাতে পারব না, বুঝলি? আর টাকা-পয়সার তো ব্যাপার আছে। বাচ্চা নরমালে হবার কোনো চান্স

নাই, সিজারে অনেক খরচ। তুই বউকে বাপের বাড়িতে রেখে আয়। ওদের মেয়ে ওরা বুঝুক। বাচ্চা নানাবাড়িতে হতে হয়, এটাই তো আমাদের সমাজের রীতি। ওর ভাই বড়লোক আছে, খরচ করবে নি।'

ফারুক এক গাল হেসে বলল, ' মা, আমি এই কথাটাই ভেবে রেখেছি। এই মাসটা যাক, এখন তো আট মাস চলে, নয় মাস পড়লে একটা গাড়ি ভাড়া করে রেখে আসব ঠিক করেছি। আমিও অত প্রেসার নিতে পারি না। এমনিতেই অফিসের চাপ, তার উপর এসব ঝামেলা, দৌড়াদৌড়ি, আমি পারব না। আছিয়ার বড় ভাই আছেন, রিটায়ার্ড বাবা আছেন, মা আছেন, পাশেই বড় হাসপাতাল আছে, ওখানে থাকাই ভালো হবে।'

রোকেয়া বেগমের বুক থেকে যেন ভারী একটা পাথর নেমে গেল। তিনি হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে বাবা, তাই করিস। এটাই ভালো হবে।'

ডেলিভারী ডেটের দশ দিন আগে ফারুক আছিয়াকে বাবার বাড়ি রেখে এল। বাবার বাড়িতে মা আছিয়ার ভালোই যত্ন করেন। সব সময় এটা ওটা জোর করে খাইয়ে দেন। তবুও আছিয়া যেন কেমন মনমরা হয়ে থাকে। বিষণ্ন দুপুর গুলোতে জানালা খুলে বাহিরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে আর কী যেন ভাবে। এক রাতে আছিয়ার ব্যথা উঠল। আছিয়ার বড় ভাই রেজা ফারুককে ফোন দিয়ে আসতে বলল আর পরামর্শ চাইল। কাঁচা ঘুম ভাঙায় ফারুক বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনাদের যা ভালো মনে হয়, করেন। আমার কোনো আপত্তি নাই। আপনাদের বোন, আপনারাই ভালো বুঝবেন।'

ফারুক ফোন কেটে দিয়ে মোবাইল সাইলেন্ট করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। বড়ভাই রেজা, বাবা আর মা মিলে আছিয়াকে একটা জেনারেল হসপিটালে ভর্তি করাল। আছিয়ার ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হলো। সে ব্যথায় কাতরাতে লাগল। অনেক ব্যথা সহ্য করার পর ফজরের আজানের সময় আছিয়া একটা পুত্রসন্তানের জন্ম দিল।

আছিয়ার ভাই ফারুক কে বারবার ফোন দিল। কিন্তু সেটা কেউ রিসিভ করল না। সকাল দশটায় ফারুক তার পুত্র সন্তানের সংবাদ পেল। সেদিন বিকেলে অফিস শেষে ফারুক আর তার মা সেজেগুজে অনেক গিফট

নিয়ে বাচ্চা দেখতে হাসপাতালে আসল। বাচ্চার মুখ দেখে হাজার পাঁচেক টাকা দিয়ে রোকেয়া বেগম গদগদ ভাব প্রকাশ করলেন। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ছবি তোলেন, নাতির প্রশংসায় হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলেন। ফারুক অফিস থেকে সাতদিনের পিতৃত্বকালীন ছুটি পেল। কিন্তু সে সাতদিন আরাম করে নিজের বাড়িতে শুয়ে বসে দিন পার করল আর বিকেলে একবার করে বাচ্চা দেখতে শ্বশুরবাড়ি গেল। একুশতম দিনে বাচ্চার মাথার চুল ফেলে দেওয়া উপলক্ষে ফারুকের বাড়ির সব লোকেরা আছিয়ার বাবার বাড়িতে আসল। তারপর খেয়ে দেয়ে পেট পূজা করে চলে গেল। আছিয়া শূন্যদৃষ্টিতে তাদের আনন্দ দেখল। ফারুক মাঝে মাঝে অতিথির মতো আসে, বাচ্চা দেখে চলে যায়। ফারুক বাড়ির ছোট ছেলে। তার মা তাকে সবসময় আগলে রাখেন, দায়িত্বের ধারে কাছে যেতে দেন না।

একদিন ফারুকের সাথে রোকেয়া বেগম বাচ্চা দেখতে এসে বললেন, 'আমার ছেলেটা তো ছোট, এত কম বয়সে বাবা হয়ে গেল। কী আর করা। ওর তো আগে কখনো বাচ্চা হয় নি, কিভাবে যে কী করবে, আল্লাহই জানে। তার চেয়ে বাচ্চা নানা বাড়িতেই থাক, সেটাই ভালো হবে। একটু বড় হোক, হাঁটা শিখুক, তখন না হয় আমরা নিয়ে যাব।'

আছিয়ার ভাবি অন্তরা মুখরা মেয়ে লোক। সে ঝাঁঝের সাথে বলল, 'আমাদের আছিয়ারও তো এটা প্রথম বাচ্চা। ওর কী আগে কখনো বিয়ে হয়েছিল না বাচ্চা হয়েছিল? এভাবেই তো মানুষ শেখে। আমার প্রথম বাচ্চার সময় তো আমার শাশুড়িই সাহায্য করেছেন, দেখিয়ে দিয়েছেন। এরপরের দুইটার সময় তো আমি একাই পেরেছি। আপনি শিখিয়ে দেবেন। আপনাদের বউ, আপনাদের নাতি, এতদিন পরের ঘরে থাকবে তা কেমন দেখায়?'

রোকেয়া বেগম দমে যাবার পাত্রী নন। তিনি জোর দিয়ে বললেন, 'বাচ্চা তো নানাবাড়িতেই হয়, এটাই তো রীতি। মেয়ের মায়ের এটা করা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তোমার মা ছিল না, তাই তোমার শাশুড়ি বাধ্য হয়ে দেখেছেন, সেটা আলাদা কথা।'

অন্তরা আরো কিছু কথা শুনাতে চাইল। সে ঝগড়ার ভঙ্গিতে এগিয়ে এল। আছিয়ার মা ঘটনা বুঝতে

পেরে দুইজনের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। তারপর অন্তরাকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। আছিয়া তার বাপের বাড়িতেই থাকবে। সমস্যা নাই। এটা নিয়ে এত কথার কী আছে?'

আছিয়া তাদের কথোপকথন শুনে চুপ হয়ে গেল। সবাই চলে গেলে অন্তরা আছিয়াকে কথা শুনাল। এরপর দিন গড়ায়। একদিন শ্বশুর একটা ছাগল নিয়ে হাজির হলেন।

শ্বশুর আছিয়ার বাবাকে ডেকে খুব গর্বের সাথে বললেন, ' আমার নাতির আকিকা করব। আপনাদের তো কোনো খবর দেখি না। আমার নাম আনোয়ার খান, তার সাথে মিলিয়ে নাম রাখলাম আরমান খান। ছাগলটা কম দামে পেলাম, খুব জিতেছি। এখন আপনারা আরেকটা কিনে আকিকার ব্যবস্থা করেন। আমাদের বাড়ি থেকে এই একশ জনের মতো মানুষ আসবে। খুব বেশি নয়, বিয়েতে তো পাঁচশজন এসেছিলাম। এখন যে কাকে রেখে কাকে আনি। আমাদের তো আবার অনেক আত্মীয়স্বজন!'

আছিয়ার বাবা চুপ হয়ে শুনলেন। কোনো উত্তর দিলেন না। আছিয়ার ভাই রেজা রাগে গজগজ করতে করতে বলল, 'আপনাদের নাতি, আপনারাই আয়োজন করেন। আমাদের এখানে করলে কি আর আপনাদের মান-সম্মান থাকবে? আমরা বরং একটা ছাগল কিনে পাঠাই। আপনাদের বউমা আর নাতিকেও সাথে নিয়ে যান। ধুমধাম করে আকিকা করেন। আপনার সব আত্মীয় স্বজন কষ্ট করে এতদূর আসার কী দরকার?'

আছিয়ার বাবা দুইজনকে শান্ত করে বললেন, 'আচ্ছা, আমরা পরের শুক্রবারে আয়োজন করব। আপনারা আসেন।'

আছিয়ার ভাই বাবার কথায় প্রচণ্ড বিরক্ত হলো। বাবা যে কেন সবকিছুতেই সহজেই রাজি হয়। সব ঝামেলা তো এসে তার উপর পড়ে। এমনিতেই হাসপাতালের বিশ হাজার টাকা বিল দিতে হয়েছে। চুল কাটা উপলক্ষে এক দঙ্গল মানুষ এসে চেটেপুটে খেয়ে গেল। এখন আবার আকিকার দায়িত্ব ধরিয়ে দিয়ে গেল। হাজার ত্রিশেক টাকা খরচ হবে।

পরের শুক্রবারের আগেই আছিয়ার বাবা দশ হাজার টাকা দিয়ে একটা ছাগল কিনে আনলেন। তারপর কসাই দিয়ে ছাগল দুটো জবাই করলেন। টাকা বাঁচাতে আছিয়ার মা নিজে রান্নার দায়িত্ব নিলেন। তিনি

মসলা বাটলেন, একশ মানুষের রান্নাও করে ফেললেন। তারপর আছিয়ার শ্বশুর বাড়ির সবাই এসে হই হুল্লোড় করতে করতে খেলো। খাওয়া শেষে তারা চা খেতে চাইল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর রান্নাঘরে চা বানাতে যেয়ে আছিয়ার মা মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। তাকে সবাই ধরাধরি করে হাসপাতালে ভর্তি করাল। ডাক্তার, টেস্ট, কেবিন ভাড়া সব মিলিয়ে আরো বিশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল।

আছিয়ার ভাই-ভাবি আছিয়াকে কথা শুনাল। আছিয়া শুধু চুপ হয়ে শুনল। আছিয়ার মা হাসপাতালে ভর্তি। আছিয়া একা একাই বাচ্চাকে সামলায়। বাচ্চা রাতে কাঁদে, সে ঘরময় পায়চারি করে ঘুরে বেড়ায়। তাকে সাহায্য করার কেউ নেই, তার সাথে কথা বলারও কেউ নেই। ফারুককে ফোন দিলে ফোন ধরে না। মাঝে মাঝে কল ব্যাক করে। বাচ্চা কেমন আছে জানতে চায়, দুই তিন মিনিট কথা বলে ফোন রেখে দেয়। আছিয়া ফারুককে ফোন দিয়ে নিয়ে যেতে বলে। ফারুক 'আচ্ছা দেখি' বলে রেখে দেয়। তারপর আর খোঁজ নেয় না। আছিয়া মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সারা রাত বাচ্চা কাঁদে আর দিনের বেলায় পড়ে পড়ে ঘুমায়। আছিয়া তিন রাত ধরে ঘুমায় না। চুল এলোমেলো, কাপড়ে বাচ্চার প্রস্রাব লেগে থাকে আর গায়ে দুর্গন্ধ ছড়ায়। সে নিজেকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নেয়, কেউ টের পায় না। ভাবি প্রচণ্ড ব্যস্ত, মা হাসপাতালে তাই একাই তাকে সব সামাল দিতে হচ্ছে। আছিয়া যে তিন দিন ধরে না খেয়ে আছে, সেটা কেউ টের পেল না। আছিয়া ভিতরে ভিতরে অবহেলার কষ্টে নীল হয়ে রইল। মাতৃত্বের নীল সময়ের বিষণ্নতা তাকে আবিষ্ট করে রাখল। তারপর এক বিষণ্ন দুপুরে আছিয়া চারতলা বাড়ির ছাদে একা একা চলে গেল। সেখান থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করল।

টিকাঃ আমাদের সমাজে অধিকাংশ নতুন মাকে প্রসব পূর্ববর্তী আর পরবর্তী সবকিছু একাই সামাল দিতে হয়। সন্তান ক্যারি করা, ডেলিভারির তীব্র কষ্ট, সন্তান লালন পালন সব একা করতে যেয়ে নতুন মা

হিমসিম খায়। মাতৃত্বের ব্লু টাইম (নীল সময়) বলে একটা টার্ম আছে, এই সময় অধিকাংশ প্রসূতি মা ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতায় ভোগেন। অনেকেই আবার দায় এড়াতে গর্ভবতী বউকে তার বাবার বাড়িতে রেখে আসে। 'বাচ্চা তো নানা বাড়িতেই হয়। এটা তো বাচ্চার নানা-নানির দায়িত্ব' এ ধরনের কথা বলে সুন্দরভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে যায়।

গর্ভ ধারণ করে নারী । অথচ যখন গর্ভ ভারী হয়, তখন তারা (স্বামী-স্ত্রী) দুইজনেই দোআ করতে থাকে যাতে আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালা তাদেরকে একজন সুসন্তান দান করেন। পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ ব্যক্তি হতে তার সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। এরপর যখন সে তার সাথে মিলিত হয়, তখন সে লঘু গর্ভধারণ করে এবং কিছুকাল ঐ হাল্কা গর্ভসহ বিচরণ করে, এরপর গর্ভ যখন ভারী হয়, তখন তারা উভয়ে নিজ প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে যে, যদি আপনি আমাদের পূর্ণাঙ্গ সুসন্তান দান করেন, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো।' (সূরা আরাফ: ১৮৯)

এখানে একজন আদর্শ স্বামীকে দেখানো হয়েছে, যে গর্ভের সন্তানের ব্যাপারে সচেতন। সন্তান টি পিতার, তাই দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে এবং সেটা গর্ভ থেকেই। তাই এই কষ্টকর অসহায় অবস্থায় সন্তানের মাতার পাশে পিতারও থাকা উচিৎ। কারণ সে ভালো থাকলে, সন্তানটিও ভালো থাকবে । তাই তাকে ভালোবাসার শক্তি দিয়ে উজ্জীবিত রাখুন। স্নেহময় আর নির্ভরতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার এই অসহায় সময়টা আনন্দময় করে তুলুন।

অপরাজিতা

জিতা তার অ্যাকাডেমিক সব পরীক্ষায় এ প্লাস পেত। এস.এস.সি, জে.এস.সি, এইচ.এস.সি সব পরীক্ষায় সে এ প্লাস পেয়েছিল। তাই ওর বাবা আদর করে ডাকত অপারাজিতা। ও নাকি কখনো হারবে না, মেয়েকে নিয়ে এরকম উচ্চ ধারণা ছিল জিতার বাবার।

জিতা ঢাকা মেডিকেলে চান্স পেয়েছিল। সেখানে সেকেন্ড প্রফ পরীক্ষার পর তার সাথে প্রেমের সম্পর্ক হয় রিডিং পার্টনার আসিফের। ইন্টার্নী শেষে যখন বাসা থেকে জিতাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালানো হলো, তখন সে আসিফের সাথে তার প্রেমের সম্পর্কের কথা প্রকাশ করেছিল। জিতার বাবা মেয়ের সাথে সাতদিন কথা বললেন না। তিনি তার বন্ধুর ছেলের সাথে বিয়ে প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলেন। ভালো ঘর, ছেলেও খুব ভালো আর পরহেজগার ছিল। জিতার সাথে রাগ করে থাকলেও পরে জিতা কিভাবে কিভাবে যেন বাবা-মা দুইজনকেই আসিফের ব্যাপারে রাজি করে ফেলেছিল। শেষে জিতার বাবা কোরবান সাহেব আর না করতে পারেননি। বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। পারিবারিক ভাবেই দুইজনের বিয়ে হয়।

বিয়ের প্রথম বছরটা ভালোই কেটেছিল। জিতা একটা ক্লিনিকে চাকরি করত আর আসিফ পিজির

লাইব্রেরিতে সারাদিন পড়ত। আগে আসিফ কোনো কোর্সে ঢুকবে তারপর জিতা চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোর্সের জন্য পড়তে বসবে, এরকমই কথা হয়েছিল। দুজনের মধ্যে দারুণ বোঝাপড়া, খুব ভালোই কাটছিল দুইজনের জীবন।

পরের বছর আসিফ প্যাথলজিতে এমডি কোর্সে ঢুকেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সে আর কথা রাখে নি। সংসার চলে না এই অজুহাতে জিতাকে আর চাকরি ছাড়তে দেয় নি। জিতা সারাদিন ডিউটি করে এসে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফেরে। তারপর রান্না চাপিয়ে বই নিয়ে পড়তে বসে। এরমধ্যে জিতার শ্বশুর-শাশুড়ি এসে হাজির হন। তারা একেবারেই ঢাকায় চলে আসেন। জিতার শ্বশুর রিটায়ার্ডমেন্টে গেছেন। এখন ঢাকায় ফ্ল্যাট কিনে থিতু হবেন।

জিতার শ্বশুর শাশুড়ি ফ্ল্যাট কেনার জন্য বিভিন্ন এলাকা ঘুরতে থাকেন। যেটা পছন্দ হয়, সেটা দামে মিলে না। আবার যেটা দামে মিলে সেটা অত ভালো লাগে না। শেষে একটা ফ্ল্যাট পছন্দ করে আসেন কিন্তু ১৫ লাখ টাকা শর্ট পড়ে।

শাশুড়ি জিতাকে টাকার জন্য চাপ দেন। একদিন গল্প করতে করতে সুন্দর করে বলেন, ‘তোমরাই তো থাকবে, আমরা আর কতদিন বাঁচব, বলো। তোমার বাবার কাছ থেকে সামান্য শর্ট পড়ে যাওয়া ১৫ লাখ টাকা এনে দাও।’

জিতা চুপ করে শোনে, কিছু বলে না। শাশুড়ি আবার চেপে ধরেন। জিতা শান্ত গলায় বলে, ‘আমার আব্বুর কাছে আমি চাইতে পারব না। তিনি আমাকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়েছেন। আমি আপনাদের অনেক প্রশংসা করেছি। আমার আব্বু আপনাদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা রাখেন। এখন এই ধরনের কিছু চাইলে উনি আরো কষ্ট পাবেন। আমি তো আসিফের পরিবারকে ছোট করতে পারি না।’

জিতার শাশুড়ি হিসহিস শব্দ করে বলেন, ‘আরে তুমি তো ধার চাইবা। এটা তো যৌতুক নয়। ফ্ল্যাটটাতো তোমাদেরই হবে। মেয়ের সুখের জন্য উনি কিছু দেবেন না, এটা কেমন কথা!’

জিতা দৃঢ় গলায় বলে, ‘না, আমি চাইতে পারব না, কখনোই না। আপনি আর এই প্রসঙ্গ তুলবেন না,

প্লীজ ।'

কিছুদিন গড়ায় । তারপর শাশুড়ির আসল রূপ বেরিয়ে আসে । একদিন জিতা নাইট ডিউটি করে সকালে ফেরে । ডাইনিং এ শাশুড়ির বানানো নাস্তা খেতে বসে । শাশুড়ি ঝগড়ার ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে বলেন, 'লজ্জা করে না । রান্না না করে বসে বসে খেতে?'

জিতা ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমি তো এতদিন রান্না করতাম । আপনি আসার পর তো রান্না ছেড়ে দিলাম । আপনি তো আমার রান্না পছন্দ করেন না । আপনিই তো আমাকে রাঁধতে নিষেধ করলেন ।'

শাশুড়ি কড়া গলায় বললেন, 'আহঃ, মুখে মুখে তর্ক । কেন যে তোমার মতো একটা বেআদব মেয়েকে ঘরে তুলেছিলাম । আমার ছেলের জন্য এলাকায় কত মেয়ের বাবা আমাদের পিছন পিছন ঘুরেছে । গাড়ি, বাড়ি সব দিতে চেয়েছে । কিন্তু তুমি কোথাকার কোন মেয়ে এসে আমার সহজ সরল ছেলেটার মাথা নষ্ট করে ঘাড়ে এসে বসলে, বাপু? বাপের ভালো ঘরে বিয়ে দেবার মুরোদ নাই, তাই মেয়ে কে লেলিয়ে দিয়েছিল ।'

ক্লান্ত জিতা রাগে ফেটে পড়ে বলল, 'বাবা তুলে গালি দিবেন না । আমাকে নিয়ে কোনো উল্টা-পাল্টা কথা বলবেন না ।'

শাশুড়ি হাত নেড়ে মারমুখী ভঙ্গিতে বলল, 'নাইট ডিউটির নাম করে রাত কাটিয়ে আসো । আমি কিছু বুঝি না, ভেবেছ? তুমি তো আর অত ভালো ঘরের মেয়ে নয়, বাপু । ভালো ঘরের মেয়ে হলে তার আত্মসম্মান থাকত । আমার ছেলে যে তোমাকে এখন আর পছন্দ করে না, তোমাকে চায় না, সেটা তুমি বোঝ না? তোমার আত্মসম্মানবোধ থাকলে নিজে থেকে সরে যেতে, বুঝলে? এভাবে জিগার আঠার মতো ঝুলে থাকতে না । গরিব ছোটলোক কোথাকার!'

জিতার ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গিয়েছিল । ও চিৎকার করে সব কথার জবাব দিয়েছিল । আসিফ সত্যি দূরে সরে গিয়েছিল । অন্য আরেকজনের সাথে ওকে দেখা যায় । কানাঘুষা শোনা যায় । এটা নিয়ে গত সপ্তাহে আসিফের সাথে বেশ ভালোই ঝগড়া হয়েছিল । এরপর থেকে আসিফ দূরে দূরে থাকে । তাদের মধ্যকার মনোমালিন্যের কথা শাশুড়ি জানেন । শাশুড়ি আর আসিফ মিলে তাই জিতাকে আপোসে সরানোর চিন্তা

করেছেন। গত রাতে জিতার অনুপস্থিতিতে তারা কিছু প্ল্যান করেছিল। সন্ধ্যেয় আসিফ থমথমে মুখে ঘরে ফিরল। জিতাকে ডেকে ধমকের সুরে বলল, ‘কী বলেছ আমার মাকে? সাহস খুব বেড়ে গেছে না?’

জিতা রাগী স্বরে জবাব দিল, ‘কী বলেছি, জানো না? আমার কাছে ভাব ধরো কেন? আসার সাথে সাথেই তো সব উনি জানিয়েছে। আমি ওনার সাথে লাগতে যাই নি, উনি আমাকে নিয়ে যা তা বলল, শুধু তার জবাব দিয়েছিলাম।’

আসিফ মারমুখী হয়ে বলল, ‘খুব মুখ হয়েছে, না! আমার মা যাই বলুক তুমি জবাব দিলে কেন? খুব বাড় বেড়েছ, তুমি! আমার মাকে ভালো লাগে না, আমাকে ভালো লাগে না। রান্না-বান্না কিচ্ছু করতে চাও না, এভাবে তো সংসার হয় না। তুমি তার চেয়ে আপোসে চলে যাও। আমাকে মাফ কর আর বিদায় হও।’

জিতা চুপ হয়ে গেল। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। রাগে শরীর কাঁপছে। আসিফ আর সোমার প্রেম কাহিনী এখন অনেকটাই প্রকাশ্য। জিতা পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আপোসে সরানোর প্ল্যান করেছে। ঝগড়া করে তাকে চটাবে, তারপর গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিবে। তাদের প্ল্যানটা জিতার কাছে পানির মতো সহজ হয়ে ধরা দেয়। জিতা মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না।

চিৎকার করে সে আসিফকে গালি দিল, ‘লুচ্চা কোথাকার! আমি চলে গেলে তোর সুবিধা হয়, না? এত খারাপ তুই! ছিঃ, আমি তোকে ভালোবেসেছিলাম, নিজের উপরই ঘৃণা হচ্ছে।’

আসিফ দাঁত খিচিয়ে জিতাকে পাল্টা গালি দিল। তারপর জিতাকে ইচ্ছেমত পিটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, ‘কাল ফিরব, ফিরে এসে যেন তোর মুখ না দেখি।’

জিতা দরজা বন্ধ করে কাঁদতে থাকে। কী করবে বুঝতে পারে না। বাবার অমতে বিয়ে করেছিল। বাবাকে সে বড় মুখ করে বলেছিল যে আসিফ আর তার ফ্যামিলি খুব ভালো। সে খুব ভালো থাকবে। এখন সে কোন মুখে বাবার কাছে দাঁড়াবে। যৌতুক লোভী পরিবার সাথে চরিত্রহীন স্বামী। কী বলবে সে তার বাবাকে। নিজের উপর সব রাগ এসে পড়ে। শুধু আসিফ নয় আর কেউ তার মুখ দেখতে পাবে না, কোনো দিনই দেখতে পাবে না। সে ঘরের সিলিং ফ্যানের দিকে তাকাল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল। পৃথিবীর দুঃখ,

কষ্ট আর অশান্তির হাত থেকে বাঁচতে সে চিরস্থায়ী অশান্তিকে ডেকে আনল। সে তার বাবার দেওয়া নামের সার্থকতা রাখল না। বাবার দেওয়া নামটা মুহূর্তেই অপরাজিতা থেকে পরাজিতা হয়ে গেল। ইহকাল পরকাল দুটোতেই সে হেরে গেল।

টিকাঃ জীবনে পরীক্ষা আসবেই। এইসব পরীক্ষাকে ধৈর্য সহকারে মোকাবেলা করার মতো শক্তি থাকা দরকার। শুধু অ্যাকাডেমিক পরীক্ষায় সফল হলেই চলবে না, জীবনের পরীক্ষাতেও সফল হতে হবে। সেই জন্য ছোট বেলা থেকেই সন্তানকে শক্ত মনের মানুষ হিসেবে তৈরি করতে হবে যাতে সে খারাপ পরিস্থিতি গুলোও খুব সহজে সমাধান করতে পারে আর শক্তভাবে টিকে থাকতে পারে। তাই তাকে সেই মহিয়সী নারীদের গল্প শুনাতে হবে। অপবাদ সহ্য করেছিলেন পবিত্র নারী মারইয়াম (আ:)। কুমারী মারইয়াম (আঃ) আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় গর্ভবতী হয়েছিলেন। সমাজ আঙুল তুলেছিল এই পবিত্র নারীর দিকে। কিন্তু তাকওয়াশীল মারইয়াম (আঃ) ভয় পান নি।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী বিবি হাজেরা (আঃ) কে দুগ্ধপোষ্য সন্তান হযরত ইসমাইল (আঃ) সহ জনমানবহীন বিস্তৃত মরুভূমিতে রেখে এসেছিলেন। বিবি হাজেরা (আঃ) ভয় পেলেন না। আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালার ফয়সালার উপর ভরসা রাখলেন। যখন শিশুপুত্র ক্ষুধা ও পিপাসায় ছটফট করতে লাগল, তখন তিনি পানির সন্ধানে ছাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন। ছাফা পাহাড়ে উঠে চারদিকে পানির খোঁজ করলেন। কোথাও পানির লেশমাত্র দেখতে পেলেন না। সেখান থেকে নেমে আবার মারওয়া পাহাড়ের দিকে দৌড়ালেন। সেখান থেকেও কোনো পানির সন্ধান পেলেন না। তিনি আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালা তার জন্য জমজম পানির ফোয়ারা তৈরি করে দিলেন।

এভাবে তিনি কঠিন পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন ।

আছিয়া (আঃ) ছিলেন মিসরের বাদশাহ ফেরাউনের স্ত্রী । ফেরাউন ছিল অত্যন্ত প্রতাপশালী, জঘন্য ও কুখ্যাত ব্যাক্তি যে নিজেকে খোদা বলে দাবি করত । সে আল্লাহর প্রভুত্বকে অস্বীকার করে নিজের মনগড়া আইন-শাসন ও স্বৈরাচারী নীতি মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল । কিন্তু আছিয়া (আঃ) ফেরাউনের ভ্রান্ত দাবি, বিশ্বাস ও স্বৈরাচারী নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেন । এতে ফেরাউন তাঁর উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । তখন আছিয়া (আঃ) এর উপর নেমে আসে অসহনীয় নির্যাতন । ফেরাউনের নির্দেশে তাকে কারারুদ্ধ করা হয় । বিরাট পাথরের নিচে তাঁকে চাপা দিয়ে রাখা হয় । প্রস্তরাঘাতে তাঁর পবিত্র দেহকে ক্ষতবিক্ষত করা হয় । তাঁর চোখ উপড়ে ফেলা হয় । কিন্তু এসব অমানবিক নির্যাতন-নিপীড়নেও আছিয়া (আঃ) হতাশ হন নি এবং ফেরাউনের কাছে নতি স্বীকার করেন নি । আছিয়া (আঃ) কাফের ও জালিম স্বামীর জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেও ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন । এমন সব ঈমানদার নারীরা যখন আমাদের আদর্শ তখন আমাদের কন্যাদের শুধু অ্যাকাডেমিক পরীক্ষায় নয়, জীবনের সব পরীক্ষায় সফল হওয়া উচিৎ ।

সবুজ শাড়ি

সবুজ রঙের উপর লাল লাল ফুলের ছোপ, কী সুন্দর শাড়ি, আম্মাকে খুব মানাবে, আর হালকা নীল শাড়িটা ওটা দাদিকে, আর ওই যে কচু পাতা রঙের শাড়িটা ওটা ফর্সা পাগলি বুবুটাকে মানাবে, কী সুন্দর নতুন শাড়ির গন্ধ, বুবুটা যে কী খুশি হবে আর দাদিটা ফোকলা দাঁত সব বের করে হাসবে। শাড়িগুলোর উপর হাত বুলাচ্ছে নাসরিন, কবে বাড়ি যাবে, কবে যে মা, বুবু, দাদি, এক পা খোঁড়া আব্বা আর ছোট বোনটাকে দেখতে পাবে। বাড়ির মালিক খালাম্মার ডাকে নাসরিন ফিরে তাকায়।

‘কী রে, নাসরিন, শাড়িগুলো পছন্দ হয়েছে? তোর খালু এবার তিন হাজার শাড়ি যাকাত হিসেবে গ্রামের মানুষদের দিবে, আমি তোর জন্য এই তিনটা আলাদা করে রেখেছি।’

‘খালাম্মা খুব ভালো হইব, এবার গ্রামের সব মহিলারা নতুন কাপড়া পইরা ঈদ করবার পারব।’

‘হুম, এবার তো আমরাও গ্রামে ঈদ করব। যেদিন যাকাত দেবে সেইদিন রাতেই রওনা দেবো। ভোরে যেয়ে পৌঁছব। তোর খালু আগেই যাবেন। নিজ হাতে যাকাতের কাপড় বিলাবেন। স্থানীয় খবরের কাগজেও ছাপানো হবে। বুঝলি, এবার তিনগুণ শাড়ি দেওয়া হবে। গতবার তো একহাজার শাড়ি দিয়েছিল। এবার

মাইকিং করা হয়েছে। বিশাল ব্যাপার।'

নাসরিনের মুখটা খুশিতে ঝলমল করে উঠল। গ্রামের সব বৌ-ঝিয়েরা নতুন শাড়ি পরে আয়েশ করে পান চিবাতে চিবাতে বিকেলের মরা রোদে টং এর উপর বসে গল্প করবে। হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের গায়ে ঢলে পড়বে। অলস সময়টাতে নতুন বউয়েরা হয়ত শাশুড়ির জটা চুলে তেল দিয়ে পরম যত্নে বিলি কেটে দেবে। মায়েদের আনন্দে বাচ্চারাও খেলতে খেলতে হেসে উঠবে। মায়ের গায়ের নতুন শাড়ির গন্ধ নিতে হয়ত কোনো কোনো বাচ্চা মাকে জড়িয়ে ধরে আদর নেবার ছলে শাড়ির মাড়ের অদ্ভুত সুন্দর ঘ্রাণ নেবে। আহঃ এবারের ঈদটা কত আনন্দের হবে।

পাশের রুম থেকে সেলিম সাহেব ডাকছেন। সেলিম সাহেব স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'এই শুনছ, মত পাল্টালাম, তিন হাজার না, পাঁচ হাজার শাড়ি দেবো ঠিক করলাম। সামনে ইলেকশন, এখন থেকেই ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করে রাখতে হবে। মাইকিং এখন থেকেই করতে বলেছি। আমাদের পাঁটের গুদামের মাঠটাতে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে। আমি তোমাদের আগেই আগামীকাল বাড়ি যাব। তোমরা তার পরের দিন এসো।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাকে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

'কি কথা? বলো'

'তোমার তো যাকাতের অনেক টাকা, একজন কে ত্রিশ হাজার টাকা দিতে পারবে? লোকটার এক পা ভাঙা। কাজ করতে পারে না। একটা মুদির দোকান দিলে বসে বসে কাজ করতে পারত আর পরিবারটা তাহলে স্বাবলম্বী হতো।'

'কার কথা বলছ? নাসরিনের বাবা? স্ত্রী লোকের যে আসলেই বুদ্ধি নাই তা আবার প্রমাণ করলে। নাসরিনের টাকায় ওদের সংসারটা চলে। ওর বাবা যদি ইনকাম করে তাহলে কি তার মেয়েকে তোমার কাজের লোক হিসেবে রাখবে? লস টা তো তোমারই হবে। সারভেন্ট ছাড়া এভাবে পটের বিবি হয়ে থাকতে

পারবে?'

'আমার কি হবে সেটা পরে ভাবা যাবে। তোমার মতো এত প্যাঁচানো বুদ্ধি আমার নাই। আমি তো শুধু মানুষের ভালোই চেয়েছি। যে যাকাত মানুষের কাজে লাগে না, সেটা কেমন যাকাত? আমার মাথায় ঢোকে না।'

আজকে শেষ রোজা। সাহরি খেয়ে নাসরিনের মা, বুবু আর দাদি ঘুমায় না। আজকে সেলিম সাহেব কাপড় দিবে। সকাল ৭টায় পাঁটের গুদামের দরজা খুলবে। লাইন ধরে দাঁড়াতে হবে। আগে আগে যেতে হবে।

নাসরিনের বড় বোন নসিমন দাদির দিকে তাকাল। এরকম অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি যেতে চাচ্ছেন। একটা সাদা থানে আলুথালু বেশে লাঠিতে থুতনিটা ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে বসে আছে। প্রায়ই অসুস্থ থাকে, হাত পা কাঁপে, শরীরে বল পায় না। এই রকম বয়সে সে নতুন শাড়ি দিয়ে কী করবে নসিমন ভেবে পায় না। রোজা থেকে এরকম চড়া রোদে দাদি আবার অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন। দাদিকে আটকাতে হবে। নসিমন দাদির দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাদি, তুমি থাক। বুড়া মানুষ। রোজা আছ, তার মধ্যে আবার চড়া দিন। মানষের পাড়াপাড়িত তুমি চ্যাপ্টা হইয়া যাইবে। তোমার যাওনের কাম নাই। তুমি নয়া কাপড় দিয়া কী করবা? পরার শখ হইলে আমারটা পরিও।'

দাদি খেঁকিয়ে উঠে বললেন, 'ঐ ছেমড়ি! তুই খালি আমারে বুইড়া কস। মুই তোর চ্যায়া জোয়ান আছম, বুঝলু? মোর নয়া কাপড়া পরার শখ নাই। খায়েরের পোয়াতি বউ এর কাছে কাপড়াটা বেচিম। সেই ট্যাকা দিয়া পোলাটাক ডাক্তার দেখামু।'

নাসরিনের মা দাদি-নাতনীর ঝগড়া বন্ধ করতে আসেন, 'ঐ নসিমন, তোর দাদির সাথে ঝগড়া বন্ধ কর। চল হাঁটা দেই। দেরি হইয়া যাইব। আজক্যা আবার নাসরিন ঢাকাত থাইক্যা আইব। শাড়ি নিয়া আবার বাড়িত আইস্যা রাঁন্ধন লাগব। মাইয়াটা কতদিন মোর হাতের রাঁন্ধা খায় না।'

নসিমন, নাসরিনের মা আর দাদি, তিনজন ভোরের আলোয় ঘর থেকে বের হলো। ভোরের আলো ফুটি

ফুটি করছে। ওরা গ্রাম ছেড়ে মফস্বল শহরের মেইন রাস্তায় চলে আসল। মানুষের স্রোতের সাথে হাঁটতে হাঁটতে পাঁটের গুদামের কাছে এসে হা হয়ে গেল। এত মানুষের ভিড়। এরা কখন এসেছে কে জানে। এরা মনে হয় এখানেই সাহরি খেয়ে বসে আছে। বিশাল টিনের গেট। সকাল সাতটায় খুলবে। এতক্ষণ তারা এখানে বসে থাকবে। সকাল সাতটা বাজতে মানুষের জটলা ভারী হয়ে এল। পুরো এলাকার মানুষ বোধ হয় এসেছে। মানুষের খালি মাথা দেখা যাচ্ছে। ওরা তিনজন জটলার মধ্যে মিশে গেল। সারাবছর ধরে অপেক্ষার ফল একটা নতুন শাড়ি পেতেই হবে। শত তালি দেওয়া, জীর্ণ শাড়িটা দিয়ে যে শরীর ঢাকে না। যে করেই হোক একটা শাড়ি পেতেই হবে।

গতরাতের প্রাইভেট কারে খালাম্মা আর তাদের দুই সন্তানের সাথে নাসরিন বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। গাড়ি সকাল ১০টার দিকে মফস্বল শহরটাতে ঢুকে পড়ল। নাসরিনের ঘুমঘুম ভাবটা মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল। জানালা দিয়ে উসখুস মনে তাকিয়ে থাকে। একটু পর পর সাইরেন বাজিয়ে অ্যাম্বুলেন্স সাঁই করে চলে যাচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্সের শব্দটা বুকের ভিতর তোলপাড় করে দিয়ে গেল। কোনো খারাপ কিছু ঘটে নি তো? গাড়ি পাটের গুদামটার কাছে আসার আগেই বন্ধ হয়ে গেল। মানুষ আর মানুষ, তার মধ্যে শুধু কান্না আর চিৎকারের আওয়াজ। নাসরিন ওর স্ক্র্যাচে ভর দেওয়া বাবাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পেল। নাসরিন গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে গেল। সারি সারি লাশের সাথে ওর মা, দাদি আর বুবুর লাশ পড়ে আছে গুদামের বারান্দায়। নাসরিন চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠে বলল, ‘মাগো, আমি তোমাগো লাইগা তো শাড়ি আনছি, ক্যান তোমরা এইখানে আইছিলা? ক্যাডায় তোমাগো মাইরা ফ্যালাইল, আল্লাগো, এইডা কি হলো গো।’

নাসরিনের বাবা বুক চাপড়ে কেঁদে উঠে বলল, ‘মুই ওগো মারছম, মুই যদি কাম করবার পারতাম তাইলে কি ওরা ফকিরনীর মতো একটা কাপড়ার লাইগ্যা আইত। মানষের পায়ের তলে পইরা মরতো। সব দুষ মোর, মোর এই ভাঙা পাও টার। আল্লাহ্ ঠিক কামই করছে। মুই কাম করবার পাম না, কাকো খিলাবার পাম না, তাই সবগুলারে উঠায় নিছে। কাঁন্দ, আরো জোরে কাঁন্দরে মা, চিৎকার দিয়া কাঁন্দ তোর কাঁন্দন জানি বড়লোকের ঠসা কানত যাইয়া পৌঁছায়। বড়লোকেরা আমাক কামত নেয় না। কেউ আমাক একটা কামের

ব্যবস্থা কইর‍্যা দেয় না। ও বড়লোকেরা, হামার কাঁন্দন কি তোমরা শুনবার পাও?’

টিকাঃ আমাদের সমাজে প্রতি বছরেই যাকাতের কাপড় নিতে গিয়ে মানুষ পদ দলিত হয়ে মারা যায়। তবুও এরকম সিস্টেমের যাকাত বন্ধ হয় না। কিছু বিত্তবান মানুষেরা দরিদ্র মানুষদের লাইনে দাঁড় করিয়ে নিম্ন মানের শাড়ি-লুঙ্গি বিতরণ করে। লোক দেখানো খ্যাতির মোহে নিজেদের মনগড়া যাকাতের সিস্টেমে যাকাত আদায় করে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে।

এদের উদ্দেশ্য ধর্ম পালন নয়, ধর্ম কে বিকৃত করে দাতা হিসেবে সুনাম কুড়ানো, এরকম মনগড়া সিস্টেম ইসলাম ধর্মে নাই। আমাদের দেশেই শুধু এরকম শাড়ি-লুঙ্গি দিয়ে মানুষ যাকাত আদায় করে যা রসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাদের আমলের বিপরীত। এভাবে যাকাত আদায় করলে যাকাতের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হলো অভিশপ্ত পুঁজিতন্ত্রের মূলোৎপাটন করা এবং সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা। ধনী-গরীবের বৈষম্য দূর করা, সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু লোককে আয়ের উৎস তৈরি করে দেয়া, দরিদ্রতা বিমোচন করা, অর্থনৈতিক কল্যাণের পথ প্রশস্ত করা, নিজের কষ্টে উপার্জিত সম্পদকে পবিত্র করা, আত্মশক্তি অর্জন করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা।

সুতরাং, অবশ্যই সম্পদের যাকাত দিতে হবে নগদ অর্থ দিয়ে। নবির সুন্নত বিরোধী, রিয়া মিশ্রিত নিম্ন মানের যাকাতের কাপড় বিতরণের মাধ্যমে যাকাত আদায় আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এর দ্বারা যাকাতের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। সহীহ হাদীস দিয়ে প্রমাণিত রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ ও সাহাবীদের আমল হলো ফসলের যাকাত ফসল, গবাদি পশুর যাকাত গবাদি পশু ও সম্পদের যাকাত নগদ অর্থ দিয়ে

আদায় করতে হবে। যাকাত ভিক্ষা নয় বরং যাকাত হলো ধনীর সম্পদে গরিবের অধিকার, খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে মানুষ পরিপূর্ণ ভাবে যাকাতের নীতিমালা মেনে চলায় আরবে যাকাত গ্রহণ করার কোনো লোক ছিলনা। আমরা কি পারি না, আবার সেই স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনতে যেখানে যথাযথ ভাবে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষগুলোর আয়ের উৎস তৈরি হবে আর তারাই একদিন যাকাত গ্রহীতা নয় যাকাত দাতা হিসেবে পরিচিত হবেন।

খিলাড়ি

সম্পর্কের শেষ সুতাটা আজ টান মেরে ছিঁড়ে ফেলা হবে। কবে থেকে যে সম্পর্কটা শীতল হতে শুরু হয়েছিল মনে করতে পারছে না মিলি। যখন থেকে মুরাদ দুই হাতে টাকা কামানো শুরু করল তখন থেকেই বোধ হয়।

মিলি আর মুরাদের পনের বছরের সংসার। আজ তাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে ছাড়া ছাড়ি হয়ে যাবে। মিলি এই সংসারটার জন্য কম কিছু ত্যাগ স্বীকার করে নি, আজ সবই ধূসর স্মৃতি। প্রথম জীবনে মুরাদের স্বল্প বেতনের সংসারটা মিলি কষ্টে সৃষ্টে চালিয়ে নিয়ে যেত। কোনো কোনো বেলায় মুরাদকে খাইয়ে নিজে না খেয়েও থেকেছে। তার উপর আবার শ্বশুর বাড়ির অপবাদ অভিযোগ সহ্য করতে হতো। মুরাদ নাকি মস্ত বড় অফিসার, অনেক টাকা ইনকাম করে কিন্তু বউয়ের কানপড়াতে কোনো টাকা নাকি বাড়িতে পাঠায় না, ছোট ভাই-বোনদের দায়িত্ব নেয় না, বৃদ্ধ বাবা-মার সাথে ভালো করে কথাও নাকি বলে না। সবটাতেই নাকি বউয়ের ইন্ধন আছে। মিলি এসব শুনে খুব কষ্ট পেয়েছিল। সেই ঈদের ছুটি শেষে মিলি একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে জয়েন করেছিল। মুরাদ কে দিয়ে বাড়িতে অল্প-স্বল্প টাকা পাঠাত। তারপর একদিন মুরাদ তার বিশাল পরিবারের চাহিদা মেটাতে বিদেশে পাড়ি জমাল। অবৈধ অভিবাসী হিসেবে সে ধরা পড়ে। তিন

বছর জেল খেটে নিঃস্ব অবস্থায় দেশে ফিরে। এই তিনটা বছর ছেলেটাকে নিয়ে মিলি নিদারুণ কষ্টে দিন পার করেছিল। এক রুমের সাবলেটে থাকত, ছেলেকে কোলে নিয়ে স্কুলে হেঁটে যেত, আয়ার কাছে রেখে ৮ টা থেকে ২টা পর্যন্ত ক্লাস নিত। বিকেলে এ বাড়ি ও বাড়ি বাচ্চা পড়িয়ে কিছু টাকা পেত আর তা আলাদা করে জমিয়ে রাখত। সারাদিনের খাটা খাটনির পর শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ত কিন্তু ঘুম আসত না। গভীর রাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কাঁদত।

এই তিনটা বছর মুরাদের কোনো খোঁজ খবর সে পায় নি। পরে দূতাবাসে খোঁজ নিয়ে তার বেঁচে থাকার হদিস পায়। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে বাংলাদেশ থেকে টাকা পাঠিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করেছিল। যখন সে ফিরে আসে শুধু তার শরীরের হাড় গুলো দেখা যেত, অনেক চিকিৎসার পর সে সুস্থ হয়ে উঠেছিল। মিলি তার এক ছাত্রের বাবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মুরাদকে কাজে ঢুকিয়েছিল। মুরাদ খুব অল্প সময়েই ব্যবসার অনেক কিছুই শিখে ফেলেছিল। মিলির জমানো টাকা দিয়ে নিজেই একটা ছোট ব্যবসা দাঁড় করিয়েছিল। তারপর আর পিছন ফিরে তাকায় নি মুরাদ। ছোট্ট দোকান থেকে বড় পাঁচতলা মার্কেট গড়েছিল। অভাব কবে পালিয়েছিল মিলি তা বলতে পারে না। মুরাদ কবে তার থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে গিয়েছিল সেটাও সে মনে করতে পারছে না। বড্ড বোকা মেয়ে আমি, মনে মনে নিজেকে গাল দেয় সে।

মুরাদের কাঁচা টাকা হাতে আসতে শুরু করেছিল, সেই টাকার গরমে মিলি কে সে ভুলেই গিয়েছিল। নতুন ঝাঁ চকচকে সুপার শপ, নতুন ফ্ল্যাট, নতুন গাড়ি সবকিছুই নতুন, এসবের মাঝে মিলিকেই শুধু বড্ড পুরাতন আর বেমানান লাগত। তার পিএস লাবণ্য, সে সত্যিই লাবণ্যময়ী। হাসলে যেন মুক্তা ঝরে। বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে। মনের গহীনে গভীর ব্যথা অনুভব হয়। এ যেন শেষের কবিতার লাবণ্য। 'অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, তাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমা-রাত্রির মতো, উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য সকাল-বেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত। তাকে মেয়ে করে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন; তাকে দেখলেই বোঝা যায়, তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয়, সেই সঙ্গে আছে মননের শক্তি। এইটেতেই অমিতকে এত করে আকর্ষণ করেছে।

অমিতের নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে, ক্ষমা নেই, বিচার আছে ধৈর্য নেই; ও অনেক জেনেছে, শিখেছে, কিন্তু শান্তি পায় নি। লাবণ্যর মুখে ও এমন একটি শান্তির রূপ দেখেছিল যে শান্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।' যৌবনে পড়া 'শেষের কবিতা' এর লাবণ্য তার আরাধ্য রমণী ছিল। অমিত-লাবণ্যের অমীমাংসিত ভালোবাসা তাকে কষ্ট দিয়েছিল। হ্যাপী এন্ডিং হলে কি বা ক্ষতি ছিল। তার জীবনেও যে সত্যি সত্যি লাবণ্য আসবে তা সে ভাবতেও পারে নি। কঠিন পরিশ্রম আর সংগ্রামের জীবন, অভাবের সাথে লড়ে আজ সে সফল। প্রেম-ভালোবাসার সময় আর কোথায় পেল! এখন যখন এসেছে উপন্যাসের মতো অসমাপ্ত ভালোবাসা হতে দেয়া যায় না।

আর মিলির সাথে তার প্রেম, ছিল বোধ হয় বিয়ের প্রথম কয়েক বছর। তারপর তো সে পাড়ি দিয়েছিল জীবিকার সন্ধানে। জীবনে লাবণ্য আসার পর মুরাদের চোখে নতুন রঙিন জগৎ এসে ধরা দেয়। সেই চোখ মিলিকে 'আনরোমান্টিক আর সেকেলে' হিসেবে নিরূপণ করে। অভাবের সাথে লড়তে লড়তে সদ্যহাস্যময়ী যুবতি মেয়েটা কবে রসহীন কঠিন এক মহিলা হয়ে গিয়েছিল মুরাদ টেরও পায় নি। এখন কপালে তার দুশ্চিন্তার ভাঁজ গুলো স্থায়ী ভাবে পড়ে গেছে। কোমল হাতগুলো কর্মঠ শক্ত হাতে রূপ নিয়েছে। মিলির সাথে আনরোমান্টিক দম বন্ধ করা এই সম্পর্কটা থেকে এখন সে মুক্তি চায়। হ্যাঁ মুক্তি। দম বন্ধ করা ঘরে যেমন হঠাৎ বাতাস এসে ঝাঁপটা দেয়, প্রশান্তি এনে দেয়, লাবণ্য ঠিক সেই রকম। এখন সে রুদ্ধশ্বাস বাতাস থেকে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে চায়। বিদেশের কারাগারে বসে সে কতদিন মুক্তির বাতাসের ঘ্রাণ নিতে চেয়েছিল। মুরাদ চোখ বন্ধ করে সেই অন্ধকার দিনগুলোতে ফিরে যায়। না, আর না, এবার ঝলমলে আলোর মুক্ত বাতাসে সে ভেসে বেড়াবে।

মিলি যেন শূন্য মাথায় বিশাল ফ্লাটের এক রুম থেকে অন্য রুমে ভেসে বেড়াচ্ছে। নিঃশেষিত মিলির আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। যৌবনে সংসারের হাল ধরেছিল, কবে যে পলেস্তর খসে পড়ার মতো তার যৌবন খসে পড়েছিল খেয়াল নাই। এখন তার কুঁচকে যাওয়া শরীরে বার্ধক্যের আনাগোনা, স্বামীর অবহেলায় তা যেন আরো বর্ণহীন। সম্পদ বলতে সে শুধু তার স্বামী আর পুত্রকেই বুঝেছিল। তাই সব উজাড় করে দিয়ে আজ

সে নিঃস্ব। যে বাড়ি, যে সংসারটাকে সে এতদিন আপন ভেবে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল, সব খুঁটিনাটি সে নিজের মতো করে সাজিয়েছিল, আজ তা বালির বাঁধের মতো এক নিমিষেই ভেঙে গেল। এই বাড়ির প্রতিটা ঘর তার হাতে সাজানো, বারান্দায় টবে লাগানো গাছগুলো তার সন্তানের মতো, সে খুব যত্ন নিত আর মাঝে মাঝেই ওদের সাথে ফিস ফিস করে কথা বলত। যেদিন কোনো গাছে ফুল ফুটত, সে আনন্দে গুনগুন করে গান গাইত। ছেলের রেজাল্ট কার্ডের এ প্লাস দেখলে যেমন আনন্দ হতো ঠিক সেইরকম আনন্দ অনুভব করত। বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে সে বিকেলের চা খেত আর খাঁচার ময়নাটার সাথে কথা বলত। আজ বিকেলে ল-ইয়ার আসবে। সে খাঁচার ময়নাটাকে মুক্তি দেবে, সাথে মুরাদকেও। বেচারা মুরাদ! হাতজোড় করে কাঁদো কাঁদো নয়নে গতরাতে তার কাছে মুক্তি চেয়েছে। এই বিদায় বেলায় মুরাদের সাথে কেনো যেন খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে। মানব-মন বড়ই অদ্ভুত। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইজিচেয়ারে বসে চোখ মুদে ফেলে মিলি। মুরাদকে যেন তার সামনের চেয়ারটাতে বসে থাকতে দেখে।

‘মুরাদ, কত কাল আমরা পার করেছি, বলতে পারো? সেই স্বপ্ন জাগানিয়া রাতগুলোর কথা তোমার মনে পড়ে? তুমি স্বাচ্ছন্দ্য আর প্রাচুর্যের গল্প শোনাতে। কী অদ্ভুত শিহরণ জাগানো সেই সব রাতগুলো। অভুক্ত শুকনো মুখে আমরা হাসতাম। আনন্দ আর হাস্যরস দিয়ে তুমি আমার জীবনটা ভরিয়ে দিতে। মাঝে মাঝে বিকেলে পার্কে দুই টাকার বাদাম চিবাতে চিবাতে সূর্যাস্ত দেখতাম। তুমি আমাকে সমুদ্রের অতল পানিতে ডুবে যাওয়া সূর্যাস্ত দেখাতে চেয়েছিলে। মনে পড়ে? তুমি তো সেই কথা রাখো নি। আজ তোমার-আমার জনম জনমের সম্পর্কের সূর্যাস্ত হতে যাচ্ছে।’

‘আম্মা, কে যেন এসেছেন, লউয়ার না কী যেন নাম বলছেন।’

কাজের মেয়ে সীমার ডাকে সম্বিত ফিরে পেল মিলি।

‘হ্যাঁ, আসছি, যা বসতে বল।’

মুরাদের সব কিছুই গুছানো। এত চমৎকার গুছিয়ে কাজ করতে পারে রীতিমত চমকে যেতে হয়। এবারো সে চমকে দিয়েছিল। দুই বছর ধরে প্ল্যান করে এগুচ্ছে মুরাদ অথচ মিলি টেরও পায় নি। এত বোকা কেউ

হয়। পাঁচ তলা মার্কেটের উপরের তলাতে সে বিলাসবহুল আবাস করেছিল, ছাদে সুইমিংপুল, পূর্ণিমার রাতে তারা সেখানে জলকেলি খেলত, ওটা ছিল তাদের প্রেমকুঞ্জ। লাবণ্য আর মুরাদ দুইজনেই প্ল্যান করে সাজিয়েছিল। দক্ষ খিলাড়ি মুরাদ কখনো মিলিকে সেই পাঁচতলার ফ্লাটে নিয়ে যায় নি। গত ঈদেও ঐ মার্কেট থেকে শপিং করেছে অথচ একবারের জন্যও মুরাদ ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে যেতে চায় নি। ছেলে নামী-দামি স্কুলে পড়ত, হঠাৎ একদিন তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছিল। পরের মাসেই তাকে ভারতের এক স্কুলের হোস্টেলে রেখে এসেছিল। মিলি এসব প্ল্যানের কিছুই বুঝে নি। লাবণ্যকে নিয়ে উড়ো কথা যে কানে আসে নি তা নয়, কিন্তু মুরাদের প্রতি অন্ধ মিলি কিছুই বিশ্বাস করে নি।

এত কষ্টের মধ্যেও মিলি হাসে। ইংরেজিতে অনার্স করেছিল সে কত কাল আগে, তখন লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখত। তার একটা লাল মলাটের কবিতার খাতা ছিল। তার নিজের লেখা একটা কবিতা সে মনে করতে থাকে ...

‘Planner, Oh Planner!
Play with me as you can….
But remember, One planner is existed who is planner of all planners….’

‘আম্মা, লউয়ার চাচা ডাকতেছেন, জলদি আসেন। খালুর কী জানি হইছে, কী যেন কইছেন।’

সীমা মিলির হাত ধরে টেনে ড্রয়িং রুমে নিয়ে গেল।

‘আপনার হাসব্যান্ড গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন। ওনার বাগদত্তা লাবণ্য ম্যাডামও সাথে ছিলেন। ঢাকা-সিরাজগঞ্জ রুটে লং ড্রাইভে গিয়েছিলেন। ওনার কল রেজিস্ট্রারে আমার নাম্বারটা প্রথমে ছিল। স্থানীয় কেউ একজন ফোন দিয়ে জানাল। ম্যাডাম স্পট ডেড আর স্যারের অবস্থা আশঙ্কাজনক।’

মিলির পুরো শরীর থরথর করে কাঁপছে। উকিল সাহেব কী বলছেন যেন মাথাতেই ঢুকছে না। মিলির মাথায় তখন তার স্বরচিত সেই পুরাতন কবিতাটা ঘুরপাক খাচ্ছে।

‘Planner, Oh Planner!

Play with me as you can….
But remember, One planner is existed who is planner of all planners….’

টিকাঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী। মানুষ যতই পরিকল্পনা করুক বা অন্যের ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহ্র পরিকল্পনার কাছে এক সময় তারা মুখ থুবড়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ আছে, ‘তারা ষড়যন্ত্র করেছিল এবং আল্লাহও কৌশল গ্রহণ করেছিলেন এবং কৌশল গ্রহণকারীদের মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ।’ (সূরা আনফাল:৩০)

মানুষের বিভিন্ন পাপের কারণে আজাব আসে এবং তাদের চক্রান্ত এমনভাবে ব্যর্থ হয় যে তারা টেরও পায় না। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তারা চক্রান্ত করেছিল। আমিও কৌশল অবলম্বন করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। সুতরাং দেখো, তাদের চক্রান্তের পরিণতি কী হয়েছিল! আমি অবশ্যই তাদের ও তাদের জাতির সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি। এই তো তাদের ঘরবাড়ি সীমা লঙ্ঘনের কারণে যা জনশূন্য পড়ে আছে। এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে।’ (সুরা : নামল : ৫০-৫২)

রত্নগর্ভা

ফাতিমার ঘরে নতুন এক প্রতিবেশী মহিলা খাবার নিয়ে ঢুকলেন। খাবার টেবিলের উপর রেখে তিনি ফাতিমার সাথে বিছানায় বসে গল্প করতে লাগলেন। আম্বিয়া, ফাতিমাদের এলাকায় নতুন এসেছে, তারা ফাতিমাদের পাশের তাঁবুতে থাকেন।

আম্বিয়া ফাতিমার কয় ছেলে মেয়ে জিজ্ঞেস করতেই ফাতিমা হেসে বলে, 'আলহামদুলিল্লাহ, আমার চার ছেলে।'

হঠাৎ একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়ে ঘরে ঢুকল। পায়ে চোট পেয়েছে, রক্ত পড়ছে আর কাঁদছে।

ফাতিমা উঠে যেয়ে শান্ত গলায় বলল, 'তারিক, কী হয়েছে? কোথায় ব্যথা পেলে?'

তারিক ভ্যা ভ্যা করে কাঁন্নার স্বরে বলল, 'মা, আমি খুব ব্যথা পেয়েছি। ওমর আমাকে ধাক্কা দিয়েছে।'

ফাতিমার মুখ গম্ভীর হলো। সে রেগে পিঠে দু'টো চাপড় মেরে বলল, 'এত অল্পতেই কেউ কাঁদে? তুই না আমার তারিক বিন যিয়াদ, সেই স্পেন জয়ী সাহসী বীর!'

তারিকের চোখ মুছে দিয়ে ব্যান্ডেজ পরিয়ে আবার খেলতে পাঠাল। আম্বিয়া এতক্ষণ চুপ করে ফাতিমা

আর তার ছেলে তারিকের কথোপকথন শুনছিলেন।

এবার তিনি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার আর ছেলেরা কোথায়?'

ফাতিমা খুশি গলায় বলল, 'বড় দুই ছেলে তার মালিকের কাছে আছে। খুব ভালো অতিথিপরায়ণাতেই আছে।'

আম্বিয়া আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ও, ওরা বুঝি আপনার সাথে থাকে না? কোনো মালিকের কাছে কাজ করে, বুঝি? খুব ভালো মানুষ বুঝি?'

ফাতিমা মৃদু হেসে বলল, 'না, মালিক মানে আল্লাহর কাছে ওরা আছে। আমার বড় দুই ছেলে ইসরাইলের ইহুদি জায়ানিস্টদের সাথে সামনাসামনি যুদ্ধ করেছে। মৃত্যুভয় কে তুচ্ছ করে ওরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়েছিল। বীরত্ব, ধৈর্য ও দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে ওরা সৌভাগ্যশালী হয়েছে। আমি সেই সৌভাগ্যবান শহীদদ্বয়ের মা।'

আম্বিয়া খুব অবাক হলেন। এ কেমন মা! ছেলের মৃত্যুর কথা কী অকপটে বলছে, কান্না তো দূরে থাক মুখে কী হাসি, আনন্দ আর প্রশান্তির চিহ্ন। তিনিও এই যুদ্ধ বিদ্ধস্ত ফিলিস্তিন উপত্যকায় পাঁচ বছর আগে তার বাবা আর ভাইকে হারিয়েছেন। তারাও যুদ্ধ করে মারা গেছেন। সেই ব্যথা তিনি আজো ভুলতে পারেন নি। হৃদয়ে গভীর ক্ষত তৈরি হয়ে আছে। এখনো গভীর রাতে তিনি কাঁদেন। আর ফাতিমা তার দুই কিশোর ছেলেকে হারিয়ে ব্যথিত নয়। যেন শহীদ হবার জন্যই সে তাঁদের জন্ম দিয়েছিল। ধৈর্য আর আল্লাহ্‌র ফয়সালার উপর সে কত সন্তুষ্ট।

আম্বিয়ার ভিতর থেকে 'সুবহান আল্লাহ্‌' বেরিয়ে এল। আম্বিয়া আবার প্রশ্ন করলেন, 'আরেক ছেলে কোথায়?'

ফাতিমার মুখে লাজুক হাসি, 'ও আমার গর্ভে। ওর নাম যুলকারনাইন। ও হবে সূরা কাহফের সেই যুলকারনাইনের মতো, যার জয় পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণ দিকেও বিস্তৃত ছিল। যিনি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ইয়াজুজ-মাজুজের হাত থেকে অসহায় মানুষকে বাঁচাতে গলিত তামা ঢালা অগ্নিপ্রাচীর নির্মাণ

করেছিলেন। আমার ছেলে হবে তাঁর মতো বীর যে শুধু ফিলিস্তিন নয়, পৃথিবীর সব মজলুম মুসলিমের পক্ষে লড়বে। ও গাজী হয়ে ফিরবে, তখন ওর কপালে আমি বিজয়ের চুমু অঙ্কিত করে দেবো। আমি হবো সেই বীরের মা। আমি ওর অপেক্ষার প্রহর গুণছি।'

আম্বিয়ার মুখেও হাসি ফুটে উঠল। এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত উপত্যকায় এইরকম একজন যোদ্ধার খুব প্রয়োজন। এমন একজন বীর জন্ম দিয়ে 'রত্নগর্ভা' হওয়া তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। ফাতিমাকে তার সেই চার শহীদের বীরমাতা আল-খানসা (রাঃ) এর উত্তরসূরি মনে হলো।

আল-খানসা (রাঃ) ছিলেন তদানীন্তন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠা মহিলা কবি যিনি তাঁর চার ছেলে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছিলেন। কাদেসিয়া প্রান্তরে পারস্য সম্রাটের সাথে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর এক ভয়াবহ যুদ্ধ চলছিল । যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই খানসা তাঁর ছেলেদের কাছে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, 'তোমাদের আমি বহুকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছি। বহু দুঃখ বিপদের ভেতর দিয়ে মানুষ করে তুলেছি। এখন আমার কথা শোন, সত্যের জন্য যুদ্ধ করার মহত্ত্বের কথা স্মরণ কর আর স্মরণ কর কুরআনের নির্দেশ -দুঃখ বিপদের মধ্যে ধৈর্য ধারণে বজ্রসার আদেশ । কাল প্রভাতে সুস্থ মনে শয্যা ত্যাগ করে শংকাহীন চিত্তে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করবে- সর্বাপেক্ষা সাহসী যোদ্ধার সম্মুখীন হবে এবং প্রয়োজন হলে নির্ভীক চিত্তে শহীদ হবে।'

পরের দিন খানসা (রাঃ) এর চার ছেলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং একে একে চার জনই শহীদ হলেন । মৃত্যু সংবাদ বীর মাতার কাছে পৌঁছলে তিনি দু'হাত উপরে তুলে বললেন, 'আল্লাহ, আমাকে আপনি শহীদের মাতা হবার সৌভাগ্য দান করেছেন, আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ।' বীরমাতার কোনো কষ্ট বা বিলাপ নাই। শহীদের মা হয়ে তিনি যেন আল্লাহ্‌র কাছে রত্নগর্ভার মর্যাদা পেলেন।

স্পেন জয়ী তারিক বিন যিয়াদ, সিন্ধু জয়ী মুহম্মদ বিন কাশিম, আরও কত বীর, কত শহীদ, কত গাজী, কত সাহসী নির্ভীক যোদ্ধাদের যুগে যুগে মুসলিম মাতারা ধারণ করেছেন, কত রত্ন কে বড় করেছেন। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কষ্টে লালিত প্রিয় ছেলে কে শুধু আল্লাহকে ভালোবেসে স্বেচ্ছায় তপ্ত পীচ ঢালা পথে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁরাই তো আসল রত্নগর্ভা, আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় মাতা।

সখী, ভালোবাসা কারে কয়

কার্জন হলের শেষ মাথায় বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট। মোস্তাফিজ স্যারের ক্লাসটাই শেষ ক্লাস, আজকে আর প্রাকটিক্যাল ক্লাস নাই। একটার চৈতালী বাস ধরতে হবে, তমা দোতলার সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে কার্জন হলের রাস্তা দিয়ে বাসের দিকে সোজা হাঁটা দিল। আগে না গেলে, বাসে সিট পাওয়া যায় না। আজকে ভ্যালেন্টাইনস ডে, কার্জন হলের মাঠটাতে জোড়ায় জোড়ায় কপোত-কপোতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেয়েরা লাল শাড়ি আর ছেলেরা পাঞ্জাবি পরেছে, কী চমৎকারই না দেখাচ্ছে। তমা মুগ্ধ হয়ে জুটিদের দেখে। কার্জন হলের মাঠটা ফুলে ফুলে ভরে গেছে। গতকাল ছিল পহেলা ফাল্গুন, সেদিন মেয়েরা বাসন্তি রঙের শাড়ি পরে, মাথায় ফুল আর গালে আল্পনা এঁকে প্রিয়জনের হাত ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে। আজ তারা ভালোবাসার লাল রঙে সেজেছে। কী সুন্দর, সে যদি এরকম করে সাজতে পারত। তার দিকে কেউ যদি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকত। একুশ বছর পেরিয়ে গেল, তবুও কেউ ওভাবে সামনে আসে নি, কেউ তাকে উথাল পাথাল ভালোবাসার গল্প শোনায় নি। হায়! তার ভিতরটা হাহাকারে ভরে গেল।

দূর থেকে সে আসিফকে পিছনে হাত বাঁধা অবস্থায় আসতে দেখে। আসিফ অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সের চতুর্থ

বর্ষের ছাত্র। ঢাবির চৈতালী বাসে দুইজন একসাথে যাতায়াত করে। মিরপুর এক নম্বর সনি সিনেমা হলের পিছনে দুই পাশের দুই বিপরীত গলিতে তাদের দুইজনের বাড়ি। একই সাথে উঠানামা করতে করতে তাদের দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। তমা স্ট্যান্ডে না আসা পর্যন্ত আসিফ ছটফট করে, আবার আসিফ না আসলে তমারও যেন কেমন কেমন লাগে। এই ছটফটানি আর টান দুইজনেই অনুভব করে কিন্তু কেউ কাউকে কখনো মুখ ফুটে বলে নি।

আসিফ হেঁটে একদম তমার সামনে চলে আসে। তমার বুকটা ধ্বক করে উঠল, কানগুলো যেন লাল হয়ে গেল। তমা একবার তাকিয়েই লজ্জায় চোখ নামিয়ে ফেলল। আসিফ পিছনে বাঁধা দুই হাত সামনে এনে বলল, 'তমা, ভ্যালেন্টাইনস ডের শুভেচ্ছা নাও। এই কার্ড আর ফুল গুলো রাখো।'

তমার হাতে নীল খামে মোড়ানো কার্ড আর পাঁচটা লাল গোলাপ ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত চলে গেল। তমা শিহরিত হলো। নীল খামটা খুলে চিঠিটা পড়তে লাগল,

তমা, আমার প্রিয়তমা,

তোমাকে যেদিন চৈতালি বাসে প্রথম দেখেছিলাম, সেদিন ছিল চৈত্রমাস। তোমার মায়াবী চোখ দেখেই আমি তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। সেদিন আমি সেই কবিতাটিই বারবার আবৃত্তি করেছিলাম, 'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।' এরপর থেকে প্রতিদিন তোমাকে খুঁজতাম। যেদিন তুমি বাস মিস করতে, আমার ভিতরটা হাহাকারে ভরে থাকত। সারাটা দিন আমার খারাপ কাটত।

তুমি আমার মন ভালো করা পাখি, আমার অনুপ্রেরণার ঝরনা ধারা। যে মুখটা দেখলেই আমার সারাটা দিন ভালো কাটে সেই মানুষটাকে সারা জীবন নিজের করে নিতে ইচ্ছে করছে।

তুমি ছাড়া আমার জীবনটা বড্ড অর্থহীন মনে হয়। আজ ভ্যালেন্টাইনস ডে। এই শুভ দিনে আমি আমার ভ্যালেন্টাইনকে আমার করে নিতে চাচ্ছি। প্লীজ আমাকে ফিরিয়ে দিও না, প্লিজ...

ইতি
তোমার প্রতীক্ষায় একজন
চাতক পাখি

তমা চিঠিটা উল্টে দেখে সেখানে ছোট্ট করে লেখা 'যদি রাজি থাকো, তাহলে চৈতালি বাসে আজ তুমি বাড়ি ফিরবে না, বিকেলে আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো। আমি বাসের উলটা রাস্তাটায় তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

তমা ঠোঁট কামড়ালো। সে কী করবে, ভাবতে পারছে না। আসিফ হ্যান্ডসাম, সুন্দর আর ব্রিলিয়্যান্ট স্টুডেন্ট। সে হ্যাঁ বলবে, নাকি না বলবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে লাগল। তমা চৈতালি বাসের দিকে এগুলো। চিঠি আর গোলাপগুলো ব্যাগের ভিতর ঝটফট লুকিয়ে ফেলে বাসে উঠে পড়ল। দোতলা বাস, নিচে মেয়েরা আর উপরে ছেলেরা বসে। তমার বান্ধবী রুনা তার জন্য একটা সিট আগেই রেখে দিয়েছে। তমা দ্রুত যেয়ে তার পাশে বসে বলল, 'দোস্ত, একটা ঘটনা ঘটে গেছে। কী যে করি, একটু পরামর্শ দে না রে।'

রুনা তমার ভিতরের ছটফটানিটা টের পেল। আজকে ভ্যালেন্টাইনস ডে, অনেকেই সিঙ্গেল থেকে ডাবল হবার চেষ্টা করছে। রুনা হেসে বলল, 'কী হয়েছে রে? কোনো প্রপোজাল পেলি নাকি?'

তমা ফিসফিস করে বলল, 'হুম, ঐ রকমই। তুই কিভাবে বুঝলি?'

রুনা বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, 'বুঝি, বুঝি, তোর যে এমন কিছু হয়েছে, আমি তোর লাজ রাঙা মুখ দেখেই বুঝে নিয়েছি। তো শুনি সেই ভাগ্যবান প্রেমিক পুরুষটা কে?'

তমা লজ্জায় লাল হয়ে বলল, 'ঐ যে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সের বড় ভাইয়াটা, আসিফ ভাইয়া, চিনতে পারছিস

না? চৈতালি বাসে, যে আমার সাথে ওঠে আর নামে।'

রুনা চেনার সুরে বলল, 'ও সেই আসিফ ভাইয়া, অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের মেয়েদের ক্রাশ, সেই হ্যান্ডসাম ভাইয়াটা? সে তো শুনেছি খুব ভালো আবৃত্তি করে। আবার মাঝে মাঝে নাটকও করে, কী যেন একটা মঞ্চ নাটকে প্রধান চরিত্রে ছিলেন। যেমন সুন্দর কণ্ঠ, তেমন সুন্দর চেহারা। বাহ! তোর কী ভাগ্য রে! এত মেয়ে থাকতে, সে তোকে পছন্দ করল।'

তমা ব্যাগ থেকে নীল খামে মোড়ানো চিঠিটা বের করে হাত ঘড়িটার দিকে তাকাল। একটা বাজতে আর আট মিনিট বাকি আছে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাসের মামা এসে চালকের আসনে বসে পড়েছে। তমা রুনাকে চিঠিটা পড়তে দিল। রুনা চিঠি পড়ে চোখ কপালে তুলে দুষ্ট হাসি দিয়ে বলল, 'আহ! কী রোমান্টিকতা। তোর কী কপাল রে। আমাকে যদি এমন করে কেউ লিখত!'

তমা আবদারের সুরে বলল, 'এখন কী করব, বল? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, বাস থেকে নেমে যাব?'

রুনা হেসে বলল, 'আহ, ন্যাকা। বাস থেকে নেমে যাবি না তো কী করবি? যা, এখনো বসে আছিস কেন? মামা তো বাস ছেড়ে দেবে। দিল ওয়ালে দুলহানে লে জায়েঙ্গে সিনেমার শেষ অংশ শুটিং হবে। কী মজাই না লাগছে, নতুন শাহরুখ আর কাজল জুটির মিলন দেখব। যা বেটি যা, তোর দুলহানের কাছে যা।'

রুনার কথায় তমার মনে সাহসের সঞ্চার হলো, তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর ইতস্তত ভাবটা মুহূর্তেই উবে গেল। সে নির্ভার হয়ে ফুরফুরে মেজাজে বাস থেকে নেমে পড়ল। তার মাথায় 'কাছে এসো' গানের লিরিক্স বাজছে। সেই ভ্যালেন্টাইনস ডে টা তমা আর আসিফের তুমুল কেটেছিল। প্রথম প্রেম, প্রথম ভালোবাসায় সে সিক্ত হয়েছিল।

তারপর বহু ভ্যালেন্টাইনস ডে পার হয়। একটু একটু করে তমা আসিফের কাছে আসে। মানসিক প্রেমটা শারীরিক প্রেমে রূপান্তরিত হয়। প্রথমে চোখে চোখে তাকিয়ে থাকা, তারপর হাত ধরা ধরি, হাগ, কিস দিয়ে

শুরু হয় । এক ভ্যালেন্টাইনস ডে তে আসিফ প্রায় জোর করেই তমাকে লিটনের ফ্ল্যাটে একান্ত সময় কাটাতে বাধ্য করে । এরপর থেকে তমা অনুশোচনায় ভুগতে থাকে । আসিফকে বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকে । দুই পরিবারের সম্মতিতেই বিয়েটা হয় ।

বিয়ের এক বছরের মাথায় তমা বুঝেছিল যে আসিফের রোমান্স ফুরিয়ে গেছে । ভালোবাসার কাব্য আর তার সামনে সে কোপচায় না । দায়িত্বজ্ঞানহীন এক আড্ডাবাজ পুরুষ, মেয়ে পটাতে ওস্তাদ একজন ভালোমানুষের রূপধারী জঘন্য নোংরা কীট সে । সংসারের ব্যয়ভার, বাজার সবই তমার ঘাড়ে এসে চাপে । অসুস্থ অবস্থাতেও কখনো আসিফকে সে কাছে পায় না । তমা আসিফের সম্পর্কে যোজন যোজন দূরত্ব তৈরি হয় ।

তাদের প্রেমের সূচনা হয়েছিল এক ভ্যালেন্টাইনস ডে তে, তার তিন বছর পর আরেক ভ্যালেনটাইনস ডে তে তাদের বিয়ে হয়েছিল । এরপর কেটে গেছে আরো তিনটা ভালোবাসা দিবস । আগামীকাল আরেকটা ভ্যালেন্টাইনস ডে আসছে । সেই উপলক্ষে টিভি চ্যানেলগুলো বিভিন্ন নাটক আর বিজ্ঞাপন তৈরি করেছে । সেগুলোর অ্যাডভারটাইজ বারবার দেখাচ্ছে । তমা রিমোট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিশেষ দিনের আকর্ষণীয় কোন প্রোগ্রামগুলো দেখবে তাই ভাবছে । সফল জুটি নামে একটা প্রোগ্রাম হবে যেখানে সিনেমা আর নাটকের স্বামী-স্ত্রীদের জুটি আসবে, বিভিন্ন প্রশ্ন করবে আর তারা তাদের ভালোবাসার গল্প শুনাবে । এ অনুষ্ঠানটা গতবছর যে জুটি উপস্থাপন করেছিল, তাদের এ বছর ডিভোর্স হয়ে গেছে । তাই এবার নতুন এক জুটি উপস্থাপন করবে । তমার এই প্রোগ্রামটা খুব ভালো লাগে । ভালোবাসার গল্প শুনতে আর দেখতে তার খুব আনন্দ হয় । এমন সময় আসিফ একটা প্যাকেট নিয়ে ঘরে ফিরল । তমা টিভিটা বন্ধ করে খুশি খুশি মনে এগিয়ে গেল । তার ভালোবাসার মানুষটা নিশ্চয় তার জন্য কোনো গিফট এনেছে । সেও আসিফের জন্য একটা গিফট কিনে রেখে দিয়েছে । তমা প্যাকেট খুলে হতাশ হলো । একটা লাল পাঞ্জাবি উঁকি দিচ্ছে । কেউ হয়ত আসিফকে গিফট করেছে ।

রাত দশটায় আসিফ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেল । রাত বারোটা বাজতেই আসিফের সাইলেন্ট করা

মোবাইলটাতে আলো জ্বলে উঠল। তমা মোবাইলটা কৌতূহলবশত হাতে নিল। অনেকগুলো মেসেজ এসেছে। সে গোপনে পড়তে থাকে। অধিকাংশই সুহানার মেসেজ। সুহানা আর আসিফ রঙ নাট্যদলের সক্রিয় কর্মী। পড়তে পড়তে তমার কান-মাথা গরম হয়ে গেল। লাল পাঞ্জাবিটা সুহানা আসিফকে গিফট করেছে। ভ্যালেন্টাইনস ডে তে তারা এক সাথে টিএসসি তে ঘুরবে।

তমা রাগে আসিফকে ঠেলা মেরে উঠাল। আসিফ বিরক্ত হয়ে বলল, 'ঘুম ভাঙালে কেন? আগামীকাল অনেক কাজ, ঘুমাতে দাও তো।'

তমা অগ্নিমূর্তি ধারণ করে বলল, 'অনেক কাজ, না, অনেক কাজ? সুহানার সাথে লাল পাঞ্জাবি পরে ঘুরবা, লটর পটর করবা, কাজ তো থাকবেই। মহা ব্যস্ত মানুষ আপনি। বাজার করার সময় নাই, বউকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় নাই, পরকীয়া করার সময় আছে। তাই না?'

আসিফ তেড়ে এসে বলল, 'কী সব বাজে বকছ? সুহানা আমার জাস্ট ফ্রেন্ড। আমরা একসাথে মঞ্চ নাটক করি। সেই সুবাদে এক সাথে ঘুরতেই পারি। দোষের কী আছে তাতে?'

তমা মোবাইলের মেসেজ গুলো দেখিয়ে চিৎকার করে বলল, 'লুচ্চা কোথাকার, মিথ্যুক কোথাকার! ধোঁকাবাজ, আমার কাছে সাধু সেজে থাকিস!'

আসিফ এবার তার আসল কদর্য রূপটা বের করল। নোংরা খিস্তি খেউর আওড়াতে আওড়াতে আসিফ বলল, ' তুই তো নিজেই একটা খারাপ পাড়ার মেয়ে, বিয়ের আগে ভ্যালেন্টাইন ডে তে তুই লিটনের ফ্লাটে গিয়েছিলি না? এখন আমার সামনে ভালোত্ব দেখাস? ভালো ঘরের মেয়েরা কখনো এসব করে না বুঝলি, তুই খারাপ পাড়ার মেয়ে আর তোর বাপ একটা তার দালাল।'

তমা রাগে ঘৃণায় থরথর করে কেঁপে উঠল। সে পাল্টা জবাব দিল, 'আমি যদি খারাপ হই, তাহলে তো তুইও খারাপ, আমি তো তোর সাথেই গিয়েছিলাম।'

আসিফ তাচ্ছিল্যের সুরে হা হা করে হেসে বলল, ' পুরুষ আবার খারাপ হয় নাকি? পুরুষের গায়ে কখনো

নোংরা লাগে? পুরুষ যার সাথে চায় তার সাথেই মিলতে পারে, এতে দোষের কী আছে? এত ঘ্যানর ঘ্যানর না করে আমাকে ঘুমাতে দাও তো?'

তমা সারারাত গুমরে গুমরে কাঁদল আর আসিফ ড্যাম কেয়ার ভঙ্গিতে মাথার উপর বালিশ চেপে ঘুমালো। পরেরদিন সকালে লাল পাঞ্জাবি পরে সেজেগুজে আসিফ ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তমা বিছানায় বসে একা একা শূন্য দৃষ্টি তে আসিফের চলে যাওয়া দেখল। পাশের ফ্ল্যাট থেকে গানের সুর ভেসে আসছে 'সখি, ভালোবাসা কারে কয়?' তমার পছন্দের একটা গান। কিন্তু আজ তমার কাছে তা অসহ্য ঠেকছে। সে দুই কান আঙ্গুল দিয়ে চাপা দিল আর বিড়বিড় করে বলল, 'ভালোবাসা বলে কিছুই নাই, সব মোহ, সব ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই না! সখি, এই দুই দিনের মোহ আর শরীরের টানকেই ভালোবাসা কয়।'

টিকাঃ ভালোবাসা দিবসের নামে আমাদের সমাজে অশ্লীলতা ছড়ানো হচ্ছে যার পরিণতি ভয়াবহ। মিডিয়ার চমৎকার উপস্থাপনের মাধ্যমে এইসব নোংরা অবৈধ প্রেমকে সহজ ও সাবলীল ভাবে দেখানো হচ্ছে। 'কাছে এসো' 'ভালোবাসার টানে, কাছে আসে' নামের অ্যাডভারটাইজের লিরিক্স, প্রেম জাগানিয়া নাটক, কাছে আসার দুঃসাহসিক গল্পের নাটক এগুলো সবই শয়তানের ধোঁকা। অশ্লীলতা ছড়ানোর বিষমাত্র। এইসব নাটক সিনেমার হাগ, কিস, বাহিরে ঘোরাঘুরি, লিভ টুগেদার, একসাথে ক্যান্ডল লাইট ডিনার, এগুলো তো শয়তানের প্ররোচনা মাত্র। শারীরিক কামনা মেটানোর মাধ্যম মাত্র যা ব্যভিচারের বিভিন্ন রূপ।

এর শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, 'বনি আদমের উপর ব্যভিচারের অংশ লিখিত রয়েছে, তা অবশ্যই সে পাবে । দুই চোখের ব্যভিচার হলো দৃষ্টিপাত করা । দুই কানের ব্যভিচার হলো শ্রবণ করা। জিহবার ব্যভিচার হলো বলাবলি করা। হাতের ব্যভিচার হলো ধরা বা স্পর্শ করা । পায়ের ব্যভিচার হলো হেঁটে যাওয়া । অন্তরের ব্যভিচার হলো কামনা ও বাসনা করা। আর গুপ্তাঙ্গ তা বাস্তবায়িত করে।(মুসলিম

অনুবাদঃ হাদিস:৬৫১৫)

অশ্লীলতা প্রসারকারীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালা বলেন, ‘যারা চায় মু’মিনদের সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।’ (সূরা আন নূর: ১৯)

ভালোবাসা সঞ্চয়

স্বামী মারা যাবার পর মেয়ে আয়েশাকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে উঠেছিল রেহানা। রেহানার স্বামী সোবহান সাহেব ঢাকায় একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে উচ্চপদে চাকরি করতেন। হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে তিনি মারা যান। তিনি যা আয় করতেন তাতে সংসারটা বেশ ভালোই চলত। কিন্তু তার সঞ্চয় বলে কিছুই ছিল না। তিনি সব সঞ্চিত টাকা মফস্বলের পৈতৃক বাড়িটার পাঁচ তলা করার সময় দিয়ে দিয়েছিলেন। তারা চার ভাই। তিন তলার পুরাটাই মুখে মুখে সোবহান সাহেবের নামে ছিল। কিন্তু উনি মারা যাবার পর রেহানা জানতে পারে যে আসলে বাড়ির জায়গাটা তার শাশুড়ি আকলিমা বেগমের নামে। তাই সে হিসেবে জায়গা যার বাড়িও তার অর্থাৎ বাড়িটা আসলে শাশুড়ির। বিয়ের পর শাশুড়ির সাথে একবার রেহানার বড় রকমের মনোমালিন্য হয়েছিল। ভিতরে ভিতরে শাশুড়ির রেহানার উপর খুব রাগ ছিল। তিনি খুব প্রতিশোধপরায়ণ মহিলা। সেই শোধটাই যেন তিনি নিয়েছিলেন। মারা যাওয়ার চল্লিশ দিন পর রেহানার বাবার বাড়ি থেকে বড় ভাই সাদিক আসল। বোনকে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইল যাতে মনটা একটু ভালো হয়। শাশুড়ি সাদিককে দশপদ দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। তারপর গদগদ গলায় বললেন, ‘সাদিক, একটা কথা বলি বাবা, একটু

মনোযোগ দিয়ে শোন। আমি যে কথাটা বলব, তোমার কিন্তু সেটা রাখতেই হবে।'

সাদিক কৌতূহলী স্বরে বলল, 'জ্বী, বলেন।'

আকলিমা বেগম গা দুলে হাত নেড়ে বললেন, 'আমাদের তো বয়স হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ। আমার শরীরটা আর চলে না। তোমার তাওয়াই সাহেবও তো খুব অসুস্থ, সেটা তো জানোই। আমি বলি কী, তোমার বোনকে তোমাদের বাড়িতেই রাখো। মায়ের বাড়ি, ওখানেই ওরা বেশ ভালোই থাকবে, আশা করি। আবার তোমাদের বাড়িটা তো একেবারে শহরের ভিতর। ওখান থেকে আয়েশার নতুন স্কুলও কাছে হবে। বাচ্চার অসুখ-বিসুখ হলে দ্রুত ডাক্তারের কাছেও নিতে পারবে। আমরা তো অসুস্থ, আমরা কী আর অত কিছু করতে পারব? আমার ছেলেটা হঠাৎ মারা গেল।'

আকলিমা বেগম আঁচল চেপে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সাদিক কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

সে ইতস্তত করে খুব সাবধানে মুখ খুলল, 'জ্বি, ঠিক আছে। রেহানা দুই বাড়িতেই থাকবে না হয়, যখন যেখানে ভালো লাগে থাকুক। সমস্যা তো নাই। আয়েশার দাদা বাড়িতেও যেমন থাকার অধিকার আছে তেমনি নানা বাড়িতেও অধিকার রয়েছে।'

আকলিমা বেগম কান্না থামিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তাতো অবশ্যই। আয়েশা এখানে অবশ্যই বেড়াতে আসবে। আর আয়েশার পড়ার খরচটা আমরা দেবো। প্রতি মাসে ওর খাওয়া-পড়া বাবদ পাঁচ হাজার করে টাকা পাঠাব, বুঝলে। হাজারো হোক, আমাদেরই তো নাতনি। ফেলে তো আর দিতে পারি না।'

সাদিক মহা ধুরন্ধর। বোন রেহানা আর ভাগ্নি আয়েশা যে তার ঘাড়ে এসে পড়তে যাচ্ছে, সে সেটা বুঝে গেছে। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মাই বোঝার মতো হয়ে আছে। তার মধ্যে মরার উপর খাড়ার ঘায়ের মতো আরো দুইজন এসে জুটেছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তার মাথা মাঝে মাঝে কাজ করে না। একটু সময় নিয়ে বুদ্ধি বের করতে হবে। আপাতত কেটে পড়াই উত্তম। পরে ভেবে চিন্তে বুদ্ধি বের করতে হবে।

সাদিক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খুব তাড়া দেখিয়ে বলল, 'ওহ হো খালাম্মা, আমার বাচ্চাকে তো স্কুল থেকে

আনতে হবে, আমি একদমই ভুলে গেছি। আমি আজ যাই। পরে এসে না হয় ওদের নিয়ে যাব। বাচ্চাটা আবার আমাকে না দেখলে কান্না কাটি করবে।'

সাদিক আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। আকলিমা বেগম মিটমিট করে হাসলেন। তুমি যতটুকু ঘাঘু, আমি তার চেয়েও বেশি ঘাঘু! আমাকে তো চেনো নাই। এ পর্যন্ত জীবনে যা চেয়েছি, তাই করে ছেড়েছি। আমার ছেলেই বেঁচে নাই, আর তার বউকে কী জন্য পালব! মেয়ে বাচ্চা আয়েশা তো এমনিতেই পরের ঘরে চলে যাবে, শুধু শুধু মায়া দেখিয়ে লাভ কী!

আকলিমা বেগম ফোনটা হাতে নিয়ে স্বামীর নম্বরে ডায়াল করল। দুইবার রিং হতেই ফোনটা ধরল। তিনি আহ্লাদি সুরে বললেন, 'ওগো শুনছ, বউমার ভাই সাদিক এসেছিল। তার কী যেন তাড়া ছিল, তাই চলে গেল। বউমাকে তো নিয়ে যেতে পারল না, তুমি একটা অটো নিয়েই বাসায় আসো। বৌমাকে আর আয়েশাকে একটু রেখে আসো। ওরা রেডি হয়েই আছে। তাড়াতাড়ি আসো।'

এরপর শ্বশুর সেই যে অটোতে করে রেহানাকে বাবার বাড়িতে রেখে আসল, আর খোঁজ নিল না। প্রতি মাসে অবশ্য শ্বশুর এসে পাঁচ হাজার টাকা রেহানার হাতে জোর করে গুঁজে দিয়ে যেত। টাকাটা নিতে রেহানার আত্মসম্মানে বাঁধত। আয়েশা দাদার সাথে যেতে চাইলে, আরেক দিন বলে আদর করে রেখে চলে যেত। এভাবেই দিনগুলো কাটছিল।

সাদিকের স্ত্রী সুষমা মহা আলসে। সে দুর্দিনে ফ্রীতে একজন কাজের লোক পেয়ে অবশ্য খুশিই হয়েছিল। রেহানা সারাদিন কাজ করত আর মন খারাপ করে থাকত। মাঝে মাঝে বাথরুমে কল ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে কাঁদত। তার না আছে ভালো ডিগ্রী আর না আছে কোনো সঞ্চিত সম্পদ।

তার মেয়েটার সাথেও কাজের লোকের মতো সবাই আচরণ করা শুরু করল। মেয়েটাকে সন্ধ্যে বেলায় যখন সে পড়তে বসিয়ে রান্না চাপাত, তখন তার ভাবি আয়েশা কে পড়া থেকে উঠিয়ে নিয়ে ঘর গুছানোর কাজে লাগিয়ে দিত। ক্রমশ রেহানার জীবনটা বাবার বাড়িতে অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

সে এখান থেকে মুক্তি খুঁজছিল। তাই প্রায়ই সে গভীর রাতে নামাজে দাঁড়িয়ে কাঁদত আর আল্লাহ্‌র কাছে

সাহায্য চাইত। একদিন তার মোবাইলে একটা কল আসল। সোবহান সাহেবের অফিস থেকে ফোনটা এসেছে। অফিস থেকে সোবহান সাহেবের কন্যার জন্য এককালীন পাঁচ লাখ টাকার অনুদান দেওয়া হবে। তারা রেহানাকে অফিসে এসে যোগাযোগ করতে বলল। রেহানা ঢাকায় যেয়ে চেকটা নিল। তারপর টাকাটা দিয়ে একটা ছোট বিজনেস দাঁড় করালো। আস্তে আস্তে সেটা বড় হলো। একসময় প্রচুর লাভ আসা শুরু করল। রেহানা বাবার বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকার সিদ্ধান্ত নিল।

রেহানার বাবারও প্রচুর অর্থ ছিল। কিন্তু তার অর্জিত সব সম্পদ তার বড় ছেলে সাদিকের সাথে মিশিয়ে ফেলেছিলেন। তিনতলা বাড়িটা বড় ভাইয়ের নামে বরাদ্দ। সেখানে থাকতে হলে তাকে ভাবির কাজের লোক হিসেবে থাকতে হতো। বাবার বাড়ি বলে কোনো বাড়ি আদৌ রেহানার ছিল না যেখানে সে অন্তত অধিকার নিয়ে থাকতে পারত। তাই সে বাবার বাড়ি থেকে বের হয়ে কাছেই একটা ভাড়া বাসায় থাকা শুরু করল। সারাদিন পরিশ্রম করত আর রাতে মেয়ে কে জড়িয়ে ধরে শান্তিতে ঘুমাত।

পাঁচ বছর পর, রেহানা অনলাইনে তার বুটিক শপের জামা-কাপড় বিক্রি শুরু করল। ন্যায্য দাম আর ভালো কোয়ালিটির কারণে বেশ ভালোই বিক্রি হওয়া শুরু করল। লাভও আসতে শুরু করল। বেশ ভালোই কাটছিল মা-মেয়ের জীবন। কিন্তু কিছুদিন পর রেহানার ব্রেস্ট টিউমার ধরা পরে যা পরবর্তীতে ক্যান্সারে রূপ নেয়। আয়েশার বয়স তখন পনের, কিশোরী রূপসী কন্যা। সবাই মেয়েকে দ্রুত বিয়ে দেবার পরামর্শ দিল।

এক রাতে কন্যাকে কাছে ডেকে বলল, ‘মা, আমি যখন মরে যাব, তুই খুব কষ্ট পাবি না?’

আয়েশা মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘এসব কী বলো, মা! তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে কেন? আল্লাহ্ কখনই এমন করবেন না।’

রেহানা মৃদু হেসে বলে, ‘আমার তো অনেক সম্পদ আর তুই আমার উত্তরাধিকারী। আমার অনুপস্থিতিতে কখনো অসহায় বোধ করবি না তো?’

আয়েশা কেঁদে ফেলল। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, ‘মা, আমি কোনো সম্পদ চাই না আমি কিচ্ছু চাই না। আমি শুধু তোমাকে চাই। তুমি সারাজীবন আমার পাশে থাকো, মা। তোমার ভালোবাসা ছাড়া আমি কিভাবে

বাঁচব মা? তুমি আর এরকম কথা বলো না, মা! প্লীজ প্লীজ ,মা! আমি সহ্য করতে পারি না।'

মেয়ের কথা শুনে রেহানা কান্না চেপে রাখতে পারল না। মেয়েটা বড্ড ভালোবাসার কাঙাল। মেয়েটা ছোট বেলায় তাকে ভুল বুঝত। ভাবত মা ইচ্ছে করেই তাকে দাদা বাড়ি আর নানা বাড়ির মানুষদের ভালোবাসা থেকে তাকে দূরে রেখেছে। মাঝে মাঝে জেদ করে সে দাদা বাড়িতে যেত। যখন সে একটু বড় হলো, তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পেরেছিল, আসলে তার মাকে সবাই বঞ্চিত করেছিল। তারপর নিজে থেকেই সে আর কোথাও যেতে চাইত না। তার চাচারা আর বড় মামা দুই ঈদে দামি জামা গিফট করত। আয়েশা অভিমানে সেগুলো ছুঁয়েও দেখত না। কাজিনদের সাথেও সে তেমন মিশত না। তার জগৎটা শুধু মায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই মা যখন জীবন থেকে হারিয়ে যাবে, তখন তার মেয়েটার কী হবে ভাবতেই রেহানার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে গেল।

চোখের পানি মুছে, রেহানা মেয়েকে আশ্বাস দেবার গলায় বলল, 'মা রে, আমি কিন্তু তোর জন্য শুধু সম্পদ সঞ্চয় করি নি, ভালোবাসাও সঞ্চয় করে রেখে যাচ্ছি।'

আয়েশা চমকে উঠে বলল, 'কিভাবে মা, ভালোবাসা সঞ্চয় করা যায় নাকি?'

রেহানা মেয়ের কথায় হেসে বললেন, 'যায় রে মা, যায়। তোকে আমি এই কথাটা আগে কখনো বলি নি। তবে আজকে বলব যাতে তুই কখনো নিরাশ না হয়ে পড়িস। আমি কিছু এতিম বাচ্চাদের প্রতিপালন করে আসছি। এতিম, মিসকিন শিশু, এমনকি রাস্তার ধূলিমাখা নোংরা শিশুটিকেও আমি ভালোবেসে গেছি। ওদের জন্য অকাতরে দান করেছি আর ভালোবেসেছি। এভাবেই ভালোবাসা সঞ্চয় করে রেখেছি। আমি মারা গেলে, আল্লাহ্ আমার মেয়েকে এই ভালোবাসার প্রতিদান দেবেন। আমার মেয়ের মাথার উপর নিশ্চয় তিনি কোনো স্নেহময় হাতের ব্যবস্থা করে দেবেন।'

আয়েশা প্রশান্তির হাসি হেসে বলল, 'হ্যাঁ, মা। আমরা অবশ্যই এর প্রতিদান পাব। তোমার এই ভালোবাসার প্রতিদান নিশ্চয় তিনি কারো মাধ্যমে ফিরিয়ে দেবেন। আল্লাহ্‌র জন্য কাউকে ভালোবাসলে তার

প্রতিদান আমরা পাবই। এটা আল্লাহ্‌র ওয়াদা। সূরা আর-রাহমানের ষাট নং আয়াতে আছে, ‘ভালো কাজের প্রতিদান ভালো ছাড়া আর কী হতে পারে?’ যারা দুই হাত খুলে সাদকা করেন তারা অবশ্যই এর প্রতিদান ইহকাল এবং পরকালে পাবে। সূরা বাকারা ২৭৪ নং আয়াতে আছে, ‘যারা রাতে-দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের মাল-সম্পদ খরচ করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট বদলা রয়েছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।’ তাই আমাদের কোনো ভয় নাই। আমরা অবশ্যই এর প্রতিদান পাবো।

রুমা ও শ্রমিক দিবস

লাল শাড়ি কিনে এসি বুটিক শপ থেকে বের হতেই গ্রীষ্মের তাবদাহে যেন শরীরটা পুড়ে গেল রুমার। রিক্সাওয়ালারা সারি বেঁধে বিশ্রাম নিচ্ছে, নবাবজাদারা কেউ যাবেনা। একজন বুড়ামত রিক্সাওয়ালা এগিয়ে এল। রুমা চেঁচিয়ে বলল, 'এই চাচা, যাবেন মিরপুর জনতা হাউজিং এ?'

রিক্সাওয়ালা চাচা গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'হ, যামু। তয় ত্রিশটা ট্যাকা দেওন লাগবে।'

রুমা চোখ কপালে তুলে বলল, 'বিশ টাকার জায়গায় ত্রিশ টাকা চাইলেন কেন? মিরপুর দুই নম্বর থেকে জনতা হাউজিং, এতটুকু রাস্তা তো পনেরো না হয় বড় জোর বিশ টাকা ভাড়া হয়।'

রিক্সাওয়ালা চাচা হেসে বললেন, 'আম্মা, অনেক গরম তো তাই দশটা ট্যাকা বেশি চায়া নিলাম। গরমে রিক্সা টানতে ম্যালা কষ্ট!'

রুমা রিক্সায় বসতে বসতে বিরক্ত হয়ে বলল, 'এত লোভী ক্যান্ চাচা আপনারা? একটু গরম পড়তেই দশ টাকা বাড়িয়ে দিলেন?'

রিক্সাওয়ালা বুড়া চাচার পাঞ্জাবিটা ঘামে ভেজা। টানতে খুব কষ্ট হচ্ছে, এমনিতেই বয়সের ভারে ন্যুজ

তার উপর গ্রীষ্মের দাবদাহ । মেয়ের বয়সী প্যাসেঞ্জারের মুখে ‘লোভী’ শব্দটা যেন বুকে এসে তীরের মতো বিঁধলো । আর কোনো জবাব না দিয়ে কষ্ট নিয়ে নীরবে রিক্সার প্যাডেল ঘুরাতে লাগল ।

বিশ মিনিটের পথ ত্রিশ মিনিট লাগল । রুমা রিক্সাওয়ালার উপর চরম বিরক্ত । কেন যে এরকম বয়স্ক মানুসষ রিক্সা চালায়, কে জানে! বিরক্তি নিয়েই ঘরে ঢুকল । পাঁচ বছরের ছোট ছেলেটা কাঁদছে । কাজের ছেলে লালুর সাথে খেলতে যেয়ে ব্যথা পেয়েছে । কপালটা আলু হয়ে গেছে । দেখেই রুমার মেজাজটা চড়ে গেল । কিভাবে হলো, কেন হলো কিছু না শুনেই দৌড়ে গিয়ে লালুর ময়লা চিটচিটে চুলের মুঠি ধরে দেয়ালের সাথে দুইটা বাড়ি দিল । রুমা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ‘দেখে খেলতে পারিস না! বাচ্চাটা আমার ব্যথা পেল । এখন দেখ, কেমন কষ্ট হয় ।’

লালুর মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে রুমার কাছ থেকে লালুকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ‘আফা, আমার পোলায় তো ইচ্ছা কইরা বাবুকে ফ্যালায় নাই, বিশ্বাস করেন ।’

রুমা ক্লান্ত হয়ে সোফায় বসে পড়ল । তারপর হাত নেড়ে বলল, ‘এত কথা বলো না তো লালুর মা । বাহির থেকে এসেছি । এক গ্লাস ঠান্ডা পানির লেবুর শরবত বানিয়ে দাও ।’

একটু পর লেবুর শরবত নিয়ে লালু ড্রয়িং রুমে ঢুকল । ছেলেটা ভালোই মার খেয়েছে । কাঁদতে কাঁদতে চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে । উচিৎ শাস্তি পেয়েছে, মনে মনে খুশি হলো রুমা । লেবুর শরবতটা এক চুমুক মুখে দিতেই লেবুর টক স্বাদটা জিহবায় এসে লাগল । চিনি কম দিয়েছে । ডাইনিং টেবিলে চিনির কৌটাটি নাই ।

‘উহ্, চিনি কম দিয়েছ কেন?’ বলতে বলতে শরবতের গ্লাসটা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতেই রুমার চক্ষু চরকগাছ হয়ে গেল । লালুর মা শরবত খাচ্ছে । রুমা রাগে ফেটে পড়ল । কড়া গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, ‘ভালোই তো চোরামী শিখেছ লালুর মা! আর কী কী দুইজনে চুরি করে খাও, শুনি?’

লালুর মা থতমত খেয়ে বলল, ‘আফা, রান্নাঘরের আগুনে কষ্ট হচ্চিল, প্রতিদিন এই আগুনের পাশে দাঁড়ায় দশ পদ রাঁন্ধি । ঘরডা জাহান্নামের আগুন হইয়া যায় । খুব তেষ্টা পাইছিল, তাই এট্টু খাইলাম । আমারে চুর বইলেন না আফা । আল্লাহর দোহাই লাগে ।’

রুমা রাগে গজরাতে থাকে। এই কাজের লোককে আর রাখা যাবে না। নতুন লোক খোঁজ করতে হবে।

পরেরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে রুমা লাল শাড়ির প্যাকেটটা বের করে। খুব যত্ন নিয়ে লাল শাড়িটা ঝটপট পরে নেয়। গত রাতেই স্ক্রিপটা রেডি করে রেখেছে। কাগজটা ব্যাগে ঢুকাল। আজ পহেলা মে, বিশ্ব শ্রমিক দিবস । শ্রমিকের রক্তের লাল প্রতীকের সাথে মিলিয়ে রুমা লাল শাড়ি আর লাল কাঁচের চুড়ি পরে। সে আজ শ্রমিক দিবস উপলক্ষে একটা সমাবেশের প্রধান বক্তা। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সে একজন বলিষ্ঠ অধিকার কর্মী।

টিকাঃ আমরা মুখে মুখেই শুধু শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কথা বলি কিন্তু বাস্তব জীবনে ঠিক তার উল্টোটাই করে থাকি। মানসিক শ্রমে অভ্যস্ত সভ্য আপার লেভেলের মানুষেরা কখনোই কায়িক শ্রমের কষ্ট বুঝতে পারে না। কালি মাখা হাত, ঘামে ভেজা শরীর, ফেটে যাওয়া ধূলায় ধূসরিত পা যুগলের মেহনতি মানুষগুলোর কষ্ট কখনোই তারা অনুভব করতে পারে না।

আমাদের রাসূল মুহাম্মদ(সা:) তাঁর খাদেম আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) এর মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে কিভাবে একজন খাদেমের সাথে আচরণ করতে হয়। হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, “আমি একাধারে তাঁর গৃহে দশ বছর কাজ করেছি। দীর্ঘ এই ১০ বছর সময়ের মধ্যে তিনি কখনো আমাকে বলেন নাই, কেন এটা তুমি করলে অথবা কেন এটা কর নাই।”(মুসলিম, ২৩১০)

গৃহকর্মী, পিয়ন, শ্রমিক, রিকশাওয়ালা বা যে কোনো অধনস্ত লোক আমাদের ভাই। তাদের সাথে ভাইয়ের মতো আচরণ করতে বলা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের অধীন ব্যক্তিরা তোমাদের ভাই।

আল্লাহ তায়ালা যে ভাইকে তোমার অধীন করে দিয়েছেন তাকে তা-ই খেতে দাও, যা তুমি নিজে খাও, তাকে তা-ই পরিধান করতে দাও, যা তুমি নিজে পরিধান কর ।' (বুখারী, আবু হুরায়রা রাঃ)

হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'ক্ষমতার বলে অধীন চাকর-চাকরানী বা দাস-দাসীর প্রতি মন্দ আচরণকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না ।' (ইবনে মাজাহ)

তিনি আরো বলেন, 'কেউ তার অধীন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে এক দোররা মারলেও কেয়ামতের দিন তার থেকে এর বদলা নেয়া হবে ।'

ইসলাম শ্রমিকদের অধীকারের প্রতি সম্মান প্রর্দশন করে । শ্রমিককে কষ্ট দেয়া জাহেলিয়াতের যুগের মানসিকতা মনে করে । এ ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবি করিম (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন আমার দাস, আমার দাসী, না বলে । কেননা আমরা সবাই আল্লাহর দাস-দাসী ।'

ওমর ইবনে হুরাইস (রাঃ) হতে বর্ণিত নবি করিম (সা.) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের থেকে যতটা হালকা কাজ নিবে তোমাদের আমলনামায় ততটা পুরস্কার ও নেকী লেখা হবে ।

কাজ শেষ হবার সাথে সাথেই পাওনা পরিশোধ করতে বলা হয়েছে । এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, 'ঘাম শুকানোর পূর্বেই শ্রমিকের পাওনা মিটিয়ে দাও ।'(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২৪৪৩)

যৌতুকের কৌতুক

'টাংগাইলে শফিক নামের এক ব্যক্তি যৌতুকের জন্য বউকে পিটিয়ে জখম করেছেন। তিন মাসের শিশু কন্যাকে নিয়ে তার স্ত্রী এখন হাসপাতালে। শফিক পলাতক।'

শিমুল টিভিতে খবরটা দেখে আঁতকে উঠে। তার বাড়িও টাঙ্গাইল। যৌতুকের জন্য কিভাবে যে মানুষ বউ পিটায়, তা আল্লাহই জানেন। মানুষ যে কিভাবে হাত পেতে যৌতুক নেয়, লজ্জা শরম ভুলে আরেকজনের কাছে চায়। শিমুলের ড্রয়িং রুমে সন্ধ্যার আড্ডায় সব বন্ধু একসাথে হয়েছে ।

টিভিতে খবরটা দেখে বন্ধু সুমন খোঁচা মেরে বলল, ' শিমুল, তোর এলাকার মানুষগুলো আসলেই খাচ্চর। কিভাবে যৌতুকের জন্য বউ পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে, দেখ? এরা কি মানুষ?'

শিমুল খোঁচা খেয়ে হেসে বলল, 'আরে না, আমার এলাকার মানুষগুলো আসলে অত খারাপ না। এলাকার দোষ দিয়ে কী লাভ বল! সব এলাকাতেই এরকম কিছু যৌতুক লোভী অমানুষ থাকে, বুঝলি? তোর চিটাগাং এ তো শুনেছি আরো খারাপ ট্র্যাডিশন আছে। মেয়ের বাড়ি থেকে তারা নাকি ঘটি বাটি, ফ্রিজ, টিভি, খাট-পালং, মোটরসাইকেল থেকে শুরু করে পায়খানা শৌচ করার বদনা পর্যন্ত নেয়। রমজানে নাকি ইফতার নেয়

আর কোরবানি ঈদে নাকি বউ এর বাড়ি থেকে আস্ত গরু পর্যন্ত নেয়। কী ছ্যাঁচড়া আর নোংরা তোদের মানুষগুলো।'

সুমন হেসে উড়িয়ে দেবার মতো করে বলল, 'কী যে আবোল তাবোল বলিস না। এইটা যৌতুক নয়, বুঝলি? এটা আমাদের সামাজিক রীতি। খান্দানী বংশের মেয়েদের বিয়েতে এগুলো দিয়ে থাকে। আমরা ফকিরের মতো মেয়ে বিয়ে দেই না। এগুলো দিয়ে আমরা নিজেদের স্ট্যাটাস বুঝাই। কেউ তো জোর করে নেয় না। এগুলো যৌতুক বলে না, এগুলো হলো তোফা মানে উপহার, বুঝলি?'

এবার তমাল সুমন কে চেপে ধরে বলল, 'এই সুমন, তোর বিয়েতে তো আমি গিয়েছিলাম। শ্বশুর বাড়ি থেকে এক ট্রাক ভর্তি জিনিস এনেছিলি। যে বাইকে চড়িস সেটাও তো শ্বশুরের দেওয়া। যতই উল্টা পাল্টা বকিস, বন্ধু, নিজে তো ঠিকই যৌতুক নিয়েছিস।'

সুমন মেজাজ খারাপ করে বলল, 'আরে না, আমি শ্বশুরের কাছে চাইতে গেছি নাকি। বাসে চড়ে অফিসে যাতায়াত করতাম। তাই দেখে শ্বশুরের কষ্ট হয়েছিল, তাই গিফট দিয়েছিল আর কি! এবার তোর কথা সবাইকে বলে দেই? তুই তো এলাকার সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তির একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করেছিস। রাজ্যসহ রাজকন্যা নিয়েছিস। সম্পদের লোভেই নাকি তুই খুঁজে খুঁজে এমন মেয়ে বিয়ে করেছিস। এটা কি যৌতুক নয়? খালি আমারটাই চোখে পড়ল?'

তমাল আমতা আমতা করে বলল, 'আরে না, আমার বউকে মা পছন্দ করেছিল, আমি তো এত কিছুর খোঁজ নেই নি। আমি যৌতুক ঘৃণা করি, বুঝলি? বিয়েতে আমি কিছুই নেই নি।'

সুমন মনে মনে বলল, 'আহ! তোর আবার যৌতুক নেওয়া লাগে। কালো মোটা মেয়ে বিয়ে করেছিস তো শুধু সম্পদের লোভে। আর এখন ভালো সাজার ভড়ং ধরিস!'

শিমুল দুইজনকেই থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এই তোরা কী শুরু করলি, বল তো? শামীমা এখনি অফিস থেকে চলে আসবে। এগুলো শুনতে পেলে উল্টা-পাল্টা ভাববে। টপিক পাল্টা। আমরা কেউ যৌতুক নেই নি আর আমরা যৌতুক ঘৃণা করি। এই দেখ না, আমি আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছুই নেই নি, একটা ফার্নিচারও না

এমন কী শামীমা বাপের বাড়ি থেকে একটা সোনার গহনা পর্যন্ত পরে আসে নি। কারণ আমরা দুইজনেই যৌতুক ঘৃণা করি।'

সুমন দাঁত খিচিয়ে বলল, 'তোর আবার যৌতুক নেওয়া লাগে? বিয়ে তো করেছিস সোনার ডিম পাড়া হাঁস। প্রতিমাসে মোটা টাকা পকেটে ঢুকাস, তা আবার বিয়ের সময় কিছু নেওয়া লাগে নাকি? চাকরিজীবী বউ, আর কী চাই?'

শিমুল পুরাই হকচকিয়ে গেল। আর কোনো উত্তর দিতে পারল না। এসব দেখে কানন হেসে ফেলল। এতক্ষণ সে বসে বসে সব চুপ করে শুনছিল।

সে মনে মনে বলল, 'তোরা সবাই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। এবার তোদের মুখোশটা তো খুলে গেল! শিমুল তো বিয়ের সময় যৌতুক নেয় নি, কিন্তু সোনার ডিম পাড়া চাকুরীজীবী বউ ঘরে তুলেছে আর বউয়ের মাসের বেতনটা নিজের পকেটে ঢুকাচ্ছে। আরেকজন বন্ধু তমাল তো আরো মহান! চাকরিজীবী মেয়ে বিয়ে করে নি, যৌতুকও নেয় নি, এক ধনাঢ্য বাপের এক মেয়ে খুঁজে নিয়ে বিয়ে করেছে। আরেক বন্ধু সুমন অবশ্য যৌতুক নেয় নি, তবে শ্বশুর নাকি আদর করে দেড় লাখ টাকার মোটরবাইক দিয়েছে, সেটা আবার সে গর্ব করে বলে। যে কিপটে শ্বশুর দুই টাকা ভিক্ষা দেন না, তিনি যে প্রিয় কন্যাকে কেউ যেন কথা না শুনায়, এই ভয়ে টাকা ধার করে জামাইয়ের মন ভরিয়েছে, সেটা বুঝার মতো বুদ্ধিটুকুও এই গবেটের নাই।'

কানন কোন উপায়ে যৌতুক নেবে ভাবছে। তার বিয়ের কথা বার্তা চলছে। বন্ধুদের থেকে যে কোনো একটা পথ অবলম্বন করতে হবে। না, এই টেকনিক গুলোতে ধরা পড়ে যাবে, তার চেয়ে নতুন আইডিয়া বের করতে হবে যেটাতে তাকে কেউ যৌতুক লোভী হিসেবে প্রমাণ করতে পারবে না। যৌতুক নেওয়া ছেলেগুলো বড্ড বউয়ের ভেড়া হয়, মেরুদণ্ড বলে কিছু থাকে না। বউয়ের গোলাম হয়ে থাকে আর বউয়ের বাপের বাড়ির মানুষদের পা চাটা হতে হয়।

হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তার মা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী আর মুখরা। মায়ের মাধ্যমেই যৌতুক আদায় করতে হবে। তাহলে শ্বশুরবাড়িতে আর নিজের বউয়ের কাছে সে ভালো থাকতে পারবে।

মাতৃভক্ত ছেলে হিসেবে শ্রদ্ধা পাবে। তার নিজের মাকে হয়ত তারা খারাপ ভাববে, ভাবুক তাতে কী? মা তো আর কাননের সাথে শহরে থাকবে না। এইভাবে যৌতুকও আদায় হবে আবার শ্বশুরবাড়িতে তার মান-সম্মানও থাকবে। কাননের মুখ হাসিতে ভরে গেল। তার মনে আনন্দ হলে সে গলা ছেড়ে গান গায়। এই মুহূর্তে তার যৌতুক নিয়ে কোনো গান গাইতে ইচ্ছে করছে। তার মাথায় মিনা কার্টুনের সেই গানটা বাজতে লাগল। এবার সে গলা ছেড়ে গান ধরল, 'যৌতুক বন্ধ কর, যৌতুক বন্ধ কর, যৌতুক মোরা নিমু না, যৌতুক মোরা দিমু না।'

টিকাঃ আমাদের সমাজে এখনও যৌতুকের মতো ঘৃণ্য প্রথা প্রচলিত। বিভিন্ন কৌশলে ছেলেপক্ষ মেয়ের বাবার কাছ থেকে এসব আদায় করে। 'ছেলেকে খুশি করে দেন' 'মেয়ের সুখের জন্য দেন' 'আপনাদের মেয়েকে আপনারা সাজিয়ে দেন' 'আপনার মেয়েই তো ফার্নিচার ব্যবহার করবে, ফ্রিজ, টিভি তো তারই দরকার' আরো নানা কথার কৌশলে সভ্যতার মুখোশ পরে এরা ডাকাতের মতো মেয়ের বাবার কাছ থেকে আদায় করে। অথচ এসব যৌতুকেরই বিভিন্ন রূপ। আমাদের ধর্মে যৌতুকের মতো জঘন্য প্রথার কোনো স্থান নাই বরং বিয়েতে কনেকে দেনমোহর দেবার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাগিদ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানা তায়াল বলেন, 'আর তোমরা নারীদের মোহরানা খুশিমনে দিয়ে দাও।' (সূরা নিসা : ৪) কনের প্রাপ্য দেনমোহর কোনো দয়ার দান নয়, বরং তা তাদের ন্যায্য অধিকার। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেনমোহর পরিশোধ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

ইসলামে যৌতুক গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে হারাম বা নিষিদ্ধ। শরিয়তের বিধানে বিয়ের শর্ত হিসেবে যৌতুক

আদায় করা শুধু নাজায়েজই নয় বরং সুস্পষ্ট জুলুম হিসেবে গণ্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত-১৮৮)। অর্থাৎ যা তোমার নয় তা দাবি করা যাবে না, এটা অন্যায়। যৌতুক ইসলামে নিষেধ বা হারাম। তাই এটা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

নারী দিবস

সালমা ঝুপড়ি ঘর থেকে বের হয়। সে অক্ষরজ্ঞান শূন্য মহিলা। তাই গার্মেন্টসে কাজ করতে পারে না। তার স্বামী ড্রাইভার। প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে সে বেরিয়ে যায় আর রাতে ফেরে। কোনো কোনো রাতে নেশাপানি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে ঘরে ফেরে। সালমা দুই বাড়িতে ছুটা কাজের লোক হিসেবে কাজ করে। মাস শেষ হলেই তার স্বামী কলিম মিয়া সেই বাড়িতে যেয়ে হাজির হয়। তারপর বাড়ির মালিকের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে পকেটে ভরায়। সেই দিন সে আর গাড়ি চালায় না। বস্তির শেষ মাথার গাঞ্জা ঘর থেকে নেশা পানি কিনে এনে ঘরের দরজা লাগিয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে।

সালমার পুরো মাসের কষ্টের টাকা কলিম মিয়া ফুর্তি করে উড়িয়ে দেয়। সালমা হতাশ চোখে শুধু দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সালমার বাপের বাড়ির অবস্থা অত ভালো নয়। সালমার বাবার হাঁপানির রোগ, প্রায়ই টান উঠে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে ধরে। মাঝে মাঝেই তিনি ফোন দিয়ে সালমার কাছে টাকা চান। সালমা দিতে পারে না। তখন তার খুব কষ্ট হয়।

আজকে কী যেন দিবস উপলক্ষে মিছিল হবে। পাশের খুপড়ির রত্না সেখানে তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছে।

মিছিল করলে নাকি কিছু টাকা পাওয়া যাবে। টাকাটা পেলে গোপনে লুকানো কিছু টাকার সাথে মিলিয়ে দুই হাজার টাকা সালমা তার আব্বাকে পাঠাতে পারবে। তার স্বামী কলিম মিয়া জানতে পারলে শকুনের মতো ছোঁ দিয়ে টাকাটা পকেটে ঢুকাবে। সকালের রোদে দাঁড়িয়ে সালমা এসব ভাবছিল। রত্নার ডাকে সে সম্বিৎ ফিরে পায়। রত্না সালমার গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'কী রে, কী ভাবিস এত? তাড়াতাড়ি চল। দেরি করলি পরে আর ট্যাকা পামু না। নাম রিজিস্ট্রি করা লাগবো।'

সালমা রত্নার সাথে জোরে পা চালায়। সকালের সোনা রোদের ঝলমলে আলোটা রত্নার মুখে এসে পড়ে। কিন্তু সে আলোতে রত্নাকে বড্ড বিষণ্ন দেখায়। সালমা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী রে রত্না, তোর মুখটা এমন কালা কইর‍্যা রাখছোস ক্যান? কুনো সমইস্যা? তুই যে বাপের বাড়ি গেলি সম্পত্তির লাইগা, পাছ নাই?'

রত্নার কালো মুখটা যেন আরও কালো হয়ে গেল। হতাশ কণ্ঠে সে বলল, 'নারে, ভাইরা কি আর দেয়? পাঁচ হাজার ট্যাহা দিয়া বিদায় দিছে। বেশি ঝামেলা করলে তো আর বাপের ভিটাতে কুনু দিন যাইবার পামুনা। থাক, ভাইজানই তো খাবে, খাক।'

সালমা আর রত্নার সাথে পথে মাজেদা চাচির দেখা হল। তিনিও মিছিলে যাচ্ছেন। এই বয়সে তিনি যে কেন মিছিলে যাচ্ছেন, তা সালমার বোধগম্য হল না। মাজেদা চাচি শাড়ির আঁচলটা টেনে মুখ ঢাকল। সালমা আগ বাড়িয়ে বলল, 'চাচি, আপনেও মিছিলে যাচ্ছেন, হাঁটতে পারবেন?'

মাজেদা চাচি থতমত খেয়ে বললেন, 'আর কস না রে মা, পোলাটা সেই যে বিয়া করলো, আর আমার খোঁজ লয়না। এখানে ওখানে চায়া চিনতে খাই, তাই এট্টু আইলাম, কিছু যদি পাই।'

সালমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কেন যে পোলা গুলা এমুন হয়? ক্যামনে এরা মাকে ফ্যালায় দেয়, আল্লাহই জানে? এগো বুক কি একটুও কাঁপে না?'

মাজেদা চাচি চুপ হয়ে গেলেন। একজন লোক সবাইকে সারিবদ্ধ করে সাজাতে লাগল। সবার হাতে

প্ল্যাকার্ড ধরিয়ে দিল । মাজেদা চাচিকে পিছনের সারিতে নিয়ে গেলেন আর অন্য আরেকজনকে সালমার পাশে দাঁড় করাল । সালমা মেয়েটার দিকে তাকাতেই চমকে উঠে বলল, ‘আরে, কোহিনুর, তুই! তোর স্বামী না গার্মেন্টসের সুপারভাইজার । তোর ট্যাকার দরকার আছে না কী রে?’

সুন্দরী কোহিনুর সকালের সূর্যের তেজের মতোই গলায় ঝাঁঝ মিশিয়ে বলল, ‘ক্যান তুই জানোস না, হ্যায় তো আমারে যৌতুকের লাইগা ছাইড়া দিছে । ওর নাকি আর আমারে ভাল লাগেনা, নতুন ছেমড়ি ধরছে ।’

সালমা কিছু বলতে যাচ্ছিল । কিন্তু ড্রামের শব্দে সব কোলাহল থামিয়ে দিল । ড্রাম বাজানো শেষ হলে একজন নেতার তেজী কণ্ঠ শোনা গেল । তিনি হাত উঁচিয়ে বললেন, ‘এই মেয়েরা চলেন, আমরা সামনে এগোই । আজ ৮ই মার্চ, বিশ্ব নারী দিবস । আজ আপনাদের অধিকার আদায়ের মিছিল । আপনাদের এই মিছিলে আমরা পুরুষেরাও সামিল হলাম । নারীদের প্রতি সকল সহিংসতা বন্ধ করতে হবে । যৌতুক বন্ধ করতে হবে । সম্পদে নারীর অংশ ফিরিয়ে দিতে হবে । নারীদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে । নারীর প্রতি সকল অবিচার, লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার অবসান করতে হবে । আমরা আপনাদের সাথে আছি । এই যাত্রার জয় হোক ।’

নেতার বক্তব্য শেষ হলে আবার ড্রাম বাজতে লাগল । ড্রামের তালে তালে মিছিল সামনে এগোতে লাগল । কার অধিকার, কিসের অধিকার কিছু না বুঝেই সালমা, রত্না, মাজেদা চাচি আর কোহিনুর মিছিলে মিশে গেল ।

টিকাঃ এই সমাজে নারীদের অধিকার বলে আসলে কিছুই নেই । বিয়েতে ঠিকমত দেনমোহর আদায় তো হয়ই না তথাপি যৌতুক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে গেছে । অথচ আমাদের ধর্মে যৌতুক নেয়া নিষিদ্ধ,

উল্টো নারীদের মোহরানা আদায়ের করতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাগিদ দিয়েছেন। 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা খুশি মনে দিয়ে দাও।' (সূরা নিসাঃ ৪)

নারীর উপার্জনও পুরুষেরা আত্মসাৎ করে থাকেন অথচ তাদের উপার্জনে পুরুষের কোনো হক নাই।

পুরুষরা নারীর রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তত্ত্বাবধায়ক। তারা নারীদের জন্য অর্থ ব্যয় করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালা বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক (protectors and maintainers) এজন্য যে আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য (strength) দান করেছেন এজন্য যে তারা তাদের অর্থ (নারীদের জন্য) ব্যয় করবে।' (সূরা নিসাঃ ৩৪)

বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীদেরকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়। অথচ আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালা বলেন, 'পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের যেমন অংশ আছে, তেমনি নারীদেরও অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশি হোক এ অংশ নির্ধারিত।' (সূরা নিসাঃ ৭)

ভালো লাগা ফুরিয়ে গেলে স্ত্রীকে ছুঁড়ে মারার কোনো নিয়ম নাই। ভালো না লাগলেও সদাচারণ পাওয়া নারীর অধিকার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালা বলেন, 'নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। অত:পর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছো, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।' (সূরা নিসাঃ ১৯)

নারীরাও যেমন তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট নয়, ঠিক তেমনি পুরুষেরাও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই নারী দিবস প্রতি বছর জাঁকজমকের সাথে উদযাপন করা হলেও নারী তার অধিকার ফিরে পায় না।

কোরবানি

শাকুর সাহেব বেশ চিন্তিত। সামনে কোরবানি ঈদ। গরু কোরবানি দিতে হবে। গরু কেনা খুব ঝামেলার কাজ। শাকুর সাহেব বারান্দার চেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছেন। টেনশন হলে তিনি পা নাচান, তাতে অনেকটাই টেনশন কমে যায়। তিনি তার পিএস রনিকে ডেকে বললেন, ‘রনি, ঈদ তো চলে এল। আজকেই একটা গরু কিনব বলে ঠিক করলাম। চল, বিকালেই হাটে যাই।’

রনি হাসিমুখে বলল, ‘জ্বে আচ্ছা স্যার, চলেন। কী ধরনের গরু কিনবেন স্যার? কত দামের মধ্যে কিনবেন? একটা আইডিয়া দেন, আমার লোক আছে। আপনাকে দামের মধ্যে ভালো গরুটাই কিনে দিতে পারবে।’

শাকুর সাহেব কঠিন গলায় বললেন, ‘রনি, বাজারের সবচেয়ে বড় গরুটাই কিনতে চাই। আমার একটা মান-সম্মান আছে না? আমার বাপ-দাদারা এই বাড়ি থেকে প্রতি বছর বড় গরুটাই কোরবানি দিয়ে আসছেন। তাদের ঐতিহ্য তো আমাকে রাখতেই হবে। তাই না রে?’

রনি তেলতেলে সুরে বলল, ‘জ্বে স্যার, জ্বে স্যার, এটা আপনার মান-সম্মানের ব্যাপার। বাজারের

সবচাইতে উঁচা আর দামি গরুটাই কেনা লাগবে। গত বছরেও তো তাই হয়েছে, এবারো তাই হবে। আপনে টেনশন নিয়েন না। গতবারের মতো এবারো আমি সব সিস্টেম কইর‍্যা ফ্যালাইব।'

শাকুর সাহেব চিন্তিত হয়ে বললেন, 'আশে পাশের সবার গরুর সাইজ আর দাম দেখে আয়। একটা ধারণা পাবি। আর আমাদের গরুর উপরে যেন কারো গরুর মাথা না উঠে সেদিকে খেয়াল রাখিস।'

রনি এক্সপার্ট ছেলে। সে হেসে বলল, 'জ্বে স্যার, আমি আগেই সব দেখে রাখছি। আপনে টেনশন নিয়েন না। এই এলাকায় কারো কি আর আপনার মতো সামর্থ্য আছে? রায়হান সাহেব আর মান্না সাহেব ছাড়া মোটামুটি সবাই গরু কিনেছে। অধিকাংশই ভাগে কোরবানি দেবে, বখরা কোরবানি আর কী!'

শাকুর সাহেব কৌতূহলী হয়ে বললেন, 'রায়হান আর মান্না ভাই কোরবানি দেবে না কেন? কোনো সমস্যা? ওরা তো প্রতিবছরই দিয়ে আসছে।'

রনি মাথা চুলকে বলল, 'শুনলাম যে রায়হান সাহেব নাকি সপরিবারে থাইল্যান্ড ঘুরতে যাবে। তাই এবার কোরবানি দেবেন না। আর মান্না সাহেব নাকি কোরবানির টাকা বন্যার্তদের দেবে। এটা নিয়ে তো তিনি ফেসবুকে স্ট্যাটাসও দিয়েছেন। লাইভেও তার বক্তব্য প্রচার করেছেন। আহঃ বন্যার্তদের জন্য তার বুকে কত কষ্ট, শুনলেও চোখ দিয়ে পানি চলে আসে।'

শাকুর সাহেব মিটিমিটি হেসে বললেন, 'ভড়ং এর আর জায়গা পায় না। কোরবানি দিবি না ভালো কথা, মিথ্যা ভড়ং করিস কেন রে তোরা? বন্যার্তদের আমিও তো ত্রাণ দিলাম, সেজন্য তো আর কোরবানি বাদ দেবো না। বাপ-দাদার আমল, বাদ দেওয়া যায়?'

রনি মাথা নেড়ে বলল, 'নাটক করে তো মান্না সাহেব, নিজেরে নায়ক মান্না ভাবে। খুব ভাব! ধর্ম-কর্ম তো কিছুই বোঝে না। কী আর কোরবানি করবে? তাই উল্টা-পাল্টা বকে আর কী!'

শাকুর সাহেব হাসলেন। তিনি বারান্দার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কোরবানি উপলক্ষে অনেক কাজ বাকি আছে। গত কোরবানি ঈদে আটমণ গোশত হয়েছিল। তিনি নিজ হাতে মেপেছিলেন। গোশত মাপতে তার বেশ ভালোই লাগে। গোশতের ভারে বাটখারার রশিটা গতবার ছিঁড়ে গেছে, ঠিক করতে হবে। বড় বড়

ডেকচি, হাঁড়ি, ছুরি বের করতে হবে।

বিকেলে শাকুর সাহেব সেজেগুজে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হাটের উদ্দেশ্যে হাঁটা দিল। পথে রায়হান সাহেবের সাথে দেখা হলো। রায়হান সাহেব সালাম দিয়ে হাত মিলিয়ে বললেন, 'কী ভাই, কোথায় যাচ্ছেন?'

শাকুর সাহেব হেসে বললেন, 'এই তো হাটে যাই। গরু কিনব। তা আপনি কী কোরবানি করছেন, গরু না ছাগল?'

রায়হান সাহেব হেসে বললেন, ' না, এবার তো আমরা ঈদের ছুটিতে থাইল্যান্ড যাচ্ছি তাই কোরবানি করতে পারছি না।'

শাকুর সাহেব বিস্ময়ের সুরে বললেন, ' আপনার তো মা আর ভাইয়েরা পাশের বাড়িতেই থাকেন। তাদের সাথে তো একভাগ দিতে পারতেন। তাই বলে কোরবানি একেবারেই দেবেন না এটা কেমন কথা?'

রায়হান সাহেব আত্মবিশ্বাসের সাথে বললেন, 'হ্যাঁ, দিচ্ছি তো। এবার আমি মনের পশুকে কোরবানি করব, বুঝলেন? ঐ যে কবিতাটা পড়েন নি 'মনের পশুরে কর জবাই'

শাকুর সাহেব না সূচক মাথা নেড়ে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি যা বুঝেন করেন। এগুলো আমার মাথায় ঢোকে না।'

শাকুর সাহেব মুখ বাঁকিয়ে চলে গেলেন। হাঁটতে হাঁটতে পথে মান্না সাহেবের সাথে দেখা হলো। মান্না সাহেব নাটক করেন, হাসিখুশি রসিক আর দিলখোলা মানুষ। শাকুর সাহেব কে দেখে আগ বাড়িয়ে এসে বললেম, ' কি ভাই, এত সাজুগুজু করে কোথায় যান? শ্বশুর বাড়ি নাকি?'

শাকুর সাহেব হাত মেলাতে মেলাতে বললেন, 'আরে না, গরুর হাটে যাই। গরু কিনব। তা শুনলাম আপনি নাকি এবার গরু কোরবানি দেবেন না, কথাটা কি ঠিক?'

মান্না সাহেবের হাসি মুখটা মুহূর্তেই পাল্টে গেল। মুখে একটা কষ্ট কষ্ট ভাব এনে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। এবারে যেরকম বন্যা হয়ে গেল, বন্যায় এত মানুষ কষ্ট পেল, ঘর ছাড়া হলো। ওদের কে অভুক্ত রেখে কিভাবে কোরবানি করি, বলেন? তাই কোরবানির জন্য জমিয়ে রাখা টাকাটা বন্যার্তদের দিলাম আর

কী!’

শাকুর সাহেব ‘ও আচ্ছা’ বলে হাঁটা দিলেন। তার তর্ক করার সময় নাই। বিকেল হয়ে আসছে, মানুষের ভিড় বাড়বে। হাটে পৌঁছে অনেক ঘোরাঘুরি আর যাচাই বাছাই শেষে সবচেয়ে বড় আর দামি গরুটা কিনলেন। হাটে থেকে সবচেয়ে বড় গরুটা কিনে গর্বিত মুখে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি এসে দেখেন বউ খোদেজা বেগম তার উপর চটে আছে। মান্না সাহেবের বউ এই ঈদে চারটা নতুন মডেলের শাড়ি আর গহনা কিনেছে, সেগুলো নাকি একটু আগে দেখিয়ে গেছে। শাকুর সাহেব মনে মনে মান্না সাহেব আর তার বউয়ের চৌদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করলেন। ‘বন্যার্তদের সাহায্য করবি তাই কোরবানি দিবি না। কিন্তু বউ বাচ্চার শপিং তো বন্ধ করিস নি ব্যাটা। খালি কোরবানি দেবার বেলাই ছলাকলা দেখাস। ব্যাটা বাটপার কোথাকার।’

গরু বেঁধে রেখে তিনি বউয়ের রাগ ভাঙাতে তাকে নিয়ে মার্কেটে গেলেন। এবার ঈদে বন্যার্ত, কোরবানি আর শপিং মিলে তার অনেক টাকা বেরিয়ে গেল। পরের মাসে বেশ কয়েকটা ফাইল আটকিয়ে এগুলো উসুল করতে হবে বলে ঠিক করলেন।

ঈদের দিন গরু জবাই হলো। তিনি আরাম কেদারায় বসে তদারকি করলেন। নিজ হাতে গোশত মাপলেন। আটমণ গোশত হয়েছে। এই এলাকার সবচেয়ে বড় গরু তার বাড়ি থেকেই কোরবানি করা হলো। তার মুখ খুশিতে ভরে গেল। কম দামে বেশ ভালো গরু কিনেছেন। খুব জেতা জিতেছেন। ফকির-মিসকিনদের লাইন করে দাঁড়িয়ে নিজ হাতে দাঁত বের করে হাসি মুখে গোশত বিলালেন। বড় ছেলে সুমন সেটা ভিডিও করে ফেসবুকে আপলোড দিল, ‘আমার বাবার কোরবানি। দ্যা বেস্ট স্যাক্রিফাইসার, আই হ্যাভ এভার সিন। আই অ্যাম রিয়্যালি প্রাউড অব মাই ফাদার।’

টিকাঃ আমাদের সমাজে কোরবানি এখন একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। লোক দেখানো কোরবানি অধিক প্রচলিত। অনেকেই 'মনের পশুরে কর জবাই, পশুরাও বাঁচে, বাঁচে সবাই।' কবিতার পঙক্তি আওড়িয়ে পশুর প্রতি মমত্ব দেখিয়ে কোরবানি করে না। কিন্তু এই শ্রেণির মানুষেরা সারা বছর মুরগি, গরু আর খাসীর গোশত রসিয়ে রসিয়ে খেয়ে থাকে আর কোরবানি এলেই পশুর প্রতি মায়া কান্না দেখানো শুরু করেন।

আবার অনেকেই কোরবানি না দেবার অন্য অছিলা খুঁজতে থাকে। বন্যার্তদের টাকা দেবে কিন্তু কোরবানি দেবে না। অথচ তারা ঈদ শপিং, খাওয়া-দাওয়ার উৎসব, হাসি-আনন্দ, ঘোরাঘুরি কোন কিছুই বাদ রাখে না।

তবে এই সব মানুষদের কোরবানি দেওয়া না দেওয়ায় আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালার কিছুই যায় আসে না। আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালা শুধুমাত্র মুত্তাকীদের কোরবানি কবুল করেন। যাদের ইনকাম হলো হারাম পেশার, সুদখোর, ঘুষখোর আর সমাজের চাপে লোক দেখানো কোরবানি, তাদের কোরবানি আল্লাহ্ কবুল করেন না। তিনি আদম (আঃ) এর পুত্র কাবিলের কোরবানী কবুল করেন নি।

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আদমের পুত্রদ্বয়ের (হাবিল-কাবিলের) বৃত্তান্ত তুমি তাদের যথাযথভাবে শোনাও। যখন তারা উভয়ে কোরবানি করেছিল তখন একজনের (হাবিলের) কোরবানি কবুল হলো এবং অন্যজনের কবুল হলো না।' তাঁদের একজন (কাবিল)বললেন, 'আমি তোমাকে হত্যা করবই। অপরজন (হাবিল) বললেন, 'আল্লাহ মুত্তাকিদের কোরবানি কবুল করেন।' (সূরা আল মায়িদাঃ ২৭)

কোরবানির রক্ত গোশত কিছুই আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে না, আল্লাহ্ শুধু তাঁর বান্দার তাকওয়া দেখেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না তাদের (কোরবানির) গোশত এবং রক্ত বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।' (সূরা আল হজ্বঃ ৩৭)।

রুই আর পুঁটি মাছের গল্প

‘কত কষ্ট কইর‍্যা তোক মুই ডাক্তারি পড়াইছি আর তুই হামাক একনাও দেখিস না। টাকা পয়সা বেশি দিবার পাস না। সাজেদার বিয়ার বয়স পার হবার নাগছে, সেদিক খেয়াল আছে? অর বিয়া দেয়া নাগবার নয়? সে ট্যাকা আছে? সব ট্যাকা তো তোর পাছত ব্যয় কইরা ফেলাইছম, এখন সেগলা ফেরত দে।’

পিতার প্রশ্নবাণে সেলিম সংকুচিত হয়ে গেল। সেলিম কষ্ট চেপে বলল, ‘আব্বাজান, আপনি অযথাই আমার উপর রাগ করতেছেন। আমি তো দুই বছর হলো বিসিএস দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছি। এক বছর নিজের এলাকায় কাজ করলাম, সেই টাকা জমিয়ে তিন রুমের বাড়ি করলাম আর চারজনের পড়াশুনার খরচ চালালাম। আমার কাছে তো আর কিছুই জমানো নাই। এখন কোর্সে পরীক্ষা দেবার জন্য পড়ছি, সামনে এফসিপিএস পরীক্ষা, তাই এখন বাহিরে প্র্যাকটিস করি না। ডিগ্রী হয়ে গেলে বড় ডাক্তার হবো হব ইন শা আল্লাহ্, তখন চেম্বার দেবো, ভালো টাকা আসবে।’

পিতা মহসীন আলী ভ্রু কুঁচকিয়ে বললেন, ‘এত বছর কী হামরা বইস্যা থাকুম? সাজেদার পর মাজেদা আছে, দুইডাই বড় হইয়্যা গেছে। এগুলোরে পার করতে হইব, যে করেই হোক ট্যাকার জোগাড় করাই

নাগব, বুঝলু?’

সেলিম শান্ত কণ্ঠে বলল, ‘আব্বা, আপনি আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা করেন। সুমন আর শাহীনের হোস্টেলে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে যা থাকে তার সামান্য কিছু নিজের জন্য রেখে বাকি সবটাই এখানে পাঠাই।’

মহসীন আলী রুক্ষ গলায় বললেন, ‘হ, হ, দিয়া তো একেবারে উল্টায় দিছস! সামনের বাড়ির তালুকদারের বেটা সাদ্দামরে দেখছস? তোর সাথেই তো বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে সরকারী চাকরিতে ঢুকল। পড়াশুনায় তোর থাইক্যা কত পিছনত আছিলো, টাইন্যা টুইন্যা মেট্রিক পাশ করছিল। কোনো ভার্সিটিতেও চান্স পায় নাই। পরে বগুড়ার আজিজুক হক থাইক্যা কেমনে জানি অনার্স আর মাস্টার্স শেষ করলো। এখন দ্যাখ যায়া, সেই সাদ্দাম আইজ কত্ত বড় অফিসার। দোতলা ঘর করছে, বোনকে ম্যালা ট্যাকা যৌতুক দিয়া বড় ঘরে বিয়া দেছে। বাপেক গঞ্জে বড় দোকান ঘর তুলে দেছে। ঐ পারলি পরে তুই ক্যা পারবি না?’

সেলিম মৃদু হেসে বলল, ‘ আব্বা, একই গ্রেডের সব বিসিএস ক্যাডার একই বেতন পায়, কলেজের শিক্ষক, ডাক্তার, পুলিশ, কৃষি অফিসার থেকে শুরু করে কাস্টমস, জেলা প্রশাসনের সবাই এক সমান টাকা পায়। ১৮ তম বিসিএস এর বেতন স্কেল কত, আপনি জানেন? সাদ্দাম আমার সমানই বেতন পায়। এই বেতন দিয়ে দুই বছরে এত কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু সে যদি বাড়তি ইনকাম করে তবে সেটা অবশ্যই অবৈধ।’

মহসীন আলী মেজাজ কমিয়ে বললেন, ‘ক্যা, মুই যে শুনম ডাক্তারেরা ম্যালা ট্যাকা কামায়। তাইলে ওরা ক্যামনে কামায়?’

সেলিম শান্ত কণ্ঠে বলল, ‘যে সব ডাক্তারেরা অনেক টাকা ইনকাম করেন, তাদের নামের পাশে অনেক বড় বড় ডিগ্রী আছে। সেই ডিগ্রী নিতে তাদের অনেক পড়াশুনা করতে হয়েছে, অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। ডিগ্রী নিতে মিনিমাম পাঁচ-সাত বছর লাগছে। অনেক বেশি বয়স তা প্রায় পঞ্চাশ পার করার পর তারা এত ইনকাম করতে পেরেছে। আমার মতো এত কম বয়সে ডিগ্রী ছাড়া কেউ চেম্বার দিয়ে ওরকম টাকা ইনকাম করতে পারেন নাই।’

মহসীন আলী কৌতূহলী কণ্ঠে বললেন, 'ক্যা, মুই যে দেখম আমাদের এই শহরে তোর মতো চ্যাংড়া ডাক্তারেরা চেম্বার দিয়া বইস্যা আছে। ভালোই তো কামায় তারা। তুই চেম্বার দেস না ক্যান? চেম্বার দিয়া রোগী দেখপু আর ডিগ্রীর পড়া পড়বু।'

সেলিম বলল, 'আব্বা, মফস্বল শহরে বড় ডাক্তার নাই। তাই ছোট ডাক্তারদের চাহিদা আছে। কিন্তু বড় বড় জেলা শহরে বা বিভাগে যেখানে প্রফেসররা আছেন, সেখানে তেমন কেউ এমবিবিএস পাশ ডাক্তারের কাছে আসে না। সবাই নামের পাশে ডিগ্রী খোঁজে। যারা গরিব তারা আসে। পঞ্চাশ, একশ টাকা ভিজিট দেয়। তাদের কাছ থেকে ঐ টাকাটা নিতেও কষ্ট লাগে। এমনও হয়েছে যে তাদের কষ্ট দেখলে নিজের টাকা দিয়ে ওষুধ কিনে দিতে হয়েছে।'

মহসীন আলী হতাশ কণ্ঠে বললেন, 'আইচ্ছা, ঠিক আছে। তাইলে ডিগ্রী নেওয়ার চেষ্টা কর। ততদিন মুই বাঁচোম কিনা আল্লাহই জানে।'

সেলিম আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'আব্বা, আপনি চিন্তা করবেন না। এমডি করতে পাঁচ বছর আর এফসিপিএস করতে চার বছর লাগবে। আমি এমডি কোর্সের জন্যই চেষ্টা করছি। চান্স পেলে দেখবেন পাঁচ বছর মুহূর্তেই শেষ হয়ে যাবে। আমাদের টানাটানির জীবনও শেষ হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ্।

কৃষক পিতা মহসীন আলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সাজেদা আর মাজেদা বড় হয়ে গেছে। বাবার চোখে মেয়েরা সব সময় ছোটই থাকে, কিন্তু সমাজের মানুষগুলোর চোখ তো আর অন্ধ নয়। গ্রামের মানুষগুলো নানাজন নানা কথা বলে, সহ্য করা যায় না। পার করতে পারলেই তিনি বেঁচে যান। সাজেদা এবার স্টার মার্ক্স নিয়ে ইন্টারমেডিয়েট পাশ করেছে। মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিতে চায়। মহসীন আলীর কাছে এসে আদুরে কণ্ঠে আবদার করেছিল। তিনি মাথা নেড়ে না করে দিয়েছেন। অভাবের সংসারে মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করে কোনো লাভ নাই। একদিন পরের ঘরে চলে যাবে। শুধু টাকা খরচ করে কী লাভ! তার চেয়ে বরং সেই টাকা দিয়ে ভালো ঘরে বিয়ে দেওয়াই উত্তম। ডাক্তারী পড়ে কী হবে! ছেলে সেলিমকে নিয়ে কত স্বপ্ন বুনেছিলেন, ধানী জমি বিক্রি করে পড়ার খরচ দিয়েছেন। এখন তো তার উসুলের সময়, অথচ

ছেলেটা এখনো সে ভাবে উঠে দাঁড়াতেই পারে নি। তাই সাজেদাকে নিয়ে আর তিনি ও পথ মাড়াবেন না বলে ঠিক করেছেন। যতই কাঁদুক আর আবদার করুক, আর না!

মহসীন আলী উঠে দাঁড়ালেন। হাটে যেতে হবে। দড়ি বাঁধা একটা খালি কাঁচের বোতল এগিয়ে দিতে দিতে স্ত্রী আনোয়ারা বেগম বললেন, ‘ ছোলট্যাক ক্যা আপনে অত চাপ দেবার নাগচেন? ওর ট্যাকা থাকলে ঐ ঠেক বাহির করত। মিছা কথা কওয়নের ছোল ঐ নোয়ায়। মুই ওক পেটত থুছম, মুই ওক ভালা কইরাই চেনম।’

মহসীন আলী খেঁকিয়ে বললেন, ‘ হ, হ, ডাক্তার ছোলের গলা ধইর‍্যা এহন বইস্যা থাকো গ্যা।’

মহসীন আলী স্ত্রীকে ধমক দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। জীবন যুদ্ধে পরাজিত একজন মানুষ তিনি। স্বপ্ন দেখেছিলেন ছেলেকে নিয়ে, বড় ডাক্তার হবে, অনেক টাকা ইনকাম করবে। গ্রামে বড় হাসপাতাল তৈরি করবে। কত নাম, কত সম্মানের অধিকারী হবেন তিনি। সব স্বপ্নই গুড়েবালি। বড় ডাক্তার হতে নাকি আরো পাঁচ-সাত বছর সময় লাগবে, ততদিন কী তিনি আর বাঁচবেন! মাঝে মাঝেই বুকের ভিতরটা চিনচিন করে উঠে। সেলিম একবার তাকে বড় হার্টের ডাক্তার দেখিয়েছিল। হার্টে নাকি ব্লক ধরা পড়েছে, রিং পড়াতে এক লাখ টাকার মতো খরচ লাগবে। ডাক্তারের বাবা বলে কোনো মাফ নাই, শুধু অপারেশনের খরচটা লাগবে না। কিন্তু রিং এর টাকা, ওষুধের টাকা, বেড ভাড়া সব মিলিয়ে অনেক খরচ। এত টাকা সেলিমের নাই। মহসীন আলীর বুকের ব্যথাটা যেন চিনচিন করে বাড়ছে, হাঁটতে গেলে ব্যথাটা আরো বাড়ে। পাশ দিয়ে একটা মোটর বাইক শব্দ তুলে চলে গেল। মোটরসাইকেলটা থেমে গেল, কে যেন ডাকছে। মহসীন আলীর চোখে ছানি পড়েছে, ভালো করে দেখার চেষ্টা করলেন। মোটরবাইক থেকে নেমে ছেলেটা বলল, ‘চাচা, আমি সাদ্দাম। আপনি কোথায় যান চাচা?’

মহসীন আলী চেনা গলায় বললেন, ‘ও সাদ্দাম, এই তো বাজান, এট্টু হাটে যাই।’

সাদ্দাম হেসে বলল, ‘চাচাজান, আমার মোটরবাইকে বসেন। একটান দিয়ে আপনাকে হাটে পৌঁছে দেবো। আমিও হাটে যাব। পরশু ঈদ, বাজার করতে হবে। চাচা, চলেন। একসাথেই যাই।’

মহসীন আলী না সূচক মাথা নেড়ে বললেন, ‘আরে না, বাজান। মোর হাঁটার অভ্যেস আছে, তোমরা যাও।’

সাদ্দাম জোর দিয়ে বলল, ‘ না, না, চাচা, আপনার চড়াই লাগবে। চড়েন তো।’

লুঙ্গী আর ছেঁড়া পাঞ্জাবি পরিহিত মহসীন আলী ধূলায় ধূসরিত অনভ্যস্ত দুই পা নিয়ে কোনমতে মোটরসাইকেলে উঠে বসেলেন। তারপর মুহূর্তেই বাজারে পৌঁছে গেলেন। মোটরসাইকেলটা বাজারের একপাশে রেখে দুইজনেই বাজারে ঢুকে গেলেন। মহসীন আলী সস্তা দেখে দুই ভাগা পুঁটি মাছ কিনলেন, আড়চোখে দেখলেন যে বাজারের সবচেয়ে বড় মাছটা সাদ্দাম কিনল। আলু, পটল আর কাঁচের বোতলে এক ছটাক খোলা সয়াবিন তেল কিনে বাজারের ব্যাগটা অর্ধেক ভর্তি করে আবার বাড়ির পথে হাঁটা দিলেন। পিছন থেকে আবার কে যেন ডাকছে। সাদ্দাম কাছে এসে বলল, ‘চাচাজান, আমারও বাজার করা শেষ, চলেন একসাথেই যাই। আমার বাইকে বসেন।’

মহসীন আলী কাঁচুমাচু হয়ে গেলেন। সাদ্দামের দুই ব্যাগ ভর্তি বাজার। সেগুলো পিছনের ক্যারিয়ারে বেঁধে ফেলল। মোটরসাইকেল একটানে বাড়ির কাছে চলে এল। নামার সময় সাদ্দাম জোর করে একটা বড় রুইমাছ মহসীন আলীর ব্যাগে ঢুকিয়ে দিল। মহসীন আলী যেন আরো কুঁচকে গেলেন। বাড়িতে ঢুকে দেখলেন সাজেদা, মাজেদা, সেলিম, শাহীন, সুমন সবাই মিলে হেসে হেসে কী যেন গল্প করছে। দেখেই তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তিনি হেঁকে বললেন, ‘এই সাজু, এই মাজু, এত হাসির কী আছে রে? কোনো কাজকাম নাই, সারাদিন শুধু খ্যাঁক খ্যাঁক হাসি।’

আনোয়ারা বেগম এগিয়ে এসে বললেন, ‘ছোল গুলার উপর এত রাগ করেন ক্যা? ঈদের ছুটিতে সব এক হইচে, এনা গল্প-গুজব, হাসি-আনন্দ করতাছে, এতে দোষের কী আছে?’

মহসীন আলী খেঁকিয়ে উঠে বললেন, ‘লাই দিয়া মাথাত তোল, বুঝলা? আরো মাথাত তোল। বাজারের ব্যাগটা নাও আর রাঁন্ধতে যাও।’

বাজারের ব্যাগ থেকে বড় রুইমাছটা বের করে আনোয়ারা বেগম বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি গলা

চড়ালেন, ‘ এত বড় রুইমাছ আনার পর আবার পুঁটি মাছ কেনার কী দরকার ছিল?’

মহসীন আলী গম্ভীর গলায় বললেন, ‘রুইমাছটা আমি কিনি নাই। সাদ্দাম জোর কইর‍্যা ব্যাগে ঢুকায় দেছে।’

আনোয়ারা বেগম হিংস্র গলায় বললেন, ‘কোন সাদ্দাম? ঘুষখোর সাদ্দাম? তাইলে ঐ মাছ মুই ধরবার পামু না।’

মহসীন আলী বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘ক্যা, ধরবার পাবা না ক্যা?’

আনোয়ারা বেগম বললেন, ‘কানাঘুষায় শুনছম যে ঐ বলে ঘুষ খায়। না হলে এত ট্যাকা ঐ কই পায়? হামার সেলিমও তো একই সময়ে চাকরিতে ঢুকছে। একই বেতন পায় তয় এত বাড়তি ট্যাকা কই পায়? হারাম না কামালে অত পায়? মুই জীবনেও হারাম ট্যাকার কিছু খাম নাই, খামুও না। এই মাছ হয় আপনে ফেরত দিয়া দেন নাইলে ফেলায় দিয়া আসেন। এইডা মুই ধরবার পামু না।’

মহসীন আলী হাত নেড়ে বললেন, ‘আহঃ মলো! ঐ হারাম কামালে, কামাইছে। কিন্তু ঐ হামাক এমনি দেছে, সেটা হামার ঘরে হারাম হয় ক্যামনে?’

আনোয়ারা বেগম চেঁচিয়ে বললেন, ‘মুই কিছুই বুঝম না। মুই জাইন্যা শুইন্যা হারাম খাবার পামু না।’

আনোয়ারা বেগম মাছটা বাম হাত দিয়ে ধরে বাড়ির পিছনের বাঁশঝাড়ে ছুঁড়ে মারলেন আর গজরাতে গজরাতে বললেন, ‘পুঁটিমাছ খামু, তবুও হারাম ট্যাকার রুই মাছ খামু না। হামার সেলিমের ট্যাকা কম, মুই তাতেই খুশি। ঐ হারাম ট্যাকার ফুটানি করার মোর কোনো দরকার নাই, থু থু মারি ঐ হারাম ট্যাকার।’

আনোয়ারা বেগম হাত নেড়ে ইচ্ছেমত চিৎকার করছেন। অনেকদিন বাদে তিনি স্বামীর গলার উপর আওয়াজ তুলেছেন। মহসীন আলী চুপ হয়ে গেলেন। বাঁশ ঝাড়ের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড়বিড় করে দোআ করতে লাগলেন, ‘আল্লাহ্, এই প্যাটে কুনো দিন হারাম ঢুকায়ো না। হামার সেলিমের রিজিকেত বরকত দাও।’

টিকাঃ দোয়া কবুলের পূর্বশর্ত হালাল রুজি। দুনিয়ার সমৃদ্ধির জন্য কোনো বিচার বিবেচনা ছাড়াই হারাম পথে উপার্জন করা হচ্ছে। আবার অবৈধ উপার্জন নিয়ে অহংকারেরও শেষ নেই। অথচ হারাম উপার্জন আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালার কাছে কতই না নিকৃষ্ট।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, "হে মানব মন্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসাম-গ্রী ভক্ষন কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সুরা বাকারা :১৬৮)

পবিত্র খাদ্যবস্তু মানে হালার খাবার। সৎভাবে উপার্জিত অর্থের কেনা খাবার। পবিত্র বস্তু আহার এবং আল্লাহপাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। পরিশ্রম করে হালাল উপার্জন করতে হবে। হাদিসে আছে, কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে ৫টি প্রশ্ন করা হবে। তার মধ্যে দুটি প্রশ্ন হলো কী উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করেছিলে এবং আর কিভাবে তা ব্যয় করেছিলে? হারাম পথে অর্জিত অর্থের খাবার খেলে ইবাদত কবুল তো হবেই না বরং হাদিসে আছে, দেহের যে অংশ হারাম মাল দ্বারা পালিত হয়েছে তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তাই আমাদের হারাম পথের উপার্জন পরিহার করতে হবে।

একটি মধুর প্রেম কাহিনী এবং অতঃপর

শাহীনের সাথে সিড়িতে আসা যাওয়ার পথে প্রেম হয়েছিল, ঠিক যেন বাংলা সিনেমার মতো। আরজিনা শাহীন কে পাগলের মতো ভালোবাসে। আরজিনার স্বামী জামিল সারাদিন বাহিরে থাকে, এই সুযোগে প্রেম আরো পূর্ণতা পায়। শুধু মাঝে মাঝে ঝামেলা করে বড় মেয়ে নুসরাত। ছেলেটা ছোট, তাই কিছু বোঝে না, একটা চকলেট ধরিয়ে দিলেই চুপ হয়ে থাকে।

আরজিনা টিভিতে হিন্দি সিরিয়াল দেখছে। বাড়ির কর্ত্রী সোনাক্ষী ভালোবাসে পাশের বাড়ির এক দেবর রোহিত কে। এই পর্বে তাদের মিলন দেখাচ্ছে। গত সত্তর পর্ব ধরে তাদের লুকোচুরি প্রেম দেখানো হয়েছিল। বাড়ির কর্তা রাহুল প্রচণ্ড খারাপ, বউ কে সবসময় ঝাড়ি দেয়, তাকে ঘুরতে নিয়ে যায় না, তাকে সময় দেয় না, তাকে বোঝে না। এরকম আনরোমান্টিক স্বামীর সাথে ঠিক ঘর করা যায় না। সোনাক্ষীর সব কষ্টগুলোই এত করুণভাবে সিরিয়ালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে তা দেখে মাঝে মাঝে আরজিনা কেঁদে ফেলত। তার জীবনের সাথে মিল পেত। তার গাড়ি চালক স্বামীও ঠিক একই রকম, তাকে সময় দেয় না, তাকে বোঝে না। তার চেয়ে শাহীন কত ভালো। ডাকলেই দৌড়ে আসে। তার সাথে ছাদের চিলেকোঠায়

দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে। কত ভালো আর রোমান্টিক সে।

কারেন্ট চলে গেল। সাথে সাথে টিভিটাও বন্ধ হয়ে গেল। আরজিনা বিরক্ত হলো। সোনাক্ষী আর দেবর রোহিতের মিলনটা দেখা হলো না। এরকম অলস সময়ে সে একটু আরাম করে টিভি দেখে তা আর দেখা হলো না।

আরজিনা মোবাইলটা হাতে নিল। ফেসবুক ওপেন করল। নারীদের একটা পেইজ তার খুব পছন্দের। পুরুষেরা এই পেইজের অ্যাডমিনদের চ্যাপ্টারনী বলে গালী দেয়। অথচ তারা খুব সুন্দর সুন্দর সব গল্প আর স্ট্যাটাস দেয়।

নারীদের মনের একেবারে গহীনের কষ্টগুলো তুলে আনে, পড়লে বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে। নারী কেন মাসিক হলে সবাইকে বলতে পারবে না, তাদের অন্তর্বাস প্রকাশ্যে নেড়ে দিতে পারবে না, স্বামী কেন তাদের সাথে জোর খাটাবে, কেন নারীরা বাহিরে একা ঘুরতে পারবে না, কেন নারীদের কোনো ছেলে বন্ধু থাকবে না, কেন নারীরা যেখানে খুশি সেখানে ঘুরতে পারবে না, কেন নারীরা রাত বাহিরে কাটাতে পারবে না, কেন নারীরা ইচ্ছেমত পোশাক পরতে পারবে না, এরকম কত শত সমস্যা আর কষ্টের টপিক নিয়ে তারা লেখে।

আজকে তারা কী টপিকস নিয়ে লিখেছে, দেখা দরকার। পেইজেটা খুলে আরজিনা পড়তে শুরু করল। 'চরিত্রের জুজুর ভয় আর কতো? 'পরকীয়া' মানে কী? পরের সাথে যে কিয়া? আরে! আমি যদি কারো সাথে 'কিয়া' করি, সে কি আর 'পর' থাকে? তাহলে পরকিয়া হয় কেমনে? সে তো 'স্বকিয়া'। প্রতিটা প্রেম, প্রতিটা সম্পর্কই তো বাস্তবতা। সম্পর্কে অতীত বলে তো কিছু নেই। যদি কোন সম্পর্কে জড়িয়ে যাও জীবনের যে কোন প্রান্তে, সে সম্পর্ক স্বীকার করে নেয়ার সাহস অর্জন করো, মেয়ে।'

আহ! কী সুন্দর লেখা। পরকীয়াও একটা প্রেম আর প্রেম তো স্বর্গ থেকে আসে। সে তো বাংলা সিনেমায় দেখেছে যে প্রেম পবিত্র। কত নায়কের তেজী ডায়ালগ সে শুনেছে। 'আমাদের পবিত্র প্রেমের কসম।' নায়িকারাও বাবার মুখের উপর ডায়ালগ দেয়। 'প্রেম করেছি, বেশ করেছি।' এতে লুকোচুরির কিছু নাই।

সে বিয়ের আগে প্রচুর গল্পের বই পড়ত। কত প্রেমের গল্প। আহ! সেই দিনগুলো, কী সুন্দর কাটত। নিজেকে তার গল্পের নায়িকা মনে হতো। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির বিনোদিনীকে তার খুব ভালো লেগেছিল। আশার স্বামী মহেন্দ্র বিধবা বিনোদিনীর প্রেমে পড়েছিল । পরবর্তীতে বিধবা বিনোদিনীর সেই পরকীয়া প্রেম আর পূর্ণতা পায় না। মিলন না হওয়ার কষ্টে তার বুকটা যেন ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল সেই সময়।

কিছু কিছু উপন্যাসে অবশ্য পরকীয়া প্রেমের মিলন হয়েছিল। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটা তার খুবই ভালো লেগেছিল। মালার স্বামী কুবের আকৃষ্ট হয়েছিল চপলা সুন্দরী কপিলার প্রতি। কপিলা সম্পর্কে কুবেরের শ্যালিকা ছিল। কপিলাও বিবাহিত ছিল। এতকিছুর পরেও শেষে শালী দুলাভাইয়ের প্রেমটা চমৎকার পরিণতি পেয়েছিল। 'আমারে নিবা মাঝি লগে' ডায়ালগ দিয়ে নতুন প্রেমের নতুন জীবনের পরিসমাপ্তি দেখানো হয়েছিল।

আরজিনা বসে বসে ভাবছিল। তার প্রেমটাকেও পূর্ণতা দিতে হবে। এভাবে আর বাঁচা যায় না। এই রুদ্ধশ্বাস লুকোচুরির অবসান ঘটাতে হবে। আজ রাতের মধ্যেই কিছু একটা করতে হবে। আরজিনা মোবাইলটা হাতে নিয়ে শাহীনকে ফোন দিল। তারপর ফোনে দুইজন মিলে একটা প্ল্যান করে ফেলল।

জামিল গাড়ি চালাচ্ছে। প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিয়ে দ্রুত বাসায় ফিরতে হবে। মেয়েটা আবার তাকে ছাড়া ঘুমাতে পারে না। তার গায়ে ছোট পা টা তুলে দিয়ে নুসরাত ঘুমায়। মেয়েটা ঘুমিয়ে গেলে তিনি পা টাতে আলতো করে চুমু দেন। কী সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে তার, খুব বাপ নেওটা। মেয়েটা একদিন বড় হবে, বিয়ে হয়ে পরের বাড়িতে চলে যাবে। তখন কি আর বাবার কথা মনে পড়বে? মেয়ের জন্য বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল।

প্রতিদিন তাড়াতাড়ি ফিরতে চান। কিন্তু পারেন না। ঢাকা শহরে যে জ্যাম। জ্যাম ঠেলে বেশি একটা ট্রিপ নিতে পারেন না। তাই রাত হয়ে যায়। টাকা ইনকাম না করলে ভালোভাবে চলবেন কী ভাবে? এই দুর্মূল্যের বাজারে এত খরচ যোগাতে হিমশিম খেতে হয় তাকে।

শেষ ট্রিপটা দিয়ে গাড়ি গ্যারেজে রেখে জামিল বাড়ির পথে রওনা দিল। মেয়ের জন্য একটা রঙ পেন্সিল বক্স আর ছেলের জন্য একটা প্লাস্টিকের গাড়ি কিনে বাসায় ফিরল। নুসরাত গিফট পেয়ে দৌড়ে যেয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে। ছেলেটাও এসে বাবার কোলে উঠে বসে। বাচ্চাদের আদর আর ভালোবাসায় জামিলের সারাদিনের কষ্ট নিমিষেই উধাও হয়ে গেল।

শুধু স্ত্রী আরজিনার মুখটাই ভার হয়ে আছে। দিন দিন সে কেমন যেন রুক্ষ হয়ে উঠছে। স্বামীকে সহ্যই করতে পারছে না। কী যেন বলতেই মুখ ঝামটা দিল। মন খারাপ করে জামিল বাচ্চা দুটোকে দুই পাশে নিয়ে ঘুমাল।

নুসরাত বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বাবা, আম্মু না আজকে আমাকে পাশের রুমের খাটে ঘুমাতে বলছে। আমি নাকি বড় হয়ে গেছি, তোমার সাথে নাকি আর ঘুমাতে পারব না। কিন্তু বাবা, আমি তো তোমাকে ছাড়া ঘুমাতে পারি না। আমি অন্যখানে ঘুমাব না। আমি সারাজীবন তোমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাব, বাবা।'

জামিল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মেয়েটার বয়স নয় চলছে, বিছানা আলাদা করে দিতে হবে। নুসরাতের কপালে চুমু দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা মা, ঠিক আছে, আজকে ঘুমাও, পরে দেখা যাবে। আমরা বাপ-মেয়ে বেহেস্তে একসাথে ঘুমাব। সেখানে তোকে আমার থেকে কেউ আলাদা করতে পারবে না রে, মা।'

জামিল নুসরাতকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে গেল। মাঝ রাতে ভারী কোনো বস্তুর আঘাতে তার ঘুমটা ভেঙে গেল। মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে। চিৎকার করতে যেয়েও তিনি কোনো শব্দ বের করতে পারলো না। কে যেন শক্ত হাতে মুখের উপর বালিশ চাপা দিয়েছে।

নুসরাত বাবাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়েছিল। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। বাবা পাশ থেকে সরে গেছে। বাবার মুখের উপর মা আর শাহিন মামা বালিশ চেপে ধরে রেখেছে।

নুসরাত চিৎকার করে বলে উঠল, 'মা, শাহিন মামা, তোমরা কী করছ? আমার বাবাকে ছেড়ে দাও। প্লীজ...প্লীজ...... ।'

নুসরাত ছোট্ট ছোট্ট হাতে তার মা আর মায়ের প্রেমিক শাহিনকে প্রতিরোধের চেষ্টা করছে। এক পর্যায়ে

সে তার মা আরজিনার হাতে কামড় বসিয়ে দিল । এক ঝটকায় মা আরজিনা ধাক্কা দিয়ে নুসরাতকে মেঝেতে ফেলে দিল । নুসরাতের ছোট্ট শরীরটা মেঝেতে পড়ে গেল । প্রচণ্ড ব্যথায় সে কুঁকড়ে গেল । তার বাবাকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে, তাই সে ব্যথা ভুলে ঝট করে উঠে দাঁড়াল ।

শাহীন রক্তচক্ষু নিয়ে আজরিনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শ্যাষ, মইরা গ্যাছে'

আরজিনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'এখন ডাকাতির মামলা সাজাইতে হবে, একটা পালানোর বুদ্ধি বাইর করা লাগব ।'

নুসরাত এসব দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মা, আমি সব্বাইকে বলে দেবো । তোমরা আমার বাবাকে মেরে ফেলেছ ।'

নুসরাতের কথা শুনে আজরিনার চোখ বড় বড় করে তাকাল, 'খবরদার ! যদি কিছু বলিস, মাইরা ফ্যালাইব, একদম মাইরা ফ্যালাইব । এক্কেবারে তোর বাপের কাছে পাঠায় দেবো ।'

নুসরাত চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, 'বলব, আমি সব্বাইকে বলে দেব। তুমি আমার বাবাকে মেরে ফেলেছ ।'

আজরিনা শাহীনকে চোখের ইশারায় নুসরাতকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিল । ছোট্ট মেয়ে নুসরাতকে শ্বাস রোধে মেরে ফেলা হলো । পরকীয়ার বলি নিষ্পাপ শিশুর মুখটা কষ্টে নীল হয়ে রইল ।

টিকাঃ পরকীয়া, অনৈতিক জঘন্য সম্পর্ক যার কারণে ধ্বংস হচ্ছে কত সুন্দর সম্পর্কগুলো । ভাঙছে ঘর, সন্তানেরা বাবাহীন বা মাহীন হয়ে অসহায় ভাবে বেড়ে উঠছে আবার অনেক ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে মেরে ফেলছে । অথচ সাহিত্য উপন্যাসে, হিন্দী সিরিয়ালে, কলকাতার বাংলা সিরিয়ালে, সিনেমায় পরকীয়ার রূপের কতই না মধুর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আবার কিছু নারীবাদী পেইজ চমৎকার ভাবে

পরকীয়ার পক্ষে সাফাই গাইছে।

আর আমাদের নতুন প্রজন্ম তাতে একমত পোষণ করছে এবং এটাকে পাপ হিসেবে মনেও করছে না। ফেসবুক বন্ধু, কলিগ, পুরানো বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশী সবখানেই প্রচুর পরকীয়ার পার্টনার পাওয়া যায়। একবেলা স্পাউসের সাথে মনোমালিন্য হয়েছে তো ব্যস! তার সাথে সমঝোতার কোনো চেষ্টাই না করে টাইম পাস করার জন্য তারা খুব সহজেই আরেকজনকে খুঁজে বের করে ফেলে!

অথচ আল্লাহর কাছে এরা কতই না জঘন্য। আল্লাহ সুবহানা তায়ালা যিনাকে হারাম ঘোষণা করে বলেনঃ 'তোমরা যিনার কাছেও যাবে না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং খারাপ কাজ।' (সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৩২)

যিনার শাস্তিও ভয়াবহ, যে অবিবাহিত তাকে একশত বেত্রাঘাত প্রকাশ্যে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তা অবলোকন করতে বলা হয়েছে যাতে মানুষ শিক্ষা নেয় আর সাবধান হয়। (রেফঃ সূরা নূরঃ ২)

অবিবাহিত ব্যক্তির যিনার শাস্তি হলো নির্দয়ভাবে প্রকাশ্যে একশত দোররা (চাবুক মারা) কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তির যিনা এত নিকৃষ্ট যে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সেই মৃত্যুদণ্ডও আবার দিতে হবে খুব কঠিন উপায়ে। মাটিতে পুঁতে রেখে তার উপর পাথর ছুঁড়তে হবে যতক্ষণ না সে মারা যায়।

প্রথা ভাঙার বিয়ে

আগামী ছাব্বিশে মার্চ পিয়ার বিয়ের তারিখ ঠিক হলো। অনেক দিন ধরেই তার জন্য ছেলে খোঁজা হচ্ছিল। কিন্তু সব কিছু ম্যাচ করছিল না। অবশেষে ছোট মামার আনা প্রস্তাবে রেজার সাথে পিয়ার বিয়ের কথা পাকা হলো। আগামীকাল রেজার বাড়ি থেকে লোকজন এসে এনগেজমেন্ট রিং পরিয়ে দিয়ে যাবে। সেই উপলক্ষে বাড়ি ঘর সাজানো হচ্ছে। বাড়িতে একটা উৎসব উৎসব আমেজ বইছে।

পরেরদিন চার মাইক্রোবাস ভর্তি প্রায় চল্লিশজন মানুষ এল। পিয়া পার্লার থেকে সেজে এল। ফখরুদ্দীন বাবুর্চির কাছে একশত জনের বিরিয়ানি আর রোস্টের অর্ডার দেওয়া হলো। 'সুপারলাইক' ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের তরুণেরা সবগুলো প্রোগ্রামের সাজানো আর ছবি তোলার দায়িত্ব নিল। তারা ডিএসএলআর ক্যামেরা দিয়ে প্রতি মুহূর্তের ছবি তুলল। সন্ধ্যায় জাঁকজমকের সাথে রেজা-পিয়া একজন আরেকজনকে আংটি পরাল। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে সেই ছবিগুলো পরেরদিন ফেসবুকে আপলোড করল। রেজা-পিয়া তা শেয়ার করল। মুহূর্তেই কনগ্র্যাচুলেশন আর ভার্চুয়াল দোআ দিয়ে কমেন্টে ভরে গেল। হাজার হাজার লাইক এল। কিছু ভিডিও ইউটিউবে শেয়ারও দিল। সেখানেও প্রচুর ভিও হলো। রেজা-পিয়া নতুন জীবনের

আনন্দে বাক-বাকুম হয়ে রইল।

এদিকে পিয়ার বাবা পারভেজ সাহেব বিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড টেনশনে পড়ে গেলেন। গতবছর তিনি চাকরি থেকে অবসরে গেছেন। তার দুই মেয়ে পিয়া-হিয়া আর এক ছেলে হিমেল। পিয়া হিয়া পিঠেপিঠি দুই বোন। পিয়ার পর হিয়ার বিয়েটাও দ্রুত দেবেন বলে ঠিক করেছেন। ছোট ছেলে এবার কয়েক লাখ টাকা দিয়ে বেসরকারী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। দুই মেয়ের বিয়ে বাবদ পনেরো লাখ টাকা বরাদ্দ রেখেছেন। বিয়ে পার করে তিনি ঢাকা ছেড়ে তার নিজ বাড়ি রংপুর চলে যাবেন। ওখানে শহরে একটা জায়গা কেনা আছে। সেখানে বাড়ি করার জন্য ত্রিশ লাখ টাকা আলাদা করে রেখেছেন। কিন্তু যেভাবে টাকা স্রোতের মতো ব্যয় হয়ে যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে সেই টাকাটাতেও হাত দিতে হবে। এক এনগেজমেন্ট প্রোগ্রামেই প্রায় দুই লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছে। ‘প্রথম বিয়ে’, ‘বড় মেয়ের বিয়ে’ আত্মীয় স্বজন আর পাড়া-প্রতিবেশী যে যেভাবে পরামর্শ দিচ্ছে সেভাবেই তিনি এগুচ্ছেন। যে করেই হোক ছেলেপক্ষকে খুশি করতে হবে। চব্বিশ মার্চ গায়ে হলুদ আর ছাব্বিশ মার্চ বিয়ে। দুই দিনের জন্যই কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করা হয়েছে।

পারভেজ সাহেব সংস্কৃতমনা। তার ছোট মেয়ে হিয়াও ঠিক তেমন। সে রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়। কিন্তু গায়ে হলুদ উপলক্ষে সে হিন্দী গান আর নাচ শিখছে। তার কাজিনদেরকেও শেখাচ্ছে। ইউটিউব থেকে খুঁজে খুঁজে নতুন নতুন সব আইডিয়া বের করছে। তার উত্তেজনার শেষ নাই। একমাত্র বোনের বিয়ে বলে কথা। হিয়া এসে বাবার পাশে দাঁড়াল,

‘আব্বু, কি ভাবছ?’

‘কিছু না রে। তোরা সারাদিন দরজা লাগিয়ে কী করিস?’

‘নাচ প্র্যাকটিস করি। তোমাদের কাউকে দেখাব না, সারপ্রাইজ দেবো। বুঝলে?’

‘তুই যা ধুম-ধাড়াক্কা শুরু করেছিস, আমি তাতেই তব্দা হয়ে গেছি, আর কী সারপ্রাইজ দিবি?’

'আহঃ আব্বু, তুমি শুধু আমাকে খোঁচাও। আমার কিন্তু আরেকটা আবদার রাখতেই হবে।'

'কী আবদার? আমাকেও নাচতে হবে নাকি? লুঙ্গি ড্যান্স না কি জানি তোরা নাচিস, ওরকম কিছু? লুঙ্গি তুলে নাচ, ছু!'

হিয়া বাবার কটাক্ষ গায়ে মাখল না। তারা যে লুঙ্গি ড্যান্স করবে তা বাবা কিভাবে জানল ভেবে পেল না। সে আহ্লাদি সুরে বলল, 'তোমাকে নাচতে হবে না। তবে নাচের ড্রেসের জন্য টাকা দিতে হবে। মেয়েদের জন্য শাড়ি আর ছেলেদের জন্য ফতুয়া-লুঙ্গি। বেশি খরচ পড়বে না। এই হাজার চল্লিশ হলেই হবে।'

পারভেজ সাহেব মুখ বাঁকালেন, 'উহঃ আমি কি তোর মামা লাগি? মামা বাড়ির আবদার? আর কোন টাকাই আমি দিতে পারব না।'

তারপর হিয়া হাত নেড়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কি সব বুঝিয়ে টাকাটা নিয়ে গেল। পারভেজ সাহেব আর হিসেব মেলাতে পারছেন না। তার মাথা ঘুরছে। গতকালের এনগেজমেন্টের ধকল কেবল শেষ হলো, এরই মধ্যে আবার হলুদের প্রোগ্রামের প্রস্তুতি চলছে। তার প্রেসারটা বড্ড ফ্ল্যাকচুয়েট করছে। তিনি এই শীতেও ফ্যান ছেড়ে দিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিলেন।

২৪ মার্চ বেশ জাঁক জমকের সাথে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হলো। প্রোগ্রাম শুরু করার আগে একজন মোল্লা ডেকে দোআ পড়িয়ে নেওয়া হলো। দোআর পর নাচ-গানের সাথে হলুদ উৎসব শুরু হলো। উঠতি বয়সী ছেলে আর মেয়েরা হলুদ আর রঙের খেলা খেলতে লাগল। খুব মজা হলো। ধুম ধাড়াক্কা গানের সাথে সবাই এক হয়ে নাচল। প্রোগ্রামের আকর্ষনীয় ভিডিও গুলো হিয়া ফেসবুক আর ইউটিউবে ছাড়ল। মুহূর্তে হাজার লাইক পড়ে গেল।

হিয়ার মাথায় নতুন আইডিয়া খেলে গেল। বিয়ে হবে ২৬ মার্চ মানে স্বাধীনতা দিবসে। বিয়েতে হিয়া চমক আনতে চায়। তার মাথায় একটা বুদ্ধি ঘুরপাক খাচ্ছে। সে সবাইকে ড্রয়িং রুমে ডাকল।

পারভেজ সাহেব বিরক্ত নিয়ে বললেন, 'আবার কী আবদার নিয়ে এসেছিস? আমি আর তোকে টাকা

দিতে পারব না, বলে রাখলাম।’

‘আব্বু, তুমি এত বিরক্ত কেন?’

‘বিরক্ত হবো না। বোনের বিয়েতেই যা শুরু করে দিয়েছিস, নিজের বিয়েতে যে কী করবি তা আল্লাহই জানে!’

‘আব্বু, তুমি খালি আমাকে খোঁচা দাও। তুমি তো বিয়ে করেছ সেই ১৯৫৩ সালে, তখন এত কালচার ছিল? বিয়ের রীতি পাল্টেছে, সমাজ পাল্টেছে। মানুষ আধুনিক আর কালচার্ড হয়েছে। বিয়ে মানে বিশাল এমিউজমেন্ট। আর এটা আমাদের স্ট্যাটাসেরও বিষয়। তুমি রেজা ভাইয়ের ফেবুর স্ট্যাটাস দেখো। তার গায়ে হলুদে ডিজে পার্টি হয়েছে, ঢাকার সেরা নাচের দল ড্যান্স কোবরা নেচেছে। তাদের সমান সমান না হলে হয়? আর লোকেই বা কী বলবে? আমরা কি ক্ষ্যাত, আনকালচার্ড?’

পারভেজ সাহেব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। স্ট্যাটসের বিষয়। ছেলেপক্ষের সমান সমান হতে হবে। আরো আধুনিক হতে হবে। টাকা যায় যাক, আগে মান-সম্মান রাখতে হবে। না হলে লোকে কী বলবে। তিনি বিরক্তি কমিয়ে বললেন, ‘আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন আর কী কী করতে হবে বল?’

হিয়া মুখে একটা বিশাল হাসি ফুটিয়ে বলল, ‘বিয়েতে আমরা একটা চমক আনতে চাচ্ছি। আমি, পিয়াপু আর রেজা ভাই মিলে একটা প্ল্যান করেছি। বিয়ের দিন ছেলেপক্ষরা সবুজ পাঞ্জাবি, শাড়ি আর মেয়েপক্ষরা লাল পাঞ্জাবি-শাড়ি পরে আসবে। স্বাধীনতার রঙের ফ্লেভার আনব আর কি।’

পারভেজ সাহেব ভ্রু কুঁচকালেন। তিনি জীবনেও লাল রঙের কিছু পরেন নাই। লাল রঙটা তার উৎকট লাগে। তিনি না সূচক মাথা নেড়ে বললেন, ‘না, আমি লাল পাঞ্জাবি পরতে পারব না। তোরা অন্য রঙ সিলেক্ট কর।’

‘তা কি করে হয়, আব্বু? স্বাধীনতা দিবসে লাল না হয় সবুজ পরতে হবে।’

‘তাহলে আমরা সবুজ পরি, ওরা না হয় লাল পরুক।’

‘না, আব্বু। আইডিয়াটা রেজা ভাইয়ের, সে তার পক্ষের সবাইকে অলরেডি সবুজ পাঞ্জাবি কিনে

দিয়েছে। এখন আর আমাদের কোনো অপশন নাই। একটু স্মার্ট হও আব্বু, যুগের সাথে তাল মিলাতে হবে না? না হলে আমরা সমাজে মুখ দেখাব কিভাবে?'

পারভেজ সাহেব বিরষ মুখে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। যা ভালো মনে করিস, কর।'

'আব্বু, বিয়েতে আরও একটা চমক আছে।'

'কী চমক?'

'পিয়াপু বিয়ের শাড়ি পরবে না, কোনো মেকআপও করবে না।'

'তাহলে পিয়া কী পরবে? আমাদের মতো লাল পাঞ্জাবি?'

'না, শাড়ি পরবে তবে বিয়ের লাল শাড়ি নয়, দাদির সাদা শাড়ি।'

পারভেজ সাহেব চোখ কপালে তুলে বললেন, 'আম্মার শাড়ি? তার কোনো ভালো শাড়ি আছে নাকি? আব্বা মারা যাবার পর থেকে তো তিনি চিকন পারের সাদা থানই পরে থাকতেন।'

হিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, দাদির সাদা থানই পরবে। আমি একটা ভালো দেখে সাদা থান চাচির বাড়ি থেকে এনে রেখেছি।'

'উহঃ সাদা শাড়িতে কারো বিয়ে হয় নাকি? ওটা তো বিধবাদের রঙ। কি যে করতে যাচ্ছিস কিছুই বুঝতে পারছি না। আর ওরকম পুরাতন শাড়িতে মেকআপ ছাড়া পিয়াকে তো বুড়ির মতো দেখাবে।'

'না, না, মোটেও খারাপ দেখাবে না। তুমি দেখো আমরা একটা নতুন ট্রেন্ড চালু করবো। তুমি আমার উপর বিশ্বাস রেখো।'

'আচ্ছা, রাখলাম। তা রেজা কী পরবে? সে কী ওর দাদার পুরাতন ছেড়া পাঞ্জাবি, লুঙ্গি আর চটি পরে আসবে নাকি? এরকম বেশে আসলে আমার কোনো আপত্তি নাই। তাহলে তো আমার সুট-কোটের টাকাটা সেইভ হতো।'

'না, শুধু আপুর পোশাকে চেঞ্জ আনছি। রেজা ভাই শেরওয়ানী পরেই আসবে। জিরো মেকআপ উইথ দাদির শাড়ি। পাবলিক খুব খাবে, বুঝলে?'

‘তুই কি সব পাবলিক কে দাওয়াত দিবি নাকি?’

‘আরে না, খাবে মানে লাইক করবে আর কী।’

পাবলিক সত্যি ভালোই খেল। ২৬ মার্চের ব্যতিক্রমী প্রথা ভাঙার বিয়ে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হলো। জিরো মেকআপ উইথ দাদির শাড়ি, বিয়ের কবুল বলার আগে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া, লাল-সবুজ রঙের সাজ, লাল সবুজ বেলুন দিয়ে ডেকোরেশন, গাড়িতে ফুলের পরিবর্তে পতাকার সাজ, সব মিলিয়ে ব্যাপক লাইক পেল। ফেসবুকে ভাইরাল হলো, ইউটিউবে হাজার ভিউ হলো, কিছু কিছু পেপারেও নিউজটা বের হলো।

পিয়া-হিয়া, রেজা সবাই খুব খুশি, প্রথা ভাঙার বিয়েতে তারা সফল। শুধু মেজাজ খারাপ পারভেজ সাহেবের। এক বিয়ে পার করতে তার পনেরো লাখ টাকা চলে গেছে। শুধু পিয়ার মেকআপ খরচটা সেইভ হয়েছে। ঘুরানি-ফিরানিতেও হাজার ত্রিশ টাকা চলে গেল। এখন নাকি হানিমুনের টাকাও তাকে দিতে হবে। ব্যাংকক-পাতায়া তিন দিনের হানিমুনের প্যাকেজ, তিন লাখ টাকার ব্যাপার। তার মাথা ঘুরছে। তিনি ফ্যান ছেড়ে ঠান্ডা মেঝেতে শুয়ে পড়লেন।

অনেকদিন পর পিয়া আজ ক্লাসে গেল। স্যার রোল কল করছেন। নিকাবী ফাতিমাকে আর পিয়াকে দাঁড় করালেন। এতদিন অনুপস্থিতি কেন জিজ্ঞেস করতেই ফাতিমা জানাল যে তার বিয়ে হয়ে গেছে। সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। কেউ জানলও না যে তার বিয়ে হয়েছে। এটা কেমন কথা!

ক্লাস শেষে পিয়া ফাতিমাকে ধরল।

‘এই তোর বিয়ে হয়েছে, কাউকে জানালি না কেন?’

‘এই তো হুট করে হয়ে গেল। সব আত্মীয় স্বজনেরা এসেছিল। তবে কোনো বান্ধবীকে ডাকি নি, কারণ বিয়েটা মসজিদে হয়েছিল।’

পিয়া চোখ কপালে তুলে বলল, 'বিয়ে কারো মসজিদে হয় নাকি? মসজিদে তো মানুষ নামাজ পড়ে।'

'হ্যাঁ, মসজিদেই হয়েছে। কাঁটাবন মসজিদে। আমার অনুমতি নিয়ে আব্বু মসজিদে গিয়েছিল। ওখানে জুম'আর নামাজ শেষে আলীর সাথে আমার বিয়ে পড়ানো হয়।'

'তোর হাবির নাম আলী?'

'হ্যাঁ'

'বিয়ের খাওয়া হয় নি?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। তবে আমাদের পক্ষ থেকে নয়। মেয়েদের পক্ষ থেকে তো খাওয়ানোর নিয়ম নাই। আলীর পক্ষ থেকে সব মুসুল্লিদের খাবারের প্যাকেট দেওয়া হয়েছিল। বিরিয়ানীর প্যাকেট। শুধু দুইটা ছাগল দিয়ে ভোজ শেষ করা হয়েছে। বাড়তি কোনো খরচ করে নি।'

'এত সাধারণ বিয়ে? তোরা নিশ্চয় হানিমুনেও যাস নি?'

'না, তবে যাব। সামনের রমজানে মক্কায় ওমরা হজ্ব করতে যাব ইন শা আল্লাহ্। আমার শ্বশুর আমাদের হজ্বে যাবার টাকা গিফট করেছেন।'

পিয়ার মুখ হা হয়ে গেল। কেউ হানিমুনে মক্কায় যায়? সে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোকে কোনো গহনা দেয় নি? বাবার বাড়ি থেকে কী কী দিয়েছে?'

'আমার মা আমার বিয়ে নিয়ে স্বপ্ন দেখত। আমার বিয়ের মাধ্যমে তিনি এই সমাজের প্রথা ভাঙতে চেয়েছিলেন। মেয়ের বাবার বাড়ি থেকে তিনি কিছুই দেবেন না বলে মনস্থির করেছিলেন। তাই বাবার বাড়ি থেকে কিছুই আনি নি। আলী অবশ্য চার ভরি সোনা দিয়ে পুরা দেনমোহর উসুল করেছিল।'

'তোর শ্বশুর বাড়ি থেকে কেউ কিছু বলে নি? তোর শাশুড়ি কোনো কথা শুনায় নাই?'

পিয়া মুচকি হেসে বলল, 'আমার শাশুড়িও প্রথা ভাঙার পক্ষে। তিনি যখন বউ হয়ে এসেছিলেন, তখন তার শাশুড়ি তার উপর জুলুম করেছিল। সেই ত্রিশ বছর আগে তিনি সংকল্প করেছিলেন যে তার ছেলের বউকে তিনি কন্যা হিসেবে বরণ করবেন। এই সমাজের শাশুড়ি-বউয়ের বিষাক্ত সম্পর্কের বলয় ভাঙবেন।

তিনি সত্যিই তা ভাঙতে পেরেছেন। তিনি আমার জন্য যা করেছেন তাতে আমি পুরাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। যখন আমাকে বাসর ঘরে ঢুকানো হলো, আমি রুমটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সেটা কোনো বাসর ঘরের সাজ ছিল না।'

'তাহলে? কী রকম ছিল?'

'সেই রুমটা ছিল ঠিক আমার বাবার বাড়ির রুমের মতো। নীল রঙের দেয়াল, ডানপাশে বিছানা, একই বেডশীট, ছোট্ট ড্রেসিং টেবিল, পড়ার টেবিল, আমার প্রিয় বই ভর্তি আলমারি, সব একই রকম। যখন আমি রুমে ঢুকি আমি হা হয়ে গিয়েছিলাম। আমার শাশুড়ি হাসছিলেন, তিনি আমার মায়ের সাথে পরামর্শ করে রুমটা সাজিয়েছিলেন। খুশিতে আমার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়েছিল। আমার শাশুড়ি আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়েছিলেন। সেদিন থেকে আমি তার হৃদয়জাত কন্যা হয়ে গেছি। তিনি বউ-শাশুড়ির মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।'

পিয়া পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। এত সুন্দর কারো বিয়ে হয়, এত ভালো শ্বশুর বাড়ি কেউ পায়? এত ভালো মানুষ দুনিয়াতে আছে? অথচ তার কপাল কত খারাপ। এত খরচ করে বিয়েটা বাবা দিয়েছিল অথচ শ্বশুরবাড়ির মানুষদের মন সে পায় নি। বিয়েতে এটা হয় নি, ওটা হয় নি, হাজারটা খুঁত ধরে তাকে অপদস্ত করে, মানসিক অত্যাচার করে।

পাঁচ বছর পরের কথা। পনেরো লাখ টাকা খরচ করে যে বিয়েটা হয়েছিল তা টেকে নি। সামান্য বনিবনা না হওয়ায় রেজা পিয়াকে ডিভোর্স দিয়েছিল। পিয়ার বাবা সেই খবরে স্ট্রোক করে মারা যান। তারপর চার বছর কেটে গেছে। পিতৃহীন ডিভোর্সী মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে আসে নি। এই কয়েক বছরে পিয়া অনেক পাল্টে গেছে। যাদেরকে সে আপন ভেবেছিল, সেই সব মানুষকে সে আর কাছে পায় নি। কোন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কেউ তেমন সাহায্য করে নি। অথচ এই সব মানুষদের তারা গুরুত্ব দিত, লোকে কী ভাববে, কী বলবে এসব নিয়ে তটস্থ থাকত। ধাক্কা খেতে খেতে সে তার প্রিয়জনকে চিনতে পেরেছিল। জাহেলিয়াতের জীবন থেকে সে আলোর জীবনে ফিরেছে। প্রায় রাতেই সে পূর্বের পাপের জন্য তাহাজ্জুদে

কাঁদত । তার জীবনে একজন ঈমানদার সঙ্গী চাইত । আল্লাহ্ তার দোআ কবুল করলেন ।

আজ তার বিয়ে । বান্ধবী ফাতিমার প্রচেষ্টায় তার দেবর ওমরের সাথে পিয়ার বিয়ে হবে । ওমর পিয়ার চার বছরের ছোট । এটাও এই সমাজের প্রথা ভাঙার বিয়ে । ডিভোর্সি অচ্ছুৎ মেয়ে তার চেয়ে কম বয়সী কুমার সুদর্শন ছেলেকে বিয়ে করতে যাচ্ছে । যে প্রথা চৌদ্দশ বছর আগে একজন ভেঙে দেখিয়ে গেছেন, সেই পথেই নতুন করে হাঁটবে ওমর আর পিয়া । আজকে সত্যিকারের প্রথা ভাঙার বিয়ে হতে যাচ্ছে ।

✓ টিকাঃ আমাদের সমাজে বিয়ে সম্পর্কিত অধিকাংশ প্রথাই ইসলাম ধর্ম বিরোধী । এমনকি কিছু কিছু কাজ শিরকের কাছাকাছি চলে যায় । আসুন দেখে নেই বিয়ের বর্জনীয় প্রথা সমূহ ।

বিবাহে প্রচলিত প্রথা যেসব বর্জনীয়ঃ

১. তারিখ ঠিক করাঃ চন্দ্র বর্ষের কোনো মাসে বা কোনো দিনে অথবা বর/কনের জন্ম তারিখে বা তাদের পূর্ব পুরুষের মৃত্যুর তারিখে বিবাহ শাদী হওয়া অথবা যে কোন শুভ সৎ কাজ করার জন্য ইসলামী শারী'য়াতে বা ইসলামী দিন তারিখের কোন বিধি নিষেধ নেয় । বরং উপরিউক্ত কাজগুলো বিশেষ কোন মাসে বা যে কোন দিনে করা যাবে না মনে করাই গুনাহ ।

২. আংটি পরানো : আজকাল মুসলিমের বিয়ের মধ্যে অমুসলিমদের মতো আংটি বদলের রীতি ঢুকে পড়েছে । শাইখ আলবানী রহ. 'আদাবুয যিফাফ' গ্রন্থে বলেন, ‘এতে মূলত কাফেরদের অন্ধানুকরণই প্রকাশ পায় । কেননা তা খৃস্টানদের সনাতন রীতি ।’

৩. অপচয়, অপব্যয়ঃ বিয়ের জন্য দামি দাওয়াত কার্ড ছাপানো, হোটেল ও কমিউনিটি সেন্টার ভাডা করা, শুধু বিয়ের জন্য বাহারী পোশাক ক্রয় করা, যা পরে কখনো গায়ে দেয়া হয না, খাবারে অপচয় করা,

খাদ্য নষ্ট করা, ফেলে দেযা ইত্যাদি । বস্তুত মেহমানদের সম্মানের খাতিরে নয় এসব করা হয় মূলত বিত্ত ও আভিজাত্য প্রকাশের জন্য । বিয়ের অনুষ্ঠানে নর্তকীদের পায়ের নিচে প্রচুর অর্থ ঢালা । পোশাক-আশাকের পেছনে মেয়েদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করা । মানুষকে দেখানোর জন্য বিয়ে অনুষ্ঠানে বারবার দামি কাপড় বদলানো । বিবাহ উৎসবে পটকা-আতশবাজি ফুটান, অতিরিক্ত আলোকসজ্জা করা, রংবাজী করা বা রঙ দেওয়ার ছড়াছড়ি ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ ও অপচয় । এভাবে অনেককেই দেখা যায় বিয়েতে বাগাড়ম্বর ও অপচয় দেখাতে গিয়ে নিজের কাঁধে ঋণের বিশাল বোঝা তুলে নেন । এ প্রসঙ্গে আল্লাহু-তা'য়ালা বলেনঃ 'নিশ্চয় অপচয় কারী শয়তানের ভাই । আর শয়তান হচ্ছে তার প্রভুর প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ ।' (বানী ইসরাঈল-২৭)

৪. গায়ে হলুদঃ বরের ভাবি ও অন্য যুবতি মেয়েরা বরকে সমস্ত শরীরে হলুদ মাখিয়ে গোসল করিয়ে দেওয়া নির্লজ্জ কাজ যা ইসলাম সমর্থন করে না । বর ও কনেকে হলুদ বা গোসল করতে নিয়ে যাওয়ার সময মাথার উপর বড় চাদর এর চার কোনা চার জনের ধরা হিন্দুয়ানী প্রথা । বিবাহ করতে যাওযার সময বরকে পিড়িতে বসিয়ে বা সিল-পাটাই দাঁড় করিয়ে দই-ভাত খাওয়ান ইসলামিক প্রথা নয় ।

৫. সালামঃ বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর বরকে দাঁড় করিয়ে সালাম দেওয়ানোর প্রথা রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওযা সাল্লাম) ও তার সাহাবীদের (রাযি আল্লাহু আনহুম) দ্বারা প্রমাণিত নয় । বর ও কনের মুরুব্বীদের কদমবুসি করা একটি মারাত্মক কু-প্রথা । বিয়ে তো নয় এমনকি যে কোন সময় কদমবুসি করা রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওযা সাল্লাম) ও তার সাহাবীদের (রাযি আল্লাহু আনহুম) দ্বারা কোন কালে প্রমানিত নয । কদমবুসি করার সময় সালাতের রুকু-সিজদার মত অবস্থা হয় । বেশি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে হিন্দুয়ানী প্রণামকে প্রথা হিসেবে নিয়ে আসা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য নয় ।

৬. বর-কনে বরণঃ বাঁশের কুলার চন্দন,মেহদি,হলুদ,কিছু ধান-দূর্বা ঘাস কিছু কলা, সিঁদুর ও মাটির চাটি নেওয়া হয়। মাটির চাটিতে তেল নিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। স্ত্রী ও বরের কপালে তিনবার হলুদ লাগায় এমনকি মূর্তিপূজার ন্যায় কুলাতে রাখা আগুন জ্বালানো চাটি বর-কনের মুখের সামনে ধরা হয় ও আগুনের ধুঁযা ও কুলা হেলিয়ে-দুলিয়ে বাতাস দেওয়া হয়। এসব হিন্দুয়ানী প্রথা ও অনৈসলামিক কাজ। বরের আত্মীয়রা কনেকে কোলে তুলে বাসর ঘর পর্যন্ত পৌছে দেওয়া অথবা বরের কোলে করে মুরুব্বীদের সামনে স্ত্রীর বাসর ঘরে গমনের নীতি একটি বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা ও অনৈসলামিক কাজ।

৭. অশ্লীলতা: বিয়ে বাড়ি মানেই গান-বাজনা হবেই অথচ তা হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদা কথা খরিদ করে, আর তারা ঐ গুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব। আর তার কাছে যখন আমার আয়াত পাঠ করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনতে পায়নি, তার দুই কানে যেন বধিরতা; সুতরাং তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।' (সূরা লুকমান : ৬-৭)

আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর কসম, বেহুদা কথা দ্বারা এখানে গানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।' এ কথা তিনি তিনবার আওড়ান। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু জাবের রাদিআল্লাহু আনহু ও ইকরামা রাদিআল্লাহু আনহু থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে।

৮. সৌন্দর্য বর্ধনে হারাম কাজঃ আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে বিয়ে উপলক্ষে দাড়ি মুণ্ডানো তো এখন অনেকের কাছেই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাড়ি না কামিয়ে বিয়েতে যাওয়াকে অনেকে দোষের মনে করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো :

দাড়ি বড় করো এবং গোঁফ ছোট করো।' (বুখারী : ৫৮৯২; মুসলিম : ৬২৫) হাদীসে দাড়ি রাখতে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় দাড়ি রাখা ওয়াজিব। কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে দাড়ি কাটার অবকাশ নেই। দাড়ি মুণ্ডানো হারাম। মুণ্ডনকারী গুনাহগার। কারণ, এতে কাফের ও নারীদের সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। সরাসরি লঙ্ঘিত হয় আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ। আবার বিয়েতে নারীরা ভ্রু উপড়িয়ে ফেলে। ভ্রু উপড়ানো বা পাতলা করা এমন একটি কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম করেছেন এবং এ কাজ করা ব্যক্তির ওপর অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন সেসব মহিলার ওপর যারা সৌন্দর্যের জন্য উল্কি অঙ্কন করে ও করায়, ভ্রু উৎপাটন করে ও করায় এবং দাঁত ফাঁকা করে।' (মুসলিম : ৫৬৯৫)

৯. অশ্লীল কিংবা প্রসিদ্ধি ও অহংকারের পোশাক পরা : অতি টাইট, পাতলা ও গোপন সৌন্দর্যকে প্রস্ফুটিত করে এমন পোশাক পরা। বক্ষ, বাহু ও কটি দৃশ্যমান হয় এমন অপ্রচলিত ও দৃষ্টিকটু পোশাক পরে অহঙ্কার দেখানো এবং পর পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'দুই শ্রেণীর জাহান্নামী লোক যাদের আমি এখনো দেখিনি। (তবে তারা অচিরেই সমাজে দেখা দেবে) এক. সন্ত্রাসী দল, তাদের সাথে গরুর লেজ সদৃশ চাবুক থাকবে। তারা এর দ্বারা লোকজনকে আঘাত করবে। দুই. এমন নারী যারা (পাতলা ফিনফিনে কাপড়) পরিহিতা অথচ উলঙ্গ, অপরকে আকর্ষণকারিণী আবার নিজেরাও অপরের দিকে আকৃষ্ট। তাদের মস্তকগুলো হবে বুখতি উটের হেলানো কুজের মতো। এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ এমন এমন দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।'(মুসলিম : ৫৭০৪) 'যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধির পোশাক পরিধান করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন।' (আবূ দাউদ : ৪০২৩; ইবন মাজাহ : ৩৬০৩)

১০.কোন পক্ষ যেওরের শর্ত করা নিষেধ এবং ছেলের পক্ষ থেকে যৌতুক চাওয়া হারাম (আহসানুল ফাতাওযা ৫/১৩) শর্ত আরোপ করে বর যাত্রীর নামে বরের সাথে অধিক সংখ্যাক লোকজন নিয়ে যাওয়া এবং কনের বাড়িতে মেহমান হয়ে কনের পিতার উপর বোঝা সৃষ্টি করা আজকের সমাজের একটি জঘন্য কু-প্রথা, যা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। (মুসনাদে আহমাদ/২০৭২২, বুখারী/২৬৯৭)

১১. সুগন্ধি ব্যবহার করা : বিবাহ অনুষ্ঠানে ইদানীং মেয়েরা বিশেষত তরুণীরা মহা উৎসাহে সেন্ট ব্যবহার করে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে অতপর মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাতে তার সুগন্ধি পায়, সে ব্যভিচারিণী।' (নাসাযী : ৯৩৬১; আহমদ : ১৯৭২৬)

১২. ছবি তোলা : আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠানগুলোর আরেক গর্হিত কাজ ছবি তোলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'প্রত্যেক ছবি অঙ্কনকারীই জাহান্নামে যাবে।' (মুসলিম : ৫৬৬২) অতএব সেই ছবি সম্পর্কে আর কী বলার প্রয়োজন আছে যা পর পুরুষের হাতে প্রিন্ট হয়, পর পুরুষরা দেখে এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলার তাওফীক দিন। আমাদের জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজে তাঁর প্রিয় হাবীবের সুন্নতের অনুবর্তী হবার তাওফীক দিন।

সায়িমের সিয়াম উদযাপন

বাড়ির সবচেয়ে ছোট ছেলে সায়িম আজ রোজা রেখেছে। সে উপলক্ষে বাড়িতে আজ ইফতার পার্টি হবে। বিশাল আয়োজন, পুরো বাড়ি চমৎকার করে সাজানো হয়েছে। দুইজন রাঁধুনি হায়ার করে আনা হয়েছে। খাবারের গন্ধে বাড়িতে উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছে। রুনা ঘুরে ঘুরে তদারকি করছি, রুনার তো বসার যো নেই, সে যে কর্ত্রী।

বড় ছেলে সানি এবার এসএসসি দেবে। ওর রুমটা সবসময়ই এলোমেলো থাকে। রুনা পরিষ্কার করতে রুমে ঢুকল। সানির কোনো সাড়া শব্দ নেই। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এক মনে ল্যাপটপে কী যেন দেখছে।

গায়ে হাত দিতেই ও চমকে উঠে বলল, ‘সরি মা, আমি শুনতে পাই নি, একটা জম্পেশ মুভি দেখছিলাম, টারমিনেটর সিরিজের। সময় তো কাটাতে হবে। কেন যে রমজান মাসটা বড় দিনে আসে? ইফতার সেই পৌনে সাতটায়। তিনটা মুভি ডাউনলোড করেছি। সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখবো।’

রুনা মৃদু হাসল। রমজান মাসটা বড় দিনে আসায় আসলেই বাচ্চাগুলোর কষ্ট হচ্ছে। এতটা সময় না খেয়ে থাকা আসলেই কষ্টের। ছেলের প্রতি মায়াটা ভিতরে লুকিয়ে রুনা বিরক্ত হয়ে বলল, ‘ ঘরটা গোয়ালঘর

বানিয়ে রেখেছিস কেন? তুই এখন এই ঘর থেকে টারমিনেট হ, আমি ঘর গুছাব, আজকে বাসায় ইফতার পার্টি আছে সে খেয়াল আছে?'

সানি বিছানা থেকে অলস ভাবে উঠে ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসল। টিভির রিমোট চেপে চেপে চ্যানেল পাল্টাতে লাগল। রুনা সানির ঘর গুছিয়ে মেয়ে স্নিগ্ধার ঘরে ঢুকে দেখে মেয়েটা আরাম করে ঘুমাচ্ছে। কী সুন্দর নিষ্পাপ চেহারা! পাশে রাখা মোবাইলে আলো জ্বলে উঠল। মোবাইলটা হাতে নিতেই চমকে উঠল, স্ক্রিনে নিউ মেসেজের চিহ্ন। কৌতূহল বশত রুনা মেসেঞ্জারের কথোপকথন পড়া শুরু করল।

'Hi, Baby….Are you sleeping?'
'No, I am trying to sleep with a pillow.'
'Oh! Why it's pillow? Why not me?'
'Remember, it's Ramadan, just wait for the Eid day.

আরো কথোপকথন পড়তে পড়তে তার গা গুলিয়ে গেল। এত নোংরা হতে পারে! রুনার মাথা ঘুরতে লাগল। নিজের রুমে যেয়ে শুয়ে পড়ল। তার অষ্টাদশী কন্যা স্নিগ্ধা একটা নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ও লেভেলে পড়ে। এ রকম বয়সে রুনা কিছুই বুঝত না। ছেলে বন্ধু তো দূরে থাক নিজের চাচাতো, মামাতো ভাইদের সাথেও ঠিকমত কথা বলতে পারত না। তারা বাড়িতে বেড়াতে আসলে খুব সংকোচে তাদের এড়িয়ে চলত। আর তার ছোট্ট খুকি মেয়ে, কত অ্যাডভান্সড! প্রেম শুরু করে দিয়েছে, আর কী সব নোংরা কথা আদান-প্রদান করছে। কতদূর গড়িয়েছে এই প্রেম, কে জানে! রুনা আর ভাবতে পারছে না। তার শরীর গুলিয়ে আসছে। হঠাৎ মোবাইলটা বেজে উঠল। বিপুল সাহেবের ফোন এসেছে।

রিসিভ করতেই বিপুল সাহেব বেশ আমুদে গলায় বলল, 'শোনো, অনেকজনকে তো দাওয়াত দিয়ে

ফেলেছ, বাজেট তো ফেল করবে। ভাগ্যিস গত মাসেই সব উপরি ইনকাম করে রেখেছিলাম, না হলে যে কী হতো! এ মাসে তো আর এসব নেওয়া যায় না। আর শোনো, আরো একটা ভালো খবর আছে।'

রুনা ক্লান্ত গলায় বলল, 'কী ভালো খবর? শেয়ার বাজারে তোমার শেয়ারের দাম বেড়েছে নাকি?'

বিপুল সাহেব হেসে বললেন, 'না, দাম বাড়ে নি। তবে খবরটা ওরকমই, টাকা সম্পর্কিত। একটা ছোট ডিপোজিট ছিল, ওটা সুদসহ দ্বিগুণ হয়েছে। তুমি ঈদ উপলক্ষে তোমার বাবার বাড়িতে গিফট কেনার জন্য টাকা চেয়েছিলে না, সেটা নিও।'

রুনা কোনো কিছুতেই আনন্দ পাচ্ছে না, তবুও খুশি খুশি গলায় বলল, 'খুব ভালো খবর। তা কখন আসছ? আজকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরো।'

বিপুল সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, এই তো রওনা দিয়েছি। আর কিছু কী আনতে হবে?'

রুনা বলল, 'না, আনতে হবে না। তাড়াতাড়ি আসো। ফোনটা রাখি।'

বিকেলেই সব মেহমানরা আসা শুরু করল। ভাবিরা সব হালকা মেক আপ করেছে, রমজান মাসে গাঢ় মেকাপ করা যায় না। এমনভাবে মেকাপ করতে হয় যেন উগ্র না দেখায়, একটা নিষ্পাপ লুক আনতে হয়। অনেকে এরকম লুক আনতে শাড়ির আঁচলটা মাথায় আলতো করে দিয়েছে। কেউ কেউ আবার হিজাব পরে এসেছে। হিজাবের উপর মুক্তার মালা সাজানো, কারো আবার হিরা বসানো সুদৃশ্য পিন লাগানো, কারো আবার সোনার টায়রা হিজাবের উপর ঝলমল করছে, কী সুন্দরই না লাগছে সবাইকে। একজন শুধু আলাদা আর বেমানান, কালো আবায়ায় আপাদমস্তক ঢাকা, হাতে একটা খেজুরের প্যাকেট, দামি গিফটের ভিড়ে খুব বেখাপ্পা লাগছে।

মাগরিবের আযান দেবার আগেই সবাই ইফতার সাজানো প্লেট হাতে নিয়ে ইফতার সেলফি তুলল। কে যেন সবাইকে ট্যাগ করে সাথে সাথে পিক গুলো ফেসবুকে আপলোড করল। পুরো প্রোগ্রামটা খুব ভালোই চলছিল।

খাওয়ার পর আড্ডা চলছিল সাথে চিরকুট চিরকুট খেলা। গল্প, গান আর কৌতুকে ভরপুর আনন্দময়

পরিবেশ। হঠাৎ চিরকুট পেল সেই আবায়া পরিহিত ভাবি। চিরকুটের টপিকস 'বদলে যাও, বদলে দাও।'

ভাবি কী যেন ভেবে বলতে শুরু করলেন, 'আমি আজ একটা গল্প শুনাব। বদলে যাবার গল্প। গত রমজানের ঘটনা, এক সন্ধ্যা বেলায় দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল। দরজা খুলে দেখি একটা ছোট্ট ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচ বছর বয়স হবে, হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ, ভিতরে ছোলা মুড়ি, আধ খাওয়া কয়েকটা পিঁয়াজু। ছেলেটা করুণ স্বরে বলল, 'আম্মা কিছু ছুটা ইফতারি দেবেন? সারাদিন না খাওয়া। আমরা সবাই পানি খেয়ে রোজা রাখছি, আব্বার জ্বর, তিন দিন ধইরা কামে যাইতে পায় না।'

আমার ওর বয়সী একটা ছেলে ছিল, দুই বছর আগে এক দুর্ঘটনায় সে মারা গেছে। আম্মা ডাকটা তে আমি যেন ওর মাঝে আমার সেই ছেলেটা কে খুঁজে পাই। খুব মনোযোগ দিয়ে ওর কথা শুনি। সারা বছর ওরা প্রায় না খেয়েই থাকে। আর রোজা মাসে ওরা ভালো খাবার পায়। কারো কাছে চাইলে কেউ ফেরায় না। ওদের দশ জনের একটা দল আছে। একেকজন একেক বাসায় যায়। তারপর সব এক করে ভাগ করে। তারপর ভাগের ছোট্ট সেই অংশটা পলিথিনে মুড়িয়ে যার যার বাড়িতে যায়। তারপর নিজ-নিজ পরিবারের সাথে নিয়ে সেগুলো খায়।

সেই ছোট্ট ছেলেটার ক্ষুধা আর কষ্টের গল্প আমাকে ছুঁয়ে দিল। কত অপচয় করেছি,কত দামি রেস্টুরেন্টে খেয়েছি, কত খাবার ফেলেছি! কত রমযান পার করেছি, কখনো তো ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করি নি। কখনো কোনো গরিব মিসকিন কে খাওয়াইনি, একটা টাকাও সেভাবে সাদকা করিনি।

আল্লাহ্ আমাকে কত ভালো রেখেছেন। কিন্তু আমি কখনও শুকরিয়া তো করিইনি বরং একের পর এক আল্লাহ্‌র আইন ভেঙেছি, অবাধ্য হয়েছি। সব হারামের মধ্যে ডুবে আছি, তবু আল্লাহ্ তাঁর নিয়ামত থেকে আমাকে বঞ্চিত করেন নি। তারপর, সেই আত্মশুদ্ধির মাসে আমি পাল্টে যাই। রমযানের প্রতিটা রোজায় আমি একটু একটু করে পাল্টাই। পরহেজগার হবার চেষ্টা করি, বেপর্দা থেকে পর্দানশীল হই। মিউজিক, মুভি, টিভির সিরিয়াল সব দেখা বন্ধ করে দেই। ব্যাংকের সুদ খাওয়া ছেড়ে দেই। আমার স্বামীকেও পাল্টাই, উপরি ইনকাম আনতে নিষেধ করি। আলহামদুলিল্লাহ্ আমরা দুইজনেই বদলে যাই।

রমজান মাস তো বদলে যাবার মাস। ট্রেনিং এর মাস। তাকওয়া অর্জনের মাস। আলহামদুলিল্লাহ্ আমরা বদলে যেতে পেরেছিলাম। এই রমজানে নিজেদের আরো ভালো করে বদলানোর চেষ্টা করছি।'

টিকাঃ রমজান মাস বদলে যাবার মাস। পরহেজগারিতা অর্জন করার মাস। অথচ আমরা এই মাসটাকে হেলায় ফেলায় নষ্ট করে থাকে। রোজার বিধান দেওয়া হয়েছে তাকওয়া অর্জনের জন্য। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি, যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হতে পারো, পরহেজগার হতে পারো।'

অথচ এই আত্মশুদ্ধির মাসটাকে আমরা ইফতার পার্টি, হাজারটা মার্কেট ঘুরে কেনাকাটা, চাঁদ রাতে দল বেঁধে মেহেদি উৎসব, ঈদের সাজসজ্জার প্লানসহ আরও কত ইহকালিন এনজয়মেন্টের বস্তু বানিয়ে ফেলেছি। এরই সাথে ব্যবসায়ীরাও এই মাসটাকে পুঁজি করে বিভিন্ন অ্যাডভারটাইজমেন্টের মাধ্যমে এটাকে আরও বর্ণিল করে তোলে। আমরাও তার সাথে গা ভাসিয়ে দেই।

অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা, সে অনুযায়ী কাজ এবং মূর্খতা পরিত্যাগ করল না, তার খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।' তাই উপবাস না করে, গুনাহ মাফ আর তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে আমাদের ঈমান বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে। রমযান মাসে আমদের বদলে যাবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে হবে।

তনুর বাড়ি

তনুদের নতুন বাড়ি হবে। ঢাকা শহরের অদূরে আশুলিয়ায় পাঁচ কাঠা জায়গার উপর বাড়ি করবে। তনুর কত উচ্ছ্বাস। বিশ বছর ভাড়া বাসায় থেকেছে। জীবনের প্রথম দিকে স্বামী সোবহানের সাথে এক রুমের ছোট্ট রুমে থাকত।

মোহাম্মদপুরের ঘিঞ্জি বাড়িটাতে অনেকগুলো রুম। মুখোমুখি ছয়টা রুম। একেবারে কিনারে রান্নাঘর আর টানা বাথরুম। রান্নাঘরে সিরিয়াল দিয়ে রাঁধতে হতো। খুব ভোরে উঠে তনু রান্না করত। ভোরবেলার আরামের ঘুম মাটি করে ঘুমঘুম চোখে সে সবজি কাটত। ডাল আর সবজি ভাজি দিয়ে সকালে ভাত খেয়ে সোবহান বেরিয়ে যেত। সোবহান ছোটোখাটো ব্যবসা করত। সকালে বের হতো আর রাতে ফিরত। সারাটা দিন তনু অপেক্ষা করত। তবুও যেন ভালোবাসা আর নতুন সংসারের আনন্দ ঘিরে থাকত সেই ঘিঞ্জি ঘরের জীবনটায়।

লাইন ধরে গোসল করতে হতো আর শীতকালে গ্যাসের চাপ না থাকায় প্রায়ই আসে পাশের মহিলাদের সাথে রান্নার সিরিয়াল নিয়ে ঝগড়া হতো। এক শীতের সকালে গ্যাসের অভাবে রান্না করতে পারে নি তনু।

সোবহান অভুক্ত পেটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল আর নতুন এক বাসা ঠিক করে ঘরে ফিরেছিল।

তারপর সেই ঘর ছেড়ে তারা দুই রুমের একটা চিলেকোঠার ঘরে উঠেছিল। সেখানে রান্না ঘর আর বাথরুম কারো সাথে শেয়ার করতে হতো না। তনু উৎসাহ নিয়ে যখন যা মনে চায় রাঁধত। বিকেলে ধোঁয়া উঠা মগ ভর্তি চা নিয়ে ছাদের কিনারে বসত। তাজমহল রোডের সেই তিনতলার বাসার পাশেই ছিল বিশাল মাঠ। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সবুজ ঘাসে বাচ্চাদের হুড়োহুড়ি দেখত আর আরাম করে চা-বিস্কুট খেত।

সেখানে তারা তিন বছর ছিল। সবুজ মাঠের লুটোপুটি খাওয়া বাচ্চারা তার বুকে হাহাকার তুলত। বিয়ের পাঁচ বছরেও সে বাচ্চার ডাক শুনতে পায় নি। তারপর সোবহান কে জোরাজুরি করে ডাক্তার দেখিয়েছিল। সোবহানের প্রবলেম ধরা পড়েছিল, তার নাকি স্পার্মের মটিলিটি খুব কম। বাচ্চা হবার সম্ভাবনা নাই। প্রথম ছয়মাস তনু অনেক কেঁদেছিল। বিকেলের সেই নিষ্পাপ শিশুর দলের হাসিও সে আর সহ্য করতে পারত না। সে আর ছাদের কিনারে বসে তাদের খেলা দেখত না। একদিন ইকবাল রোডের বিশাল কাঁচাবাজার থেকে বাজার করে ফেরার পথে সে একটা নতুন স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের অ্যাড দেখেছিল। কৌতূহলবশত সে স্কুলে ঢুঁ মেরেছিল। তারপর কিভাবে যেন সে ঐ স্কুলে জয়েন করে ফেলেছিল।

স্কুলে যেন সে কম সময়ে হেঁটে যেতে পারে সেইজন্য আবার তারা বাসা পাল্টেছিল। এবার তিন রুমের একটা বাসা সে নিজেই পছন্দ করেছিল। বাসাটা ছিল ঠিক স্কুলের পাশেই, ইকবাল রোডে। আটটা-দুইটা স্কুলের পর সে বিকেলে বাচ্চাদের পড়াতো। নিজেকে সব সময় ব্যস্ত রাখত। বাচ্চা না হবার কষ্ট ভুলে থাকত।

বাচ্চা পালক নিতে চেয়েছিল, কিন্তু সোবহান রাজি হয় নি। সে বলেছিল, 'কার না কার রক্তের বাচ্চা। দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষতে চাই না। তার চেয়ে তুমি-আমি বেশ ভালো আছি। আর তোমার স্কুলের সব ছাত্র-ছাত্রীরাই তো তোমার বাচ্চা।'

তনুর যেন ফাঁকা ফাঁকা না লাগে তাই সোবহান সাহেব বাড়ি থেকে একের পর এক ভাস্তা, ভাস্তি, ভাগ্না-ভাগ্নি এনে ঢাকায় পড়ানো শুরু করলেন। বাড়িটা সবসময় মানুষ দিয়ে গমগম করত। তনুও তাদের

পড়াশুনার দেখভাল করত। এক সময় ঐ তিন রুমেও আর জায়গা হয় নি। তাই সোবহান সাহেব নুরজাহান রোডে একটা বাইশ'শ স্কয়ার ফিটের টাইলস ওয়ালা নতুন ফ্ল্যাটে বাসা স্থানান্তরিত করেছিল। তনু নতুন বাসাটা নিজের মতো করে নতুন ফার্নিচার দিয়ে সাজিয়েছিল।

তারপর একে একে সবাই চলে গিয়েছিল। তনু আবার সেই বিশাল ফ্ল্যাটে একা হয়ে গিয়েছিল। বিশ বছরে কত বাসা সে পাল্টিয়েছে। এই মোহাম্মদপুরেই তার জীবনটা ঘুরপাক খেয়েছে। স্কুল, বাজার, বাসা, মোহাম্মদপুরের মাঠ, সব তার খুব আপন, খুব চেনা। এত দিনের চেনা জায়গা ছেড়ে আশুলিয়ায় যেতে তার মন সায় দেয় না। যদিও সেটা তার নিজের বাড়ি হবে।

কতদিনের স্বপ্ন তার একটা বাড়ি হবে, বেড রুমটা বিশাল হবে। বিছানা থেকে নেমেই সবুজ মখমলের কার্পেটে সে পা রাখবে, মনে হবে সবুজ ঘাসে সে হেঁটে বেড়াচ্ছে। দেয়ালটা হবে আকাশী নীল, চোখ বন্ধ করলেই মনে হবে সে মেঘের দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর বারান্দাতে সে ফুলের বাগান করবে। একপাশে টি টেবিল আর দুইটা বেতের ছোট্ট চেয়ার থাকবে। সে আরাম করে চা খাবে আর খবরের কাগজ পড়বে। ছাদে কলম করা ফলগাছ আর সবজি বাগান করবে। তার শখের বাড়িটার নামও সে ঠিক করে রেখেছে, খেলাঘর।

তনু রেডি হয়ে ড্রইয়িং রুমে বসে একা একা তার নিজের বাড়িটার কথা ভাবছিল। আজকে তাদের আশুলিয়ার নতুন বাড়িটার ভিত্তি প্রস্তর দেওয়া হবে। সেই উপলক্ষে অনেক মানুষকে দাওয়াত করা হয়েছে।

সোবহান সাহেব আশুলিয়ায় একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি দিয়েছিল। তার থেকে একটু দূরেই এই জায়গাটা। গ্রামের নাম সাদুল্লাহপুর, গোলাপগ্রাম। এখানে প্রচুর গোলাপের বাগান আছে। সোবহান সাহেবের ডাকে তনু চমকে তাকাল। সোবহান সাহেব বললেন, 'রেডি হয়ে গেছ। বেশ, তাড়াতাড়ি চল। আজকাল শুক্রবারেও বড্ড জ্যাম হয়।'

গাড়িতে বসে তনু আবদারের সুরে বলল, 'আজকে তো আর্কিটেকচার সাহেবও আসবেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাকে তোমার কী দরকার?'

'না, মানে বাড়ি নিয়ে আমার একটা স্বপ্ন ছিল। আমাদের বেডরুমটা যেন একটু বড় হয়, সাথে লাগোয়া বারান্দাটাও যেন একটু প্রশস্ত হয় আর একটা ছোট্ট রিডিং রুম যেন থাকে। ওয়াল কেবিনেট করার মতো স্পেস যেন থাকে। এই আর কী একটু নকশাটা দেখতাম।'

'আচ্ছা, কর। ডিজাইন তো এখনো ফাইন্যাল হয় নি। একটু এদিক সেদিক করা যাবে। কর। সমস্যা নাই। তবে দোতলাতে হাত দিতে পারব কিনা আল্লাহই জানেন। ভিত্তি দিতেই মনে হয় সব চলে যাবে। নিচতলাতে গ্যারেজ আর একটা ইউনিট করব। দেখি কী হয়।'

তনুরা খুব দ্রুত মিরপুর বেড়িবাঁধ দিয়ে বিরুলিয়া ব্রীজ চলে আসে। এই ব্রীজটার জন্য আশুলিয়া অনেক কাছে চলে এসেছে। এই ব্রীজের নিচদিয়ে তুরাগ নদী বয়ে গেছে। এখন শীতকাল। নদী শুকিয়ে নরম মাটি বেরিয়ে এসেছে, তাতে কৃষকেরা বীজতলা করে চারা বুনছে। মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক সাদা পাখি চলে গেল। কী পাখি এগুলো? তনু চেনার চেষ্টা করল। অতিথি পাখি মনে হয়। আহঃ সে যেন তার গ্রামের বাড়ির ভিতরের সেই বাঁশঝাড়, জঙ্গল আর লতাপাতার বুনো গন্ধটা পেল। মনটা তার ভরে গেল। গাড়িটা আক্রান বাজার থেকে ভিতরে ঢুকে গেল। দুই ধারে শুধু গোলাপ বাগান। মাঝে মাঝে লালশাক আর সরিষা ক্ষেত, লাউওয়ের মাচারও দেখা মিলছে। তনুর মুখ হাসিতে ভরে গেল। গাড়ি এসে তাদের জায়গাটার কাছে এসে দাঁড়াল। জঙ্গল সাফ করে একপাশে ইট এনে রাখা হয়েছে। মাটি খোঁড়া হচ্ছে, বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে। তনু মুগ্ধ হয়ে সব দেখল। কতদিন লাগবে বাড়িটা করতে, ছয়মাস না একবছর? এত সুন্দর জায়গায় রাজপ্রাসাদ গড়বে সে। জঙ্গলের রানী হবে সে। ভিত্তি প্রস্তর গাঁথা হলো। দোআ হলো, বিরিয়ানির প্যাকেট নিয়ে স্থানীয়রা সবাই চলে গেল। তারপর বাকি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা আবার গাড়িতে করে ঢাকা দিকে রওনা দিল। পথে নেমে তনু কিছু গোলাপ কিনল। তারপর আক্রাইন বাজার থেকে সব রকমের তাজা শাক কিনে গাড়ি বোঝাই করল। সরিষা শাকের আটিটা সে কোলের মধ্যে নিয়ে বসে থাকল। বারবার ঘ্রাণ নিতে লাগল। মোহাম্মদপুরে থাকার জন্য তার যে টান ছিল তা মুহূর্তেই যেন উবে গেল। কবে সে নতুন বাড়িতে উঠতে পারবে সেই ভাবনাই যেন সে বিভোর হয়ে রইল।

সোবহান সাহেব বললেন, ‘এই বছর শুধু নিচতলাটা করে রাখি। সামনের বছর না হয় দোতলাটাতে হাত দেবো। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যা ইস্টিমেট দিল তাতে আমার জমানো সব টাকা নিচতলাতেই চলে যাবে। দোতলা করতে গেলে ব্যাংক লোন নিতে হবে। আপাতত কোনো লোন নিতে চাইছি না। তুমি কী বলো?’

তনুর স্বপ্নটা যেন ঝিমিয়ে গেল। পরের বছর, সে তো অনেক দেরি। কেবল তো জানুয়ারি চলে। তনু একটু ভেবে বলল, ‘আমার কত শখ ছিল নতুন বাড়িটা নিয়ে। এত দেরি করবে? আমি তো এখানে একটা নতুন স্কুল খুলতে চেয়েছিলাম। আমার মনের মতো একটা স্কুল। মোহাম্মদপুরের স্কুলের পরিচালনা কমিটিকে এখন আর আমার ভালো ঠেকছে না। এখানে মান-সম্মান নিয়ে মনে হয় আর বেশি দিন থাকতে পারব না। তার চেয়ে বরং নিজে থেকে সরে পড়াই ভালো। আমাদের নতুন বাড়ির নিচতলাটা আপাতত স্কুল হিসেবে দাঁড় করাতাম। তারপর আস্তে আস্তে ছাত্র বাড়লে তিনতলা, চারতলাও করে ফেলা যেত। তুমি আমার স্বপ্নে পানি ঢেলে দিলে?’

‘না, পানি ঢালি নাই। এখনো একটা পথ খোলা আছে। তুমি, এক কাজ কর। তোমার জমানো টাকাটা আমাকে দিয়ে দাও। দোতলাটা করে ফেলি আর নিচতলার হাফ ইউনিটের পাঁচটা বড় রুমে আপাতত স্কুলের রুম হিসেবে চালিয়ে নাও।’

‘ঐ টাকাটা তো আমার শেষ বয়সের জন্য রেখেছিলাম। আমাদের তো কোনো সন্তান নাই যে বুড়া বয়সে দেখবে!’

‘আহঃ। এই ব্যাপারটা নিয়ে না কথা বলতে নিষেধ করেছি। তোমার এফডিআর টা ভাঙাতে পারবে কিনা বলো?’

‘আচ্ছা দেখি।’

সোবহান সাহেবের চাপাচাপিতে তনু একসময় তার জমানো ত্রিশ লাখ টাকার পুরোটাই দিয়ে দিল। ছয় মাসের মধ্যে সব কমপ্লিট হয়ে গেল। তনু আগামী শুক্রবারে তার বিশ বছরের ভাড়াটিয়া জীবন শেষ করে বাড়িওয়ালী হবে। নতুন বাড়িতে সব নতুন ফার্নিচার যাবে। সে পুরাতন বই খাতা অতিরিক্ত জিনিস, স্মৃতির

স্তুপ সবই বিক্রি করে দিল। পুরাতন ফার্নিচার গুলো রঙ করে নতুন বানিয়ে ফেলল। তারপর একদিন একাই সে গাড়ি নিয়ে আশুলিয়া চলে গেল। দোতলার কোন রুমে কোনটা বসবে, তা সে ঠিক করবে। সব ফার্নিচারের মাপ জোক নিয়ে এসেছে। মেজারিং টেপও সাথে এনেছে। ঘুরে ঘুরে সব ঠিক করল। তারপর গাড়ি নিয়ে পুরো এলাকাটা ঘুরতে লাগল।

ঘুরতে ঘুরতে একটা শাপলার ঝিল দেখে মুগ্ধ হয়ে সে গাড়ি থামাল। একটা বাচ্চা মেয়ে শাপলা তোলার চেষ্টা করছে। তনুরও বড্ড লোভ হলো। কতদিন সে শাপলা ফুল ছোঁয় না। তনু গাড়ি থেকে নেমে বাচ্চাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুইজন মিলে ঝিলের কাছাকাছি শাপলা তুলে ফেলল, পাড়ের দিকের কিছু পানা ফুল আর কলমী ফুলও তুলল। ফুল তুলতে তুলতে বাচ্চাটার সাথে তার ভাব হয়ে গেল। একটু পর বাচ্চাটার মা পাশে এসে দাঁড়াল। মেয়েটা তরুণী আর দিনে দুপুরে উগ্র সাজে তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। তনু তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা বুঝি আপনার মেয়ে? খুব সুন্দর। কী নাম ওর?'

'ওর আগের নাম রুমকি বেগম। এখনকার নাম হচ্চে গিয়া সুহা চৌধুরী। ওর নতুন বাপে নাম রাখছে। নিজের নামের সাথে মেলায়ে রাখছে।'

'ওর আগের বাবা কি মারা গেছেন?'

'না, মরে নাই। আমিই ছাইড়া দেছি।'

'কেন? খারাপ লোক ছিল বুঝি?'

'না, অত খারাপ ছেল না, তয় আমি ছাইড়া দেছি। গার্মেন্টেসের মালিক আমাক পছন্দ করল। আমিও ঝুইল্যা পড়লাম। এখন আর গার্মেন্টসে গাধার খাটনি খাটি না। সাইজ্যা গুইজ্যা বইস্যা থাকি আর ঘুইর্যা বেড়াই। দুপুর বেলা তিনি আসেন, আমি ভাত বাইড়া খাওয়াই, তারপর তিনি খাইয়্যা ঘুমায়, আমারে নিয়া-- । বিকেল হইলে পরে বড় বিবির কাছে চইল্যা যায়। হেই তো তারে-- দিতে পারে না। বুইড়া বেটি আর কী। তা আপনে এখানে কী করেন?'

মেয়েটার সাজসজ্জা যেমন উগ্র কথাবার্তাও তেমন নোংরা। গা দুলিয়ে কী রকম অবলীলায় নোংরা ভঙ্গিতে

কথা বলে যাচ্ছে। এই মেয়েকে যে কোন লুচ্চা আনকালর্চাড লোক বিয়ে করেছে কে জানে। দুই তিন মিনিট কথা বললেই গা গুলিয়ে আসে। কী নোংরা অঙ্গভঙ্গি! ছিঃ! মানুষের যে কী রুচি! তনু ঘৃণা লুকিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'আমি এখানে ঘুরতে এসেছি। এখানে নতুন বাড়ি করেছি। তাই জায়গাটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখছি আর কী!'

'ও, এইহানে তো দেহনের কিছুই নাই। খালি গার্মেন্টস আর গার্মেন্টস। ফাঁকে ফাঁকে কিছু বিল-ঝিল আছে আর কী! তেনার গার্মেন্টসটা সবচেয়ে নামকরা, বুঝছেন, আফা মেলা মানষে সেখানে কাজ করে। যারা আমাক আগে দেখবার পারত না, তারাই একন আমাক তেল দিয়া চলে। আমার কথায় তাগো চাকরি নট হইয়া যাবার পারে, বুঝছেন। ঐ যে চারমাথা আচে না, ওটার ডান দেকের গার্মেন্টস টা তেনার।'

তনুর মাথাটা হঠাৎ চক্কর দিয়ে উঠল। ডান দিকের টা তো সোবহানের। তনু উত্তেজনা লুকিয়ে ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম সেই গার্মেন্টসের?'

'রলেক্স'

'কী? তোমার স্বামীর নাম কী?'

'ক্যা, রলেক্সের মালিক সোবহান চৌধুরী। আফনে চেনেন নাকি? মুখটা ঐরকম করচেন ক্যা?'

তনু বিস্ময়ে ফেটে পড়ল। তারপর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বুদ্ধি বের করে সেই মহিলা মানে শেফালী বেগমের বাড়িতে ঘুরে এল। আশেপাশের লোকজনের সাথে কথা বলল। অবশেষে সে সোবহানের দ্বিতীয় বিয়ের সত্যতা পেল। নিঃসন্তান তনু চাপা কষ্ট আর ক্ষোভ নিয়ে মোহাম্মদপুরে ফিরল। রাতে সোবহানকে চেপে ধরল, 'তুমি কেন এমনটা করলে?'

সোবহান সাহেব নির্লিপ্ত গলায় বললেন, 'আমার বাবা ডাক শুনতে ইচ্ছে করছিল, তাই বাচ্চাসহ মহিলা বিয়ে করেছি। কোনো সমস্যা? আমি তো আর খারাপ কিছু করি নি। তোমাকে তো ঠকাইনি। তোমাকে বড় বউয়ের মর্যাদা দিয়েছি। ঐ বাচ্চাটা আমাকে বাবা ডেকেছে। আমি তাকে এডপ্ট করেছি। সে এখন আমার

মেয়ে ।’

তনু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ‘তোমার বাবা ডাক শুনতে ইচ্ছে করছে, না? আমি তো অনেক আগেই বাচ্চা এডপ্ট করতে চেয়েছিলাম, তখন করলে না কেন? বুড়া বয়সে ভিমরতি ধরেছে, না? বিয়া করার খায়েশ হয়েছিল, লুচ্চামি করতে ইচ্ছে করছিল । তা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলার তো কোনো মানে হয় না ।’

সোবহান সাহেব চোখ রাঙিয়ে মারমুখী হয়ে বললেন, ‘বিয়ে করেছি, তো কী হয়েছে । খারাপ কিছু তো আর করি নি? তোমকে তো দোতলাটা দিয়েই দিলাম । রানীর মতো থাকবে । সমস্যা কী? আর শেফালী নিচতলায় থাকবে । সুহাকে আমি মেয়ের স্বীকৃতি দিয়েছি, ও দোতলা নিচতলা দুইখানেই থাকবে । এখানে তো কোনো সমস্যা দেখছি না?’

‘দোতলাটা তুমি আমাকে দয়া করে দিয়েছ? আমার টাকা দিয়ে দোতলা করেছ, এখন বলছ সেটা তোমার দয়ার?’

সোবহান সাহেব গরম দেখালেন । ডাল-ভাত খাবার মতো তিনি একটা ঘটনা ঘটিয়েছেন এমন ভাব নিয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গেলেন । ‘জানলেই যখন তো এখন থেকে আর লুকোচুরি করে কি লাভ, এখন থেকে রাতেও আমি ওদের কাছে থাকব । বাবা ছাড়া তো বাচ্চাটা অসহায়বোধ করছে । দরজাটা লক করে দিও, আমি গেলাম ।’

দড়াম করে দরজাটা চাপিয়ে দিয়ে সোবহান সাহেব চলে গেলেন । তনুর তখন পাগলপ্রায় অবস্থা । সন্তান জন্মদানে অক্ষম সোবহানের সাথে সে কত হাহাকার নিয়ে সংসার করেছে । তার যৌবনে সে সোবহানকে ডিভোর্স দিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারত, কিন্তু সে যায় নি । তার পরিবারের লোকজন ,বান্ধবী আর আত্মীয়স্বজন সবাই তাকে সোবহানকে ছেড়ে দিয়ে নতুন করে ঘর-সংসার করতে বলেছিল । মা ডাক শুনার তীব্র কষ্ট তো তারও ছিল । অথচ শারীরিক সমস্যা সোবহানের ছিল, মানুষ না জেনে তাকে কত কথা শুনাতো । তবুও তো কখনো সে সোবহানকে ডিভোর্সের কথা একবারও ভাবে নি । সোবহানকে ভালোবেসে মাটি কামড়ে পড়ে ছিল । আর সোবহান, একি করল! আজ সেই কষ্টের প্রতিদান এভাবে দিল । তনুর

ভিতরের চাপা কষ্ট, রাগ অভিমান সব বৃষ্টি হয়ে নামল। বিছানায় বালিশ চেপে গুমরে কেঁদে উঠল।

নিঃস্ব তনু কাপড়চোপড় গুছিয়ে পরেরদিন বাবার বাড়ি রংপুর চলে গেল। বাবা আর বড় ভাইয়ের কাছে আশ্রয় চাইল। বাবার পাঁচ কাঠা জায়গার উপর চারতলা বাড়ি। বাড়ি করতে ব্যাংক লোন নিতে হয়েছে। তাই বাবা জায়গাটা বড় ভাইয়ের নামে লিখে দিয়েছিলেন। কারণ ছেলে ভালো চাকরি করত। স্যালারীর বিপরীতে ব্যাংক টাকা দিয়েছিল। তনু বাবার কাছে ভাইয়ের অর্ধেক জায়গা দাবি করল। বাড়ির কিছু অংশ নিজের নামে পেতে চাইল। আর পরের আশ্রিতা সে হবে না। বাবা বেঁচে থাকতেই হিস্যা বুঝে নিতে হবে। বাবা মারা গেলে ভাইয়ের চেহারাও হয়ত পাল্টে যাবে। সে আর কোনো পুরুষকেই বিশ্বাস করে না। আত্মমর্যাদা নিয়ে বাকিটা জীবন পার করতে চায়। শেষ পর্যন্ত তনুর চাপাচাপিতে বড় ভাই রংপুর শহরের অদূরে একটা নিচু জায়গা তনুর নামে লিখে দিল। তারপর আয়েশ করে বসে উদার ভঙ্গিতে বলল, 'দেখলি তোকে আমরা প্রাপ্য অংশটাই দিয়ে দিলাম। একটুও ঠকালাম না।'

তনু ভ্রু জোড়া কপালে উঠিয়ে বলল, 'ঠকালে না? আমি কি আমার বাবার সম্পূর্ণ সম্পত্তির অর্ধেক পেলাম?'

'পেলিই তো। এই যে পাঁচ কাঠা জায়গার অর্ধেক পেলি। আড়াই কাঠা জায়গা কম কথা? কেউ কোনো দিন দেয়, শুনেছিস? আমাদের চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো বোনেরা কি পেয়েছে? আমাদের ফুফুরা, দাদিরা কি কেউ পেয়েছে? শুধু আমি বলে দয়া করলাম, বুঝলি।'

'আহঃ তোমার এত দয়া! পাঁচতলা বাড়িটার কোনো অংশ কি তুমি আমাকে দিয়েছ? এখান থেকে কি আমি কিছু পেয়েছি? একটা ফ্ল্যাট তো আমার প্রাপ্য ছিল। এই জায়গাটা তো আব্বার ছিল। বাড়ি করতেও তো আব্বা গ্রামের জমি বিক্রি করে টাকা দিয়েছে। তোমার ব্যাংক লোনের টাকা ছাড়া আর কোনো টাকা কি এই বাড়ি করতে লাগে নাই? আমার আব্বার বাড়িতে আমি কেন জায়গা পাব না?'

বড় ভাই রাগ দেখিয়ে বলল, 'তুই বেশি চাস, বুঝলি? মেয়েরা কোনো দিন বাড়ির ভাগ পায়? বাড়ি তো শুধু ছেলেরাই পায়, এটাই তো নিয়ম। দয়া দেখিয়ে তোকে জায়গা দিয়েছি, তারপরও বেশি চাস কেন রে?

এত লোভী কেন তুই? এজন্যই তো সোবহান আরেকটা বিয়ে করল বোধ হয়।'

তনু লজ্জায় ঘৃণায় কুঁকড়ে গেল। তার বৃদ্ধ বাবাও ভাইয়ের সাথে মাথা নাড়ল। শেষ বয়সে তো ছেলেই দেখবে, ছেলেকে চটানো ঠিক হবে না ভেবে তনুর বাবা-মা দুইজনেই ছেলের পক্ষ নিল।

অপমানিত নিঃস্ব তনু পরেরদিন আবার ঢাকায় রওনা দিল। যাবার সময় অভিমানী কণ্ঠে বলল, 'আমাকে তোমরা ঠকালে। আমি আর কখনো এ বাড়িতে ফিরব না। যেখানে আমার কোনো অধিকার নেই, সেখানে আমি আর আসব না। বিচার দিবসে তোমাদেরকে অবশ্যই আমার মুখোমুখি হতে হবে। জুলুম করে যে জায়গা তোমরা নিয়ে নিলে তার জন্য অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।'

পুরোটা রাস্তা সে কাঁদতে কাঁদতে ঢাকায় ফিরল। এই বিশাল দুনিয়ায় তার একটা থাকার জায়গাও নেই। কোথায় যাবে, কোথায় উঠবে সে জানে না। মুসাফির হয়ে পৃথিবীতে এসেছিল, আবার মুসাফির হয়েই হয়ত পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। থাক, এ পৃথিবীতে তার কোনো ঘর, কোনো বাড়ির দরকার নাই। জান্নাতে যেন প্রিয় রবের পাশে তার একটা চিরস্থায়ী ঘর হয় যেটা শুধুই তার হবে, কেউ তা দাবি করতে পারবে না, কেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারবে না। সে মজলুম নির্যাতিতা আছিয়া (আঃ) এর মতো দোআ করতে থাকে, 'হে আমার রব, আমার জন্য জান্নাতে তোমার কাছে একটি ঘর বানিয়ে দিও।' (সূরা আত-তাহরীম : ১১)

টিকাঃ আমাদের সমাজের অধিকাংশ নারীদেরই নিজের কোনো ঘর তো দূরে থাক নিজের কোনো সম্পদও নাই। অথচ মুসলিম নারীরা অসহায়, সম্পদহীন নয়। কারণ ইসলামে নারীদের সুন্দর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। বিয়ের সময়ই দেনমোহর পুরোটাই আদায়ের কথা বলা হয়েছে।

বিয়ের দেনমোহর বা মোহরানা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘আর স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টচিত্তে’ (সূরা নিসাঃ ৪)। বিয়ের মাধ্যমেই নারী অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠে। এরপর পিতার সম্পদ থেকেও সে সম্পদের অধিকারী হয়। পিতার পুরো সম্পদের হিসেব থেকে ভাইয়ের অর্ধেক তারা পায়। ভাই না থাকলে অর্ধেক পায় অর্থাৎ যদি সে একা হয়। দুই বা ততোধিক বোন হলে সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ পায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালা বলেন, ‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেনঃ একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দুই এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মারা যায় এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক।’ (সূরা নিসাঃ ১১)

স্বামীর সম্পদেও নারীর অংশ রয়েছে। যদি স্বামী সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় তবে স্ত্রী এক-চতুর্তাংশ পাবে আর যদি সন্তান থাকে তবে এক-অষ্টমাংশ পাবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালা বলেন, ‘স্ত্রীদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়্যতের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। (সূরা নিসা : ১২)’

স্বাদ

কোরবান আলীর মেজাজটা হঠাৎ চড়ে গেল। আগামীকাল মসজিদ কমিটির নির্বাচন। তিনি চেয়ারম্যান পদে দাঁড়িয়েছেন। এ সময় মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়। কিন্তু তিনি কোনো ভাবেই রাগ কন্ট্রোল করতে পারছেন না। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন তিন বছর হলো। চাকরিতে বসগিরি করেছেন দীর্ঘ বিশ বছর, বাড়িতেও তিনি সিংহ পুরুষের মতো স্ত্রী আর সন্তানদের উপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন। অবসর নেবার পর থেকে তিনি ক্ষমতাহীন হয়ে গেছেন। দুই ছেলে বিয়ে থা করে ঢাকায় স্থায়ী হয়েছে। মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেছে।

কোরবান আলী আর রহিমা বেগম, দুইজনের নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। পেনশনের টাকা, ছেলেদের টাকা দিয়ে আরামে থাকার কথা, আল্লাহ্‌র যিকির করে সময় কাটানোর কথা। কিন্তু নীরবতা তার ভালো লাগে না। হুমকি ধমকি, চিৎকার চেঁচামেচি না করলে তার ভালো লাগে না। ভিতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ক্ষমতার স্বাদ না পেলে তার মাথা ঠিক থাকে না।

বাড়িতে তার স্ত্রী রহিমা বেগম প্যারালাইসিস হয়ে পড়ে আছেন। তেমন উঠতে বসতে পারে না। পঞ্চাশ বছর যার কাছ থেকে সেবা নিয়েছেন, সেবাদাসীর মতো যাকে খাটিয়ে মেরেছেন, তিনি আজ বিছানায় দিনের পর দিন পড়ে আছে। জীবনে তিনি এক গ্লাস পানি ঢেলে খান নি, কাপড় কাচেন নি, অথচ তাকে এখন স্ত্রীর

মুখে খাবার তুলে খাইয়ে দিতে হচ্ছে। নিজের আর স্ত্রীর কাপড়ও ধুতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে ছুটা কাজের মেয়েটা না আসলে রান্না ঘরের কাজও করতে হয়। তার জীবনটা এখন সিংহ থেকে একটা মেনী বিড়ালের মতো হয়ে গেছে। বাড়িতে তিনি জোরে কথা পর্যন্ত বলতে পারেন না। ডাক্তারের রেস্ট্রিকশন আছে। কোনো অবস্থাতেই রহিমা বেগমকে উত্তেজিত করা যাবে না। আরেকবার স্ট্রোক করলে আর নাকি বাঁচানো যাবে না।

শেষ পর্যন্ত কোরবান আলীর ভিতরের রাগটা বের হয়েই গেল। মসজিদের একপাশে একটা ছোট্ট লাইব্রেরি আছে। বিভিন্ন রকম বইয়ে ভরপুর চারটা শেলফ। মুসুল্লিরা পড়ার পর ঠিকমত সাজিয়ে রেখে যায় না। কুরআন, হাদিসের বই সব উল্টা পাল্টা করে রেখে যায়। মসজিদের ইমাম সাহেবের ছেলে আব্দুল্লাহ লাইব্রেরিটা গুছাচ্ছিল। তিনি লাইব্রেরিতে ঢোকার সময় খেয়াল করলেন, ছেলেটা তাকে দেখে একটা শেলফের আড়ালে লুকালো। তার অনুমতি না নিয়েই ছেলেটা মাঝে মাঝে বই গুছায়, তাকে ঠিকমত সালাম দেয় না। তার মেজাজ চড়ে গেল। এটা একটা বেআদব ছেলে।

তিনি হুংকার দিয়ে বললেন, 'অ্যাই ছোকড়া, এদিক আয়। আমাকে দেখে লুকালি কেন? বেআদব কোথাকার। আজকে তোর কান বরাবর থাবড়া মেরে বেয়াদবি ছুটিয়ে দেবো, বুঝলি। আমার টাকার মসজিদ আর আমাকে সম্মান দিতে জানিস না। এদিক আয়, বেআদব।'

'চাচা, আমি আপনাকে খেয়াল করি নি, সত্যি বলছি। খেয়াল করলে অবশ্যই সালাম দিতাম। আপনি আমাকে ভুল বুঝতেছেন।'

'অ্যাই, কে তোর চাচা, স্যার বল, স্যার। বড়দের সম্মান করা শিখিস নি। তোর বাপ যেমন বেআদব তুইও তেমন বেআদব।'

মসজিদের ভিতর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে আগত মুসুল্লিরা দৌড়ে এসে থামানোর চেষ্টা করলেন। মুসুল্লিদের মধ্যে একজন ঘাড় ত্যাড়া লোক ছিল। তিনি আব্দুল্লাহর পক্ষ নিয়ে ইচ্ছেমত কোরবান আলীকে অপমান করলেন।

অপমানিত কোরবান আলী রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বাড়ি ফিরলেন। বাসায় ফিরে মেজাজ আরও খারাপ হয়ে

গেল। ছোট ছেলে আরমান আর তার বউ বাচ্চা এসেছে। আরমান কাছে এসে বলল, 'আব্বা, আপনাকে এত পেরেশান দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ নাকি? মসজিদ থেকে চলে এলেন নাকি? এখন তো আসরের জামাত হবে। আমি তো মসজিদেই যাচ্ছিলাম।'

কোরবান আলী বিরক্তিমাখা কণ্ঠে বললেন, 'আহঃ অত কথা বলো না তো। তুমি যেতে চাচ্ছ, যাও। আমাকে নিয়ে অত মাথা ঘামাতে হবে না।'

আরমান মন খারাপ করে মসজিদে চলে গেল। আরমানের ছেলেটা বাবার সাথে বাহিরে যাবার জন্য ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদছে আর হাত-পা ছুঁড়ে জেদ করছে। ড্রয়িং রুমের কার্পেটে গড়াগড়ি করে কাঁদতে কাঁদতে প্রস্রাব করে দিল। টেবিলের উপর সাজানো বইগুলো মেঝেতে ছিটালো। ফুলদানীর ফুল গুলো সব ছড়িয়ে দিল। এসব দেখে তার মেজাজ সপ্তমে উঠল। তিনি চেঁচালেন, 'বউমা, ও বউমা, আরিয়ানকে নিয়ে যাও। প্রস্রাব করে তো কার্পেটটা শেষ করে দিল। ঘরটার কী করে ফেলল, দেখো। আজকে রাতে মসজিদ কমিটির লোকজনেরা আসবে, খাবে। আর রুমটার একি অবস্থা করে দিয়েছে দস্যি ছেলেটা।'

আরিয়ানের মা যয়নব হন্তদন্ত হয়ে রুমে ঢুকল। কোরবান আলী দাঁত খিচিয়ে বলল, 'সারাদিন কী এমন কর, শুনি? একটা বাচ্চাও সামলাতে পারো না?'

যয়নব চুপ থেকে সব পরিষ্কার করল। কার্পেটটা বাথরুমে যেয়ে ধুয়ে রোদে দিল। যয়নব শ্বশুর বাড়িতে সাধারণত আসতে চায় না। শ্বশুরের আচরণ সে সহ্য করতে পারে না। আজকে দাওয়াত দিয়েছে বলে আরমান তাকে জোর করে ঢাকা থেকে গাজীপুর এনেছে। সকালে এসেই ঘর দোর সব পরিষ্কার করেছে, রান্নার কাটা বাছা, মসলা বাটা সব নিজ হাতে করেছে। ছুটা কাজের মেয়েটাকে দিয়ে একগাদা কাপড় কাঁচিয়েছে। তারপর দুইজন মিলে সেগুলো ছাদে শুকাতে দিয়েছে। এত কাজের ভিড়ে বাচ্চাটাকে খাইয়েও দিতে পারে নি, নিজেও খায় নি। কাজ করতে করতে বিকেল হয়ে গেল। অথচ শ্বশুর তার প্রশংসা তো করলই না, উল্টো বকা ঝকা করে মনটাই ভেঙে দিল।

শ্বশুর কোরবান আলীকে যয়নব প্রচণ্ড ঘৃণা করে। লোকটা সব সময় সম্মান পাওয়ার তীব্র নেশায় বুঁদ হয়ে

থাকে। কিন্তু সে কখনো তেল দিতে পারে না। তেল দেওয়া, মুখের সামনে প্রশংসা করা আল্লাহ্ যেমন পছন্দ করেন না, সেও পছন্দ করে না।

রাতে কোরবান আলীর বাড়িতে ভোজ হলো। তিনি ঘরের লোকের সাথে যেরকম কুৎসিত আচরণ করেন, বাহিরের লোকের সামনে ঠিক তার উল্টো। এলাকার চেয়ারম্যান, উকিল, ডাক্তার, স্কুল, কলেজের শিক্ষকসহ আরো গণ্যমান্য মানুষ, সব মিলিয়ে প্রায় বিশজন মানুষ চেটেপুটে খেয়ে গেল। কোরবান আলী তাদের সাথে হাত কচলিয়ে বিগলিত হাসি হেসে কথা বললেন। তিনি চাকরির প্রথম জীবনে চাটুকার এক কর্মচারী ছিলেন। এরপর শেষ বিশ বছর বস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে রিটায়ার্ড করেন। চাটু, তোষামোদ যেমন পছন্দ করেন ঠিক তেমনি প্রয়োজনে সেটা ব্যবহারও করতে পারেন।

পরেরদিন নির্বাচন হলো। তিনি মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হলেন। মসজিদের ইমাম সাহেব তাকে এড়িয়ে চলা শুরু করল। ঠিকমত খুতবায় তার তোষামোদ করে না। মসজিদে কোরবান আলী একটা এসি লাগালেন। অথচ খুতবায় সেটা ইমাম সাহেব উল্লেখ করলেন না। মোনাজাতেও তার নাম ধরে দোআ করে না। ভিতরের ক্ষোভটা কোরবান আলী পুষে রাখলেন। রমজান মাস এল। একদিন তারাবীর নামাজের পর তিনি মুসুল্লিদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘সম্মানিত মুসুল্লি ভাইয়েরা আমার, এই ইমাম সাহেব আপনাদের কয় রাকআত তারাবী পড়িয়েছেন?’

মুসুল্লিরা সমস্বরে বললেন, ‘কেন বিশ রাকআত পড়িয়েছে।’

কোরবান আলী মুচকি হেসে বললেন, ‘এই ইমাম সাহেব, আপনি উঠেন। আপনি জানেন তারাবীর নামাজ কয় রাকআত?’

ইমাম সাহেব চুপ হয়ে যান। বিপদ আসন্ন টের পান। কোরবান আলী আবার চেঁচিয়ে বললেন, ‘কী ব্যাপার, কথা বলছেন না যে? এত বছর আমাদের ভুল পড়িয়েছেন। এখন তো ধরা খেলেন না?’

‘কী ভুল পড়ালাম? তারাবীর নামাজ ৮,১২, ২০ রাকআত সবই পড়া যায়।’

‘তা এতদিন শুধু ২০ রাকআত পড়ালেন যে। এখানে কত বৃদ্ধ মানুষ নামাজ পড়ে, তাদের কষ্ট হয়

জেনেও কোনো দিন তো ৮ রাকআত পড়ালেন না? ২০ রাকআত পড়ানোর দলিল বলেন।'

'দলিল তো জানি না। হাদিস নাম্বার তো মুখস্ত নাই। তবে বই দেখে বের করে দিতে পারব।'

'দেখছেন, সবাই দেখছেন, এই ইমাম কিছুই জানে না। কয় রাকআত পড়ায় তার দলিল পর্যন্ত জানে না। আপনার মতো মূর্খ লোককে তো ইমাম হিসেবে আর রাখা যায় না।'

'আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি। আমার রিযিকের অভাব হবে না।'

ইমাম সাহেব মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন। মাসের মাঝখানে তার চাকরি চলে গেল। সামান্য চার হাজার টাকা পান। দুই ঈদের নামাজ পড়িয়ে যে বাড়তি টাকা পান তা দিয়ে একটু একটু করে সারা বছরের অতিরিক্ত খরচটা চালান। মসজিদের ইমামতির টাকা দিয়ে কোনো মতে সংসার চালান। ঘরে তার বৃদ্ধা মা,স্ত্রী, চার বাচ্চা, বিধবা বোন, তিন ভাগ্না-ভাগ্নিসহ মোট দশজনের খরচ চালাতে হয়। বাচ্চাগুলোকে নিয়ে তিনি নিদারুণ কষ্টে পড়বেন। তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। তার মন থেকে দোআ বের হয়ে আসল, 'আল্লাহ্, তুমি এই জালিমকে শাস্তি দিও। তার আত্মঅহঙ্কার আর বড়ত্বের শাস্তি দিও। তার সম্মান তুমি মাটির সাথে মিশিয়ে দিও।'

পাঁচ বছর পরের কথা। কোরবান আলীর উল্টা-পাল্টা আচরণে মসজিদ কমিটির লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তারপর একজন ঘাড় ত্যাড়া কমিটির মেম্বার বুদ্ধি খাটিয়ে তাকে পাগল প্রমাণিত করে মসজিদ থেকে বের করে দিল। তার স্ত্রী রহিমা বেগমও সেই বছর মারা গেলেন। ছেলে মেয়েরাও তেমন আর কাছে ঘেঁষে না। ঢাকায় ছেলেদের সাথেও তিনি থাকতে পারেন না। বউরা তাকে সেভাবে সম্মান করে না। তার চিৎকার চেঁচামেচি বাচ্চারা শিখবে সেই ভয়ে কোনো ছেলে তাকে ঠিক সেভাবে ডাকে না। তিনি এখন সম্পূর্ণ একা। কাজের মেয়েটাও মাসের বেশির ভাগ দিন আসে না। ঘরে খাবারের স্তুপ জমে গেছে। বাসি খাবারের গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। তিনি বালতি ভর্তি করে সব খাবার নিয়ে ভাগাড়ের দিকে গেলেন। সেখানে চারটা কুকুর চিৎকার করছে। একটা বড় হাড্ডির জন্য কামড়া কামড়ি করছে। তিনি উচ্ছিষ্ট খাবার গুলো ফেলে দিয়ে কুকুর গুলোকে 'আহ, আহ, তু তু' শব্দ করে ডাকলেন। কুকুর গুলো সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই করল না।

ক্ষমতার হাড্ডির স্বাদ যে অনেক। এই স্বাদ যে তার চিরচেনা।

টিকাঃ আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষেরাই সম্পদ, সম্মান, আত্মস্বীকৃতি আর ক্ষমতাকে ভালোবাসে। সম্পদ, সম্মান আর অর্থবিত্তের পিছনে ছুটে বেড়ায়। মসজিদ, মাদ্রাসার, দান-সাদকার ইবাদতের মতো কাজেও বড়ত্ব দেখাতে পছন্দ করে। শুধু স্বীকৃতি পাবার বাসনায় ইবলিশ বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। তার অহঙ্কার, আত্মগরিমা তাকে শয়তানে পরিণত করেছিল। আজও মানুষেরা সেই শয়তানেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছে। ক্ষমতা আর স্বীকৃতির লড়াই এ আজ তারা অন্ধ। অথচ একমাত্র আল্লাহই পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং প্রবল পরাক্রমশালী। সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশালী এবং ক্ষমতার নিরঙ্কুশ মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দেন আবার কেড়েও নেন। যাকে ইচ্ছে তাকে সম্মানিত করেন আবার অপমানিতও করেন।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে, ‘বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমান কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।’ (সূরা আল ইমরান : ২৬)

কিন্তু সম্পদ, আভিজাত্য আর ক্ষমতার লোভে মানুষেরা অন্ধ হয়ে ছুটতে থাকে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) বলেন, ‘সম্পদ ও আভিজাত্যের প্রতি মানুষের লোভ তার দ্বীনের যে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে, বকরীর পালে ছেড়ে দেয়া দু’টি ক্ষুধার্ত নেকড়েও বকরীর পালকে তত ক্ষতি করতে পারে না।’ (তিরমিযী ১৯৩৫/২৩৭৬, মিশকাত ৫১৮২) কবরে না যাওয়া পর্যন্ত মানুষ ছুটতেই থাকে মিথ্যা অহমিকা, সম্মান আর ক্ষমতার লোভে।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে, ‘ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য ও অহঙ্কার তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না কবরে পৌঁছে যাও ।’ (সূরা আত-তাকাসুরঃ ১)

প্রথা ভাঙবেই

কাকটা কেমন যেন ডাকছে। কা কা শব্দটা বুকের ভিতর ধাক্কা লাগলো। বাম চোখের পাতাটা কেঁপে উঠছে। কোনো খারাপ কিছু ঘটল না তো। মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। শেফালী বেগম খপ করে ফোনটা রিসিভ করে কানে ধরলেন,

'আস্‌সালামু আলাইকুম আম্মা, ভালো আছেন?'

'অলাইকুমুসসালাম, কে? মানিক? এই সময়ে, ভালোই আছি। তুই কেমন আছিস, বাবা? হঠাৎ এই সময়ে ফোন দিলি যে? কোন খারাপ কিছু হয় নাই তো?'

'তুমি সব সময় এত খারাপ চিন্তা কর কেন মা?'

'না, বাম চোঁখের পাতাটা কাঁপল তো, তাই মনে হল।'

'তোমার তো শুধু চোঁখের পাতা কাঁপে না মা, তোমার হাতও মাঝে মাঝে কাঁপে। তোমার তো পারকিনসন ডিজিস আছে। এ রোগে এমনই হয়। ঔষধ ঠিকমত খাও। খারাপ কোন খবর না, ভালো একটা খবর দেবার জন্য ফোন দিলাম। আমার প্রমোশন হয়েছে মা।'

'আলহামদুলিল্লাহ্, খুব ভালো খবর বাবা। আমি এই খুশিতে একটা মিলাদ পড়ায় নেই। ঠিক আছে?'

'কিছু হলেই খালি খাবার উৎসব করতে চাও, কেন মা? তার চেয়ে বরং গোপনে কোন মিসকিনকে কিছু দিও। আল্লাহ্ আমার রিজিক প্রসারিত করে দিলেন, শুকরিয়া স্বরূপ দান করতে চাই, মা। তবে সেটা গোপনে।'

'আহ্! গোপনে কেন? তোর প্রমোশন হইছে, ভালো রোজগার করবি, সবাইকে জানাব না। আমি ধুম ধাম করে খাসী জবাই দিব, মিলাদ পড়াব। তোর উল্টা হাদিস আমাকে শুনাবি না কিন্তু বুঝলি?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা নিয়ে পরে কথা বলব। এখন রাখি মা, দোআ কর। অফিস থেকে বের হবো।'

ফোনটা রেখে শেফালী বেগম হাঁটতে লাগলেন। পাশাপাশি দুইটা বাড়ি। ডানেরটা বড় ভাসুরের আর বামেরটা তার দেবরের। ওদের বাড়িতে গিয়ে খবরটা বলবে বলে হাঁটা দিলেন। ডানের দিকেই আগে গেলেন। বড় ভাসুর মোতালেব মিয়া, এই গ্রামের চেয়ারম্যান। তার প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক। আজকে তাদের বাড়িতে বিকেলে মিলাদ পড়ানো হবে। মোতালেব মিয়ার ছোট ছেলে এবার এস.এস.সি পরীক্ষা দেবে। তাই দোআর অনুষ্ঠান করা হয়েছে। শেফালী বেগমের শ্বশুর গত বছর মারা গেছেন। চল্লিশ তম দিনে সাতটি গরু দিয়ে বিশাল চল্লিশার অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। দাদার চল্লিশায় মানিক একটা টাকাও দেয় নি। সব নাতি-নাতনীরা টাকা দিয়েছিল, সাত গ্রামের মানুষ হল্লা করতে করতে এসে কলাপাতায় করে চিকন চালের ভাত, ঝাল গরুর গোশত আর আটার ডাল তৃপ্তি করে খেয়ে দেয়ে মোতালেব মিয়ার প্রশংসা করতে করতে চলে গেছে। মোতালেব মিয়া উৎসব করতে ভালোবাসেন। তার দুই ছেলের ভাস্তা-ভাস্তির, ভাগ্না, ভাগ্নির জন্মদিন,আকিকা, মুখে ভাত, বিয়ে ধুমধাম করে উদযাপন করে আসছেন। শুধু আনন্দেই না, বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর তিনদিন, সাতদিন, চল্লিশা, ফতেহা মৃত্যু বার্ষিকী সবটাতেই অনুষ্ঠান করে আসছেন। চেয়ারম্যান

মানুষ, টাকার অভাব নাই। দুই হাতে টাকা ওড়ান। মানুষের মুখে তার প্রশংসা ছড়াবে। এটাও মনে প্রাণে চান। তাই মাঝে মধ্যে টাকা ধার করে হলেও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করে থাকেন।

মোতালেব মিয়া ভাস্তা মানিককে তেমন পছন্দ করেন না। মানিক সব ধরনের অনুষ্ঠানের বিপক্ষে। এসব অনুষ্ঠানে টাকা তো দেয় না, উল্টো পন্ড করার চেষ্টা করে। নতুন নতুন হাদিস শোনায়। বাপ দাদার পালন করা সব প্রথা ভাঙার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। দাদা দাদির মৃত্যুবার্ষিকীতে সবাই আসে। সব আত্মীয়স্বজন মিলে প্রায় একশত জন হয়। কিন্তু সে আসে না, টাকা দিয়ে সাহায্যও করে না। গত রমজানের ছুটিতে এসে সে মসজিদের মুসল্লিদের নিয়ে উল্টা-পাল্টা তালিম করেছে। অনেকে বুঝেছে মসজিদের ইমাম সাহেবও মানিকের অনুসারী হয়ে গেছে। মোতালেব মিয়ার মান-সম্মান অনেকটাই কমে যাচ্ছে। তাই তিনি মানিককে একটুও সহ্য করতে পারেন না। শেফালী বেগম এসব জেনেও ভাসুর মোতালেব মিয়ার কাছে আগে গেলেন সুখবরটা জানাতে। মোতালেব মিয়া বারান্দার আরাম কেদারায় বসে আছেন। পাশের জলচৌকিতে যেয়ে শেফালী বেগম বসল। সালাম দিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করল। তারপর খুশি খুশি গলায় বললেন,

'ভাইজান, মানিকের একটা খুশির খবর আছে।'

'কী হইছে ওর? পোলা হইছে?'

'আরে না ! বাচ্চা তো হইব বৈশাখ মাসে, কেবল তো শীত চলে। ওর প্রমোশন হইছে। চাকরির টাকা বাড়ছে।

'খুব ভালো কথা। তা আমার কাছে আসনের কারণ কী?

'এই খুশির সংবাদে জোড়া খাসীর জবাই দিয়া মিলাদ পড়াইতে চাই। বউটাও পোয়াতি। তার জন্য একটু দোআ করন লাগত। তাই আর কী? '

মোতালেব মিয়া বিরক্তি নিয়ে বললেন, তা ঐ কি রাজি হইছে? মিলাদ পড়ানোর ট্যাকা দিছে?

শেফালী বেগমের বানিয়ে বলার অভ্যাস আছে। তিনি হাত নেড়ে বললেন, 'হ, হ, ঐ ট্যাকা দিবে। বিকাশ কইরা পাঠাইব কইছে। আপনে একটা ব্যবস্থা করেন ভাইজান। সামনের শুক্রবারেই করেন, আমি ট্যাকা দিয়ে যাব।'

মোতালেব মিয়া বিরক্তি কমিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। তয়, ওরে উল্টা পাল্টা ধর্ম কম্ম বন্ধ করতে কইবা। ঢাকা শহরে যা খুশি তাই করুক, গ্রামে নয়। আমাদের একটা মান ইজ্জত আছে। এই বাড়ির নাম সবাই জানে। এবার শীতে মানিকশাহ মাজারের বড় পীর ওয়াজ করব। বিশাল ব্যবস্থা করতাছি, বুঝছ? মানিকরে কইবা বেশি কইরা ট্যাকা দিতে। ওয়াজের দোআ খায়েরে মাইকে অর নাম ধইরা দোআ করবে বড় পীর।'

শেফালী বেগমের মুখ হাসিতে ভরে গেল। ত্রিশ বছর আগে এই মানিক শাহের মাজারে যেয়ে জোড়া খাসির মানত করে বড় পীরের সাত তাবিজ কোমরে ঝুলানোর পরের বছর তার ছেলের জন্ম হয়েছিল। মাজারের বড় পীর মানিক শাহের নামে ছেলের নাম 'মানিক' রেখেছিলেন। সেই বড় পীর মানিক শাহ মারা গেছেন অনেক কাল আগে। এখন তার ছেলে জুম্মান শাহ পীর হইছেন। বাপ-ছেলে দুই জনেরই কী সুন্দর চেহারা। ফর্সা, গোলগাল মুখ, নাদুস নুদুস শরীর। আল্লাহর রহমত যেন শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। দেখলেই চোখ ভরে যায়। নিঃসন্তান শেফালী বেগমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন মানিক শাহ। অনেক বাজা মহিলাকে তিনি ভালো করে দিয়েছেন। তার কেরামতির কথা লোক মুখে মুখে ছড়াত। আহ্ ! বড্ড ভালো মানুষ ছিলেন। ভাবতে ভাবতেই শেফালী বেগমের চোখে পানি চলে এল। কান্না লুকিয়ে তিনি বললেন, 'ভাইজান এইডা তো বড্ড ভালো কথা। আমি মানিকের কাছ থেকে দশ হাজার ট্যাকা আইনা দিমু। মানিকের যাতে পোলা হয়, সেই জন্য তো আমি ঐ মাজারে একটা খাসি মানত কইরা আইছি। পোলা হইলে বড় কইরা মিলাদ পড়াইব, ঠিক আছে? আমি এখন আসি।'

শেফালী বেগম চিন্তিত মুখে হাঁটতে লাগলেন। মানিকের দুই মেয়ে। ওর বউ আয়েশা আবার গর্ভবতী হয়েছে। এবার যাতে ছেলে হয় সেজন্য শেফালী বেগম মাজারে গিয়ে খাসি মানত করে পাঁচ হাজার টাকা

দিয়ে পীর জুম্মান শাহের কাছ থেকে তিন তাবিজ এনেছিলেন। ঢাকায় এক লোক মারফত তাবিজ তিনটা প্যাকেট করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরল কিনা কে জানে? বউটা বড্ড বেআদব, কোনো কথাই শুনতে চায় না। বিয়ের দিন জোর করে আয়েশার নাক ফুরিয়ে সোনার নাকফুল পরিয়ে দিয়েছিলেন। নাকফুল না পরলে বউ বিধবা হয়, এটাও জানত না বেআদব বউটা। কিছুই সে মানে না। বাচ্চার গলায় তাবিজ লটকায় না, নজর যাতে না লাগে তার জন্য কপালে কালো টিপও পরায় না। কেমন ছন্নছাড়া মেয়ে লোক। কোন দিন পা ছুঁয়ে সালাম পর্যন্ত করে নাই। প্রথম দিকে কি যেন উল্টা-পাল্টা কোরআন হাদিসের কথা বুঝাতো। কিন্তু পরে চুপ হয়ে থাকত। তেমন কোন বাদানুবাদ করত না।

আয়েশাকে ফোন দিয়ে তাবিজগুলোর কথা মনে করিয়ে দিতে হবে। শেফালী বেগম ফোনটা হাতে নিতেই মোবাইলটা বেজে উঠল। মানিকের নাম ভেসে আসছে, ফোনটা ধরতেই অচেনা কণ্ঠস্বর ভেসে আসল।

'হ্যালো, কে বলছেন? আপনি এই নাম্বারের লোকটার কে হন? '

অচেনা ভারী কণ্ঠস্বর। কে যেন হাঁপাচ্ছে আর কথা বলছে। হই চই এর শব্দে শেফালী বেগম কিছুই শুনতে পারছেন না। তিনি মোবাইলটা কানে চেপে ভালো করে শোনার চেষ্টা করলেন। ওপাশ থেকে কে যেন বলল,

'হ্যালো, শুনতে পারছেন? এই নাম্বারের লোকটা আপনার কে হয়?'

শেফালী বেগম হতভম্ব হয়ে গেলেন। তার মাথা কাজ করছে না। তিনি চিৎকার করে বললেন,

'কেন? তুমি কে? এটা তো আমার ছেলের নাম্বার। মানিকের নাম্বার। সে কোথায়? '

ও পাশ থেকে ভারী কণ্ঠের আওয়াজ এল, 'এই লোকটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। আমরা তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা তাড়াতাড়ি আসেন।'

পরের দিন মোতালেব চেয়ারম্যানের বাড়ি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। শুধুমাত্র গ্রামের মানুষ এসেছে, তা নয়। ঢাকা থেকে লাশবাহী গাড়ির সাথে দশ বাস ভর্তি লোক এসেছে। সবাই নীরবে কাঁদছে। "আব্দুল্লাহ ভাই, খুব ভালো ছিলেন।" আরো কী সব যেন বলে তারা কাঁদছে। মানিক তার নাম পাল্টে আব্দুল্লাহ রেখেছিল, এফিডেফিটও করেছিল।

জানাজা শেষে কে যেন বক্তৃতা দিচ্ছে, 'আব্দুল্লাহ ভাই কোরআন এন্ড সহি হাদিস রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ধর্মের নতুন প্রথা আর জাল হাদিসের বিরুদ্ধে লিখতেন আর বলতেন। তিনি এইসব কুপ্রথা ভাঙতে চেষ্টা করতেন। কোনো দল, মত বা মানুষকে তিনি কটাক্ষ করতেন না। হাসিমুখে ভুলটা শোধরানোর চেষ্টা করতেন। এই রকম একজন মানুষকে আল্লাহ্ পছন্দ করেছেন তাই আগেই তাঁকে মেহমান হিসেবে কবুল করলেন। সবাই তার জন্য দোআ করবেন।

লোকটা আর কিছু বলতে পারছে না। কান্নার শব্দ শুধু শোনা যাচ্ছে। কান্না সংক্রমিত। হু হু কান্নার রব আসছে। শুধু এক জন্যই কাঁদছে না। তিনি হলেন মানিকের মা শেফালী বেগম। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে তিনি পাথর হয়ে গেছেন। কারা যেন মানিকের বউ আয়েশার নাক থেকে নাকফুলটা খোলার চেষ্টা করছে। আয়েশা দৌড়ে এসে শাশুড়িকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'মা, আমি তো কখনো নাকফুল খুলিনি। তাহলে সে চলে গেল কেন? বলেন, কেন চলে গেল? কেন? '

আয়েশা পাগলের মত শাশুড়িকে ঝাঁকি দেয়া শুরু করল। শেফালী বেগম তবুও নিশ্চুপ। তিনি যেন বোবা আর বধির হয়ে গেছেন।

আয়েশাকে এক অচেনা মহিলা টেনে সরিয়ে নিয়ে বলল, 'আয়েশা ধৈর্য ধর, অযু কর, নামাজে বস। পাগল হয়ে গেলে নাকি? কী সব শিরিকি কথা বলছ? এখন দোআ করার সময়। তাঁর সওয়াল জবাব চলছে। আর তুমি কী করছ? চল তার জন্য দোয়া করি।'

সাতদিন পর ভাসুর মোতালেব মিয়া শেফালী বেগমের কাছে আসলেন। সাতদিনের ফতেহা অনুষ্ঠান

করার অনুমতি চাইলেন। শেফালী বেগম চুপ হয়ে রইলেন। মোতালেব মিয়ার স্ত্রী রহিমা খাতুন শেফালী বেগমের মাথায় হাত রাখলেন। বার বার অনুমতি চাইলেন। শেফালী বেগমের ঠোঁট নড়ল, শান্ত গলায় তিনি বললেন, 'এই খাদ্য উৎসবে কি আমার মানিকের কোন উপকারে আসবে? যারা খেতে পারে তাদের একদিন খাইয়ে আমার মানিকের কী লাভ হবে? টাকা দিয়ে খতম পড়িয়ে কি লাভ? সেটার সওয়াব কি মানিক পাবে? তার চেয়ে বরং গোপনে দান করি। আমার কলিজার টুকরা তো এসব পছন্দ করত না। সে তো গোপন দান পছন্দ করত। ভাইজান আপনারা চলে যান। আমি এসব করব না।'

মোতালেব মিয়া আর তার স্ত্রী রহিমা খাতুন হতাশ হয়ে চলে গেলেন। শেফালী বেগম আকাশের দিকে তাকালেন। সূর্য ডুবি ডুবি করছে। অন্ধকার নেমে আসছে। গাঢ় অন্ধকারের ভিতর থেকে চাঁদ উঠি উঠি করছে। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বললেন, "ও আল্লাহ, আমার কলিজার টুকরাকে তুমি ভালো রেখ। তোমার সম্মানিত মেহমান বানিয়ে রেখ। আর আমাকে তুমি মাফ কর। আমাকে তুমি শক্তি দাও। আমার মানিকের রেখে যাওয়া কাজগুলো করার শক্তি দাও। সমস্ত কুসংস্কার, কুপ্রথা ভাঙার শক্তি দাও। এগুলো যে আমাকে ভাঙতেই হবে। আমার মানিকের বাকি কাজগুলো আমাকে করতেই হবে।'

✓ টিকাঃ আমাদের সমাজে কুসংস্কারজনিত অন্ধ বিশ্বাস, বিদআত, অন্য ধর্মের প্রথা, কুপ্রথা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। কুসংস্কার হলো ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে একটি প্রচলিত নিয়মবিধি। যার প্রতি মানুষ অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং জীবনের কর্মক্ষেত্রে এই বিশ্বাসকে আশ্রয় করেই ধাবিত হয়। সাধারণত গ্রামীণ লোকাচারে এই ধরনের বিশ্বাসজাত কুসংস্কার বেশি দেখা যায়। যেমনঃ মাস, দিন, বার (যেমন অশুভ শনিবার),সংখ্যা (যেমন আনলাকি থার্টিন) ইত্যাদিকে দুর্ভাগ্য বা অশুভ প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা তাওহীদ

পরিপন্থি হারাম আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত। যাত্রাকালে টিকটিকির ডাক, কাকের ডাক অমঙ্গল, গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্যের প্রতি অলীক বিশ্বাস এবং খালি কলসি দেখে রওয়ানা হওয়া অমঙ্গল, ডিম খেয়ে পরীক্ষা দিলে ফেইল করা, কানা-খোঁড়া, পাগল ইত্যাকার প্রতিবন্ধীদের দেখলে অমঙ্গল হওয়া, এক শালিক দেখা অমঙ্গল, নাকফুল না পরলে বিধবা হওয়া, বাচ্চার কালো টিপ না পরলে বদনজরে অসুস্থ হওয়া, যাত্রাকালে হোঁচট খাওয়া মানে যাত্রা অশুভ, রাশিফল নির্ণয় করে প্রতিদিনের কর্মক্ষেত্রে গমন করা এসবও কুসংস্কারেরই বহিঃপ্রকাশ।

ইসলামে কুসংস্কারের কোনো স্থান নেই। এই কুসংস্কারের জন্যই আল্লাহর উপর আস্থা, ধর্ম, বিশ্বাস এবং আল্লাহর প্রতি পরম নির্ভরতা বা তায়াক্কুল বহুলাংশে লোপ পায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যখন তাদের (ফিরআউন ও তার প্রজাদের) কোনো কল্যাণ দেখা দিত তখন তারা বলত, এটা আমাদের জন্য হয়েছে। আর যদি কোনো অকল্যাণ হতো, তারা তখন মূসা ও তার সাথীদের অলুক্ষণে বলে গণ্য করত।’(সূরা আল-আ‘রাফ : ১৩১)

ভালোমন্দ সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় সাধিত হয়, কারো দ্বারা কোনো মঙ্গল বা অমঙ্গল হয় না। এ প্রসঙ্গে প্রচুর আয়াত নাযিল হয়েছে। (রেফঃ সুরা আল-মায়েদাঃ ৪১, আল-আরা’ফঃ ১৮৮, সূরা ইউনুসঃ ৪৯, সূরা রা’দ ১৬, সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৬৫, সূরা আল-ফুরকানঃ ৩, আল ফাতহঃ ১১)

শুভাশুভ নির্ণয়ের বিধান প্রসঙ্গে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক’। [সুনান আবু দাউদ; তিরমিযী; মিশকাত, হাদীস নং ৪৫৮৪]

আবার এই উপমহাদেশের মানুষদের মধ্যে বিদআত ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘সকল নব-আবিষ্কৃত (দ্বীনের মধ্যে) বিষয় হতে সাবধান! কেননা প্রত্যেকটি নব-আবিষ্কৃত বিষয় বিদ‘আত আর প্রত্যেকটি বিদ‘আত হলো পথভ্রষ্টতা’। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে

মাজাহ ও বাইহাকী)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সকল প্রকার বিদ‘আত ই ভ্রষ্টতা । এখন যদি বলা হয় কোনো কোনো বিদ‘আত আছে যা হাসানাহ বা উত্তম, তাহলে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ হাদীস বিরোধী হয়ে যায় ।

তাই তো ইমাম মালিক (রঃ) বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন বিদ‘আতের প্রচলন করে আর ইহাকে হাসানাহ বা ভালো বলে মনে করে, সে যেন প্রকারান্তরে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পয়গাম পৌছাতে খিয়ানাত করেছেন ।’

আল্লাহ তা‘আলা নিজেই বলেন: ‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম ।’ সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যা ধর্ম রূপে গণ্য ছিল না আজও তা ধর্ম বলে গণ্য হতে পারে না । তাই বিদ‘আতে হাসানাহ বলে কোন কিছু নেই ।

আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু বিদআতের উদাহরণঃ কাওয়ালী জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা, মৃতের কুলখানী করা,(অর্থাৎ- চতুর্থ দিনেই ঈছালে সাওয়াব করা), মৃতের তিনদিন, সাতদিন, চেহলাম বা চল্লিশা করা, ফতেহা, কুরআন খতম, মৃত্যুবার্ষিকী, কোন বুযুর্গের মাজারে মেলা মিলানো, ওরস করা, মাজারের মৃত ব্যক্তির কাছে চাওয়া, মাজারে মানত করা, কবরের উপর চাদর দেয়া, কবরের উপর ফুল দেয়া, কবর পাকা করা, কবরের উপর গম্বুজ বানানো, কবরের দুই প্রান্তে কাঁচা ডাল লাগানোকে স্থায়ী নিয়মে পরিণত করা । (তবে যদি মাঝে মধ্যে এটা করা হয় এবং স্থায়ী নিয়মে পরিণত না হয়, তাহলে তার অবকাশ রয়েছে), মাযারে চাদর, শামিয়ানা, মিঠাই ইত্যাদি নযরানা দেয়া, প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান, মিলাদ অনুষ্ঠানে কেয়াম করা, শবে বরাতে হালুয়া রুটি করা, পটকা ফুটানো, আতশবাজী করা, আশুরায় খিচুড়ি ও শরবত

তৈরি এবং বণ্টন করা, 'জানের বদলা জান' মনে করে খাসি কোরবানি করা ,এটা একটা রছম(জানের বদলে জান হওয়া জরূরী নয় বরং যে কোন ছদকা হলেই তা বিপদ দূরীভূত হওয়ার সহায়ক) মিলাদ এবং ঈদে মিলাদুন্নবী (হযরত মুহম্মদ সাঃ এর জন্মদিন পালন করা) ।(রেফঃ বাংলাদেশ সীরাত মিশন, আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবিতকালে ওযাহী দিবস, কুরআন নাযিল দিবস, পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আঃ) এর জন্ম বা মৃত্যু দিবস, মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ) এর জন্ম বা মৃত্যু দিবস এসেছে কিন্তু রাসূল (সাঃ) এভাবে কোন নবির স্মরণে বা কোন সাহাবার শাহাদাত দিবস অথবা কোন জিহাদের দিবস পালন করেন নাই এবং নির্দেশও দেন নাই ।

মাজার বা পীরের মাধ্যমে অনেকেই তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু হাসিল করা যায় বলে বিশ্বাস করে যা স্পষ্ট শিরক । সন্তান দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ সুবহানা তায়ালার কোন পীর বা মাজারের সেই ক্ষমতা নাই (রেফঃ সূরা আশ-শুরাঃ ৪৯-৫০) । এছাড়া কোন কিছু চাইতে হবে সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে, এর জন্য কোনো পীর বা মাধ্যম লাগে না, (রেফঃ সূরা আ'নামঃ ৪০-৪১, সূরা আরা'ফঃ ২৯, সূরা ইউনুসঃ১০৬, সূরা আর-রা'দ ১৪, সূরা ফুরকানঃ৬৮)

আবার অনেকেই জ্যোতিষী বিশ্বাস করে, এটাও শিরক । মানুষ ভাবে জ্যোতিষী বা পীরেরা গায়েবের খবর জানে, ভবিষ্যৎ বলতে পারে এবং তার সমাধানও দিতে পারে । এসব বিশ্বাস করাও শিরক । এ প্রসঙ্গে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। একমাত্র আল্লাহই গায়েবের খবর জানেন অন্য কেউ নয় (রেফঃ সুরা আল-বাকারাঃ৩৩, সূরা মায়েদাঃ ১০৯,১১৬, সূরা আন'আমঃ ৫৯, ৭৩,সূরা আত-তাওবাঃ ৭৮,৯৪,১০৫, সূরা ইউনুসঃ ২০, সূরা হুদঃ ১২৩)

কুসংস্কার আর বিদআত ছাড়াও আমাদের সমাজের মুসলমানেরা অন্য ধর্মের প্রথা নিজেদের মধ্যে ধারণ করেছে যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য । এ প্রসঙ্গে রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্যতা

গ্রহণ করবে সে তাদের অনর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে ।’

যেমন খৃষ্টানদের অনুকরণে জন্মদিন, ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি, মৃত্যুদিবস পালন, হিন্দুদের অনুকরণে বিয়েতে গায়ে হলুদ, মেয়ের বাড়ির ভোজের আব্যশিকতা (ছেলের তরফ থেকে অলিমা করা সুন্নাহ, মেয়ের বাড়ি থেকে নয়), পা ছুঁয়ে সালাম, বরণ ডালায় কনে বরণ, বাচ্চার প্রথম মাথার চুল ফেলার অনুষ্ঠান, মুখে ভাতের অনুষ্ঠান (শুধুমাত্র বাচ্চার আকিকা সুন্নাহ)ইত্যাদি । ছেলে বাচ্চার সুন্নাতে খাতনার অনুষ্ঠান (খাতনা করা সুন্নাহ, অনুষ্ঠান নয়), মেয়ে বাচ্চার নাক-কান ফুঁড়ানোর অনুষ্ঠানও কিছু অনুষ্ঠানপ্রিয় মানুষের তৈরি যা বর্জনীয় ।

আমাদের বাবু ও বই

রুপার ছেলে বাবু আজ পুরো মাতাল হয়ে ঘরে ঢুকেছে, ঘর বাড়ি তোলপাড় করেছে, গালি গালাজ করছে। রুপার নিজের ছেলেকে নিজেরই মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে। একে সে পেটে ধরেছে! ছিঃ ঘৃণায় তার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

আজকে শাশুড়ির কথা খুব মনে পড়ছে। এই মহিলাটাকে সে একদম সহ্য করতে পারত না, কিন্তু তিনি ভুল ছিলেন না, এখন তা সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

বিয়ের সাত বছর পর রুপার ছেলে বাবুর জন্ম হয়েছিল। তাই আহ্লাদ একটু বেশিই ছিল। কখনো শাসন করে নি। যা চেয়েছে তাই দিয়েছে। 'শিশুদের জন্য হ্যাঁ বলুন' নীতিতে সে বিশ্বাসী ছিল। সে কখনো না বলেনি কারণ তাতে যদি বাবুর মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

বাবুর যখন ৮ বছর, তখন সে চার তলা বিল্ডিং এর ছাদ থেকে সুপারম্যান সেজে ছাতা খুলে প্যারাসুট বানিয়ে লাফ দিতে ধরেছিল, ভাগ্যিস, কাজের ছেলে কালুটা ওকে আটকে ধরে চিৎকার দিয়েছিল। সেদিন বাবুর দাদি ইচ্ছে মতো রুপাকে কথা শুনিয়েছিল, 'বৌমা, আজকে হ্যাঁ বললে না যে ? বাবু আগুনে হাত

দিতে চাইলে কি তুমি না করবে না ? ওর ভালোর জন্যই তোমাকে শাসন করতে হবে, অপরাধের শাস্তি ও দিতে হবে। ওর মধ্যে শাস্তির ভয় ঢুকাতে হবে। ভালো কাজের পুরস্কার আর মন্দের শাস্তি দিতে হবে, বুঝলে?'

ওনার কথা গুলো সেদিন রুপার খুব অসহ্য ঠেকেছিল। রুপা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলেছিল, 'আপনি সাত ছেলের মা আর আমি সাত বছরের অপেক্ষার প্রাপ্তি একটা মাত্র ছেলের মা। আপনি আর আমি এক নই। আমার বাবুকে ওভাবে কঠোরভাবে আমি মানুষ করতে পারব না। ও এভাবে আদরেই বড় হবে। ও কাঁদলে, কষ্ট পেলে আমার বুকটা ফেটে যায়। আপনার তো সাতটা ছেলে, আপনি এই কষ্ট বুঝবেন না।'

বাবুকে নিয়ে শাশুড়ির সাথে প্রতিটা ক্ষেত্রে রুপাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। নিজেকে 'সাস ভি কাভি বউ থি' সিরিয়ালের তুলসীর মতো সংগ্রামী মনে হতো তার। বাবুর স্কুলের হাজারটা বই, তার মধ্যে তিনি হুজুর ডেকে আরবি শেখাতে চাইতেন। নামাজ, রোজা করাতে চাইতেন। কিন্তু এগুলোর সময় কোথায়? বাবুকে এ প্লাস পেতেই হবে, ওর সাথে রুপাও দিন রাত খেটে ছিল, বাবু তার মান রেখেছিল। তখন রুপা তার শাশুড়িকে বেশ কথা শুনিয়েছিল। বাবু যে ভালো ছাত্র, ও যে খারাপ ছেলে না তা বুঝিয়ে দিয়েছিল।

তারপর একদিন নৈতিক আর ধর্মহীন শিক্ষায় উজ্জীবিত এ প্লাসধারী বাবু কিভাবে যেন অন্ধকার জগৎ এ হারিয়ে গেল রুপা টেরও পেল না।

বাবু সেক্যুলারিজম, নাস্তিকতা আর আধুনিকতা শিখেছে। ধর্মীয় নীতি নৈতিকতা কিছুই শেখে নি,পাপ পুণ্যের পার্থক্য শেখে নি। কারণ এটাকে রুপা গোঁড়ামি হিসেবে নিয়েছিল। রুপার প্রিয় লেখক হুমায়ুন আজাদের 'বই' নামক কবিতাটা পড়ে তার মনে হয়েছিল, আসলেই তো ধর্মীয় বই শুধু ভয়ই দেখায়, বাচ্চাকে এত ভয়, এত অনুশাসনের মধ্যে রাখলে বাচ্চা বিগড়ে যাবে।

যে-বই তোমায় দেখায় ভয়
সেগুলো কোনো বই-ই নয়

সে-বই তুমি পড়বে না।
যে-বই তোমায় অন্ধ করে
যে-বই তোমায় বন্ধ করে
সে-বই তুমি ধরবে না।

এই কবিতাটি পড়ে রুপার মনে হয়েছিল যে আসলেই আমাদের ধর্ম গ্রন্থ আমাদের ভয় দেখায়, শাস্তির ভয় দেখায়, চুরির শাস্তি হাত কর্তন, ব্যভিচারের শাস্তি নর-নারী দুজনকেই সম্মুখে একশত বেত্রাঘাত, অন্যায় ভাবে হত্যার শাস্তি মৃত্যুদন্ড, এসব ইহকালীন শাস্তির প্রয়োগের আদেশ আবার গান-বাজনা, কনসার্ট, বেপর্দা, সাজ-সজ্জা, ছেলে-মেয়ের বন্ধুত্ব সব কিছুতেই শুধু নিষেধাজ্ঞা। প্রতিটা ক্ষেত্রে পরকালীন শাস্তির শুধু ভয় আর ভয়। বাচ্চাকে এত ভয় দেখালে তার তো মুক্তবুদ্ধির বিকাশ হবে না। এসব ভেবে রুপা কখনো বাবুকে কোনো ধর্মীয় বই পড়তে দেয় নি। বাবু উদারমনা আর বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে বেড়ে উঠবে, তার মধ্যে কোনো গোঁড়ামি থাকবে না। এটাই রুপার চাওয়া ছিল।

বাবু সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিল। বাবু এখন এতটাই উদার মানসিকতার যে সে ছেলে আর মেয়েতে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না, আজ এই গার্লফ্রেন্ড তো কাল আরেক গার্লফ্রেন্ড নিয়ে রাত কাটায়। সে পানির মতো মদ গিলে। গালিবিদ্যা আর গাঞ্জাবিদ্যায় সে তুখোড়। রাতে ছাদে সব বন্ধু মিলে হল্লা করে, গিটার বাজায় আর গাঞ্জা ফুঁকে। মাঝে মাঝে উচ্চ ভলিউমে গান ছেড়ে দিয়ে নাচে। প্রতিবেশীরা বিরক্ত হয়ে অভিযোগ করলে সে তেড়ে আসে। ভয় পেয়ে সবাই চলে যায়।

রুপা নিজেও এখন ছেলেকে ভয় পায়। অপমানিত হবার ভয়ে সে চুপ হয়ে থাকে। আজ সে মাতাল অবস্থায় রুপাকে মারতে এসেছিল। হায়, তার এ প্লাসধারী সোনার ছেলে! গালিবিদ্যা আর গাঞ্জাবিদ্যায় তুখোড় সোনার ছেলে!

টিকাঃ ‘শিশুদের ভয় দেখাতে নেই। ভয় দেখনোর বইগুলো পড়াতেও নাই।’ এসব বলে অনেকেই শিশুদের ধর্ম গ্রন্থ থেকে দূরে রাখেন। আমাদের ধর্ম গ্রন্থ আমাদের ভয় দেখায়, শাস্তির ভয় দেখায়। যেমনঃ চুরির শাস্তি হাত কর্তন (রেফঃ সূরা মায়েদাঃ আয়াত ৩৮), ব্যভিচারের শাস্তি নর-নারী দুজনকেই সম্মুখে একশত বেত্রাঘাত (রেফঃ সূরা নূরঃ ২) আবার হত্যার বদলা হত্যার হুকুম দেওয়া হয়েছে (রেফঃ সূরা বাকারাঃ আয়াত ১৭৮)। এসব ইহকালীন শাস্তির প্রয়োগের আদেশ আবার মদ, সুদ, অশ্লীলতা, গান বাজনা আর মাস্তি, বেপর্দা আর সাজসজ্জার প্রকাশ, এমনকি বাবা মায়ের সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলাও নিষেধ, প্রতিটা ক্ষেত্রে পরকালীন শাস্তির শুধু ভয় আর ভয়।

ভয় যে দেখাতেই হবে না হলে তো সমাজ স্বেচ্ছাচারিতায় ভরে যাবে। চুরি, ডাকাতি,খুন, ধর্ষণ, হানাহানি, অবিচার, অসম্মান আর অশ্লীলতায় সমাজ ছেয়ে যাবে। একমাত্র ধর্মীয় মূল্যবোধ, অনুশাসন আর আইনের প্রয়োগই তো পারে এসব রুখতে। সেক্যুলারিজম আর আধুনিকতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা, বিশৃংখলতা আর নষ্টামী ছড়িয়ে পড়ছে। এসব ঠেকাতে ধর্মীয় শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই।

ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। ‘পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’ (সূরা আলাকঃ ১)। রাসূলে করিম (সাঃ) বলেন : ‘নর নারীর ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ বা অবশ্যই কর্তব্য।’

এখানে কোন জ্ঞান অর্জনের কথা বলা হয়েছে তা অধিকাংশ অভিভাবকেরাই বোঝেন না। মনগড়া ভাবে চললে সন্তান ভালো মানুষ হতে পারবে না। তাই জানতে হবে এর উপাদান, আর এর প্রথম উপাদান হলো সঠিক জ্ঞান অর্জন আর তার একমাত্র প্রধান উৎস হলো আল-কুরআন, দ্বিতীয় হলো রাসূল (সাঃ) এর সহিহ হাদিস।

স্কুল কলেজের অ্যাকাডেমিক শিক্ষার গুরুত্ব দিলেও আমাদের সমাজের খুব অল্প সংখ্যক অভিভাবকেরা সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অথচ ধর্মীয় শিক্ষা ফরজ করে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের বাই বার্থ মুসলিম সন্তানেরা জ্ঞান অর্জিত মুসলিম হবার পরিবর্তে ধর্মহীনতার দিকে ঝুঁকছে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম নষ্ট থেকে নষ্টতরের দিকে এগুচ্ছে। এখনো সময় আছে, আমাদের নষ্ট পথে হাঁটা সন্তানদের ফিরিয়ে আনার, স্কুল-কলেজ আর ভার্সিটির অ্যাকাডেমিক শিক্ষার সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষার সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রকৃত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার।

রত্ন না হৃদয় কাটা কাঁচ

অভি বুয়েট থেকে মাস্টার্স করে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে খুব ভালো বেতনে চাকরি করছে। সারা সপ্তাহ কাজ করে। ছুটির দিন পেলেই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হৈ হুল্লোড় করে, সেদিন আর বাসায় থাকে না। রাতেও বাসায় ফেরে না। পরের দিন অফিস করে ঘরে ফিরে। অভির বাবা রাশেদ সাহেব অভিকে নিয়ে খুব গর্ব করেন। অভির মা রোকসানা বেগমের গর্ব আরো একটু বেশি। তিনি শরীর দুলিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে তার দুই ছেলের গল্প সবাইকে বলেন। মাঝে মাঝে একটু বাড়িয়েও বলেন। তার বড় ছেলে আশিক পাঁচ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স মাস্টার্স শেষ করে লন্ডনে পি.এইচ.ডি করতে গিয়েছিল। গত বছর ডক্টরেট ডিগ্রীও লাভ করেছে। কনভোকেশনে রাশেদ সাহেব ও রোকসানা বেগমও গিয়েছিলেন। ইউনিভার্সিটির কনভোকেশনের আলো ঝলমলে সেন্টারে গর্বিত পিতা-মাতা হিসেবে রোকসানা বেগম আর রাশেদ সাহেবের মুখও সেদিন ঝলমল করে উঠেছিল। এখন আশিক বিশ্বের নামকরা একটি সায়েন্টিফিক রিসার্চ সেন্টারে রিসার্চার হিসেবে কাজ করে। সে অনেক ব্যস্ত।

তিন বছর আগে একবার সে ঢাকায় এসেছিল। তার পছন্দ করা পাত্রী অনামিকাকে বিয়ে করে আবার

ঢাকায় চলে গেছে। অনামিকা আশিকের ক্লাসফ্রেন্ড ছিল। দুই জনের মধ্যে দারুন বোঝাপড়া। ওদের হাসিমুখ খুনসুটি দেখলে রোকসানা বেগমের ভালোই লাগত। অনামিকার বাড়ির লোকজনদের উঁচু গলায় বলত, “আমার সোনার টুকরা ছেলে তাই তোমাদের মেয়ে এত ভালো আছে, বুঝেছ?

অভিরও বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সামনের মাসের বিশ তারিখে বিয়ে হবে। আশিকের জন্য বিয়ের তারিখটা পেছাতে হয়েছে। আশিকের কী যেন ঝামেলা চলছে। রাশেদ সাহেব বিয়ের খরচ হিসেব করছেন। এমন সময় কলিং বেল বাজল। রাশেদ সাহেব দরজা খুলে দিলেন। আশিক-অভির মামা মানে তার ছোট শ্যালক আসাদুল্লাহ এসেছে। রাশেদ সাহেব গম্ভীর মানুষ। সরকারি চাকুরি করতেন, হিসেবী আর নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। ঝামেলা একদম পছন্দ করেন না। নিয়ম মেনে সব বিষয়ে বুঝে শুনে চলেন। তাই এখনো তেমন ঝামেলা পোহাতে হয়নি। শ্বশুর বাড়ির সবাই তাকে জ্ঞানী হিসেবে শ্রদ্ধা করে। তাকে সবাই খুব কমই হাসতে দেখেছে। রাশেদ সাহেব মৃদু হেসে আসাদুল্লাহকে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি ভিতরের ঘরে ডাক দিয়ে বললেন, “ও গো, শুনছ? আশিকের মা, এদিক আসো। দেখো, কে এসেছে।”

রোকসানা বেগম এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ ছোট ভাইয়ের আগমনে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। ছোট ভাই আসাদুল্লার মাধ্যমে অভির বিয়ে পাকা হয়েছে। আসাদুল্লাহ তার অফিসের বসের মেয়ে কবিতার সাথে অভির বিয়েটা ঠিক করেছে। কোনো সমস্যা হয়নি তো? আসাদের মুখটা অমন থমথমে কেন? রোকসানা বেগমের বুকটা ধ্বক ধ্বক করে উঠল। প্রেসারটা আজ কাল বড্ড ওঠানামা করছে, বয়স হয়েছে। বেশি ধকল বা চিন্ত া তিনি এখন আর করতে পারছেন না। শরীরটা হঠাৎ ঘেমে উঠল বোধ হয়। তিন জনের জন্য শরবত আর নাস্তা এনে ফ্যান ছেড়ে সোফার গা এলিয়ে বসলেন।

রাশেদ সাহেব মৃদু ধমকের সুরে বললেন, “এই ঠান্ডায় ফ্যান ছাড়লে কেন? দেখছ না আসাদ কাশছে।”

রোকসানা বেগম ঘাম মুছে বললেন, “আমার শরীরটা কেমন যেন ঘেমে উঠছে। আজকাল প্রেসারটা বড্ড

উঠা নামা করে।

আসাদ কাশি থামিয়ে বলল, “দুলাভাই, থাক, ফ্যানটা ঘুরুক। আমার তেমন সমস্যা হচ্ছে না।”

রাশেদ সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, “তা, তুমি কেন এসেছ? বললে না, যে। কোনো কারণ ছাড়া এমন অফিস টাইমে আসার লোক তো তুমি নও।”

আসাদুল্লাহ হাত কচলিয়ে, কাচুমাচু করে বলল, “হ্যাঁ, একটা কথা বলতে এসেছিলাম।”

রাশেদ সাহেব বললেন, “কি কথা? ঝটপট বলে ফেল না। কোন সমস্যা? কবিতাদের বাড়ি থেকে কিছু বলেছ?”

আসাদুল্লাহ মাথা নেড়ে বলল, “হ্যাঁ, ঐ রকমই।”

রোকসানা বেগম যে রকম ভেবেছিলেন সেই রকম কথারই গন্ধ পেলেন। এবার তিনি আসাদকে চেপে ধরা কণ্ঠে বললেন, “আসাদ, এত ভণিতা করিস না তো, কী হয়েছে বল? তুই তো জানিস আমি সোজাসুজি কথা বলতে আর শুনতে পছন্দ করি।”

আসাদ এবার গলা পরিষ্কার করে বলতে শুরু করল, “আপা হয়েছে কী? সব তো ঠিকঠাকই ছিল। ঝামেলা বাধিয়েছে আমাদের অভি।”

রোকসানা বেগম বিস্ময়ের সুরে বললেন, “সে আবার কী করল রে? অভি তো মেয়েকে পছন্দই করেছে বলল। ওর দিক থেকে কোন সমস্যা নেই বলেছে।”

আসাদুল্লাহ শান্ত কণ্ঠে বলল, “না, অভি সেই ঝামেলা করে নি। ওর স্ট্যাটাসে ওরা খারাপ কিছু পেয়েছে।

এবার রাশেদ সাহেব ধমক দিয়ে বললেন, “কী বলছ এসব, আসাদ? আমাদের স্ট্যাটাস খারাপ? কবিতার বাবা না হয় আমার থেকে একটু উঁচু র‍্যাংকে চাকরি করে। তাতে কী? আমরা কি ফেলনা?

আসাদ জিভে কামড় দিয়ে বলল, “না, না, দুলাভাই। সেই স্ট্যাটাস না। অভির ফেসবুক স্ট্যাটাস গুলোর কথা বলেছে। অভির এক বন্ধু শামীম হলো কবিতার কাজিন। সে অভির ফেসবুক স্ট্যাটাসে নাস্তিকদের

স্ট্যাটাস শেয়ার করতে দেখেছে। অভি নাকি নাস্তিক। সে নাকি সেক্যুলারিজমে বিশ্বাসী।”

রাশেদ সাহেব ক্ষেপে গিয়ে বললেন, “হোয়াট? ননসেন্স ! কে এমন বাজে কথা বলেছে?”

এবার রোকসানা বেগম মেজাজ খারাপ করে বললেন, “আসাদ, আমার মনে হয়, ঐ শামীম ব্যাটা কবিতাকে পছন্দ করে। তাই উল্টা পাল্টা বলে বিয়ে ভেঙে দিতে চাইছে। আমাদের অভি কখনো নাস্তিক হতে পারে না। তুই এটা বিশ্বাস করিস?”

আসাদুল্লাহ চুপ হয়ে গেল। রাশেদ সাহেব হাত নেড়ে বললেন, “বিয়ে ভেঙে দিতে চাচ্ছে ভালো। ভেরি গুড, ইটস দেয়ার ডিসিশন, বাট হু দ্যা ব্লাডি হেল টু স্ল্যান্ডার অ্যাবাউট মাই বয়?”

আসাদুল্লাহ পকেট থেকে অ্যান্ড্রয়েড সেটটা বের করল আর ব্যাগ থেকে এক গাদা কাগজ বের করে সামনে রেখে বলল, “দুলাভাই, আপা, মনোযোগ দিয়ে শোনেন, এগুলো ঠান্ডা মাথায় পড়েন। এগুলো সব অভির স্ট্যাটাসের প্রিন্ট কপি। বিশ্বাস না হলে মিলিয়ে দেখেন, এই যে ওর ফেসবুক আইডি।”

রাশেদ সাহেবের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। শেষ কবে অভি নামাজ পরেছে মনে করতে পারছেন না। ছোট বেলা শুক্রবারে সাথে করে জুমুআর নামাজে নিয়ে যেতেন। তারপর বড় হলে আর নিয়ে যান নি। গত রমজানে তো অভি একসাথে সাহ্‌রি খেয়েছিল। কিন্তু পরে কি ভেঙে ফেলত? কি জানি ভেঙে ফেলতেও পারে। গত রমজানে শেষ ইফতারে অভি তার পাশে বসেছিল। অভির গা থেকে সিগারেটের গন্ধ মেশানো পারফিউমের তীব্র ঝাঁঝ নাকে এসে লেগেছিল। ছেলেটা কি নেশাও করে নাকি? কে জানে? প্রতি শুক্রবার রাতে সে বাসায় থাকে না। বন্ধু বান্ধবের ফ্ল্যাটে আড্ডা দেয়। পরের দিন যখন সে ফেরে ওর চোখ মুখ কেমন যেন নেশাচ্ছন্ন দেখায়। রাশেদ সাহেব আর ভাবতে পারছেন না। তার মাথা ভন ভন করে ঘুরছে। তিনি স্ট্যাটাসের প্রিন্ট কপি গুলো হাতে নিলেন। এক এক করে পড়তে লাগলেন।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) এর বয়স নিয়ে কটাক্ষ করেছে। গালি গালাজ থেকে শুরু করে সবই লিখেছে। যুক্তির চেয়ে গালিই বেশি। রাশেদ সাহেবের গা গুলিয়ে আসছে। এগুলো

অভির লেখা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি রাগে ঘৃণায় থর থর করে কাঁপছেন।

রোকসানা বেগম আর রাশেদ সাহেব দুই জনেই চুপ হয়ে গেলেন। আসাদুল্লাহ নরম গলায় বলল, “দুলাভাই, আমিও প্রথমে বিশ্বাস করি নি। অভি নাস্তিকদের পাল্লায় পড়েছে। নষ্ট হয়ে গেছে। সে শুক্রবারে ওদের আসরে সময় কাটায়। রাতে সবাই মিলে নেশা করে। ওর বন্ধুদের স্ট্যাটাসে অভির ছবি দেখেছি। সবাই মিলে ড্রিংকস্ করছে। অভি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দুলাভাই ওকে ফেরান।”

রাশেদ সাহেব থমথমে গলায় বললে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না। নষ্ট হয়ে গেছে। হি ইজ নাউ আউট অব কন্ট্রোল। আই কান্ট চেঞ্জ হিম। ওহ আল্লাহ ! সেইভ মাই বয়, শো হিম রাইট পাথ।”

আসাদুল্লাহ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাকে বের হতে হবে। বড় ভাগ্নে আশিক আর অনামিকার কাবিন নামা তুলতে মগবাজার কাজি অফিসে যাবেন। ওদের ডিভোর্সের প্রসেস চলছে। এটা আশিকের বাবা-মা জানেন না। এক রাতে আশিক আসাদুল্লাহকে ফোন দিয়ে কান্নাকাটি করেছিল, সাহায্য চেয়েছিল ছোট মামার কাছে। অনামিকা নাকি বয়ফ্রেন্ড জুটিয়েছে, খুব খারাপ মেয়ে। আর সংসার করতে চাচ্ছে না। তাই তারা মিউচুয়াল ডিভোর্সের দিকে এগুচ্ছে। তাদের এক বছরের কন্যা কাদের সাথে থাকবে, এটা নিয়েও মামলা চলছে। এসব কাউকে জানাতে নিষেধ করেছে। ডিভোর্স হয়ে গেলে আশিক সামনের মাসে বিশ তারিখে আসবে। মামলায় জিতলে মেয়েকে নিয়ে একেবারে ফেরার ইচ্ছে আছে।

আশিকের কোনো কাজই করতে তার ইচ্ছে করছেনা। কিন্তু তিনি আগেই কথা দিয়েছেন। আশিক একটা মহা মিথ্যুক, লম্পট আর ধুরন্ধর ছেলে। নিজে পরকীয়ায় জড়িয়েছিল। অনামিকার অনুপস্থিতিতে তার বিদেশী গার্লফ্রেন্ড নিয়ে সময় কাটাচ্ছিল। অনামিকার হঠাৎ উপস্থিতি সেই তথ্য ফাঁস হয়েছিল। অনামিকা আশিককে ছুরি মারতে চেয়েছিল। ধস্তা ধস্তির এক পর্যায়ে বিদেশী মেয়েটা আহত হয়েছিল। তারপর পুলিশ এসেছিল, ত্রিমুখী মামলা চলছে। সেই খবর মিডিয়াতেও এসেছিল। এত কিছু ঘটে গেল অথচ আশিকের বাবা-মা কিছুই জানে না। কারণ তারা অনলাইন পোর্টালের কোনো নিউজ দেখেন না। লন্ডনে বাংলাদেশীদের নিয়ে একটা নিউজ পোর্টাল আছে। সেখান থেকে আসাদুল্লাহ এই খবর পান। আর লন্ডনে থাকা তার এক বন্ধুর

মাধ্যমে খবরের সত্যতা বের করেন ।

রোকসানা বেগম আসাদুল্লার চিন্তাগ্রস্থ মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিরে, উঠলি যে । আর একটু বস । আশিকের মেয়ে ছোঁয়া দাদুমনির জন্য কিছু কাপড় রেখেছিলাম । তোর অফিস থেকে তো প্রায় কেউ না কেউ লন্ডনে যায়, প্যাকেট টা নিয়ে যা । সময় সুযোগ মতো পাঠিয়ে দিস ।

আসাদুল্লাহ আবার বসল । রাশেদ সাহেব একটু যেন নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "আসাদ, তাহলে আশিক কে আসতে নিষেধ করে দাও । ইমেইল পাঠিয়ে দাও । আশিক তো সামনের মাসে বিয়ে উপলক্ষে আসতে চেয়েছিল । কষ্ট করে আর আসার দরকার কী?

আসাদুল্লাহ একটু থেমে বললেন, "দুলাভাই, আশিক শুধু বিয়ে উপলক্ষে আসতে চায় নি । ওর আরো কাজ আছে । ও আসবেই ।"

রাশেদ সাহেব হাসিমুখে বললেন, "কোন সেমিনার টেমিনার আছে নাকি? আশিক তো পৃথিবীর টপ ইয়াং সায়েন্টিস্টদের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে । টাইম ম্যাগাজিন সহ বাংলাদেশী পত্রিকাগুলোতে ওর ছবিসহ বিস্তারিত প্রকাশ করেছে । ছেলেটা আমার একদিন হয়ত নোবেল পুরষ্কার পাবে । আশিক আমার স্বপ্ন পূরণ করেছে । আমার সন্তানদের নাম পৃথিবীর ইতিহাসে লেখা থাকবে । আমি এমনই চাই । অ্যাজ অ্যা ফাদার আই অ্যাম রিয়ালী প্রাউড অব মাই এল্ডার সান । হি ইজ অ্যা জুয়েল ।

রাশেদ সাহেবের অহংকারী মুখের চোয়ালটা যেন ঝুলে পড়ল । আসাদুল্লাহ মুখ বাঁকিয়ে হাসল । কিছু বলতে যেয়েও থেমে গেল । রত্ন ! আপনার দুই গুনধরপুত্র রত্ন না হৃদয় কাটা কাঁচ, আর কয়দিন পর ঠিকই বুঝতে পারবেন । বাবা মার ভালো-মন্দ, অসুখ-বিসুখের খোঁজ রাখেনা । মোটা টাকা দিয়ে দায়িত্ব শেষ করে তারা । তাতেই মহাখুশি । ধর্মহীন, নৈতিকতাহীন, উচ্চশিক্ষিত পুত্র আপনার, মোটা টাকা ইনকাম করে । মহা বিজ্ঞানী লম্পট আশিক আর টপ ইঞ্জিনিয়ার নাস্তিক অভি । এই রত্নদ্বয়ের জন্য মারা গেলে পিতা হিসেবে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে । তখন বুঝবেন আপনি পিতা হিসেবে কতটুকু সফল? আপনি আসলে তাদের

টিকাঃ আমাদের সমাজে যারা দুনিয়ায় সাফল্য পেয়েছে তাদেরকেই আমরা সফল বলে গণ্য করে থাকি। গাড়ি-বাড়ির মালিক, সবোর্চ্চ ডিগ্রীধারী, উচ্চ পদস্ত, খ্যাতিমান কিংবা মহা ক্ষমতার মালিক ব্যক্তিরাই আমাদের চোখে সফল। অথচ আল্লাহ্‌র কাছে কারা সফলকাম তা আমরা জানি না আর হবার চেষ্টাও করি না।

সমাজের বেশির ভাগ মানুষই সাফল্য অর্জনের সময় এবং ক্ষেত্র শুধু দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করে থাকে।

প্রতিটি মানুষই মরণশীল, মৃত্যুর পরেও একটি অনন্তকালের জীবন আছে। সে জীবন সম্পর্কে জেনেও পরকালীন সফলতার হিসাব কেউ করে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, ‘প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।’ (সূরা আনকাবুত : আয়াত ৫৭) মত্যুর পরেই মানুষের চূড়ান্ত ফয়সালা হবে। হিসাব করা হবে মানুষ সফল না ব্যর্থ। দুনিয়ার জীবনে বহু সফলতা অর্জনকারীও সেদিন ব্যর্থ হবে কারণ দুনিয়ার সফলতাই চূড়ান্ত সফলতা নয়।

কাজেই পরকাল-উদাসীন ব্যক্তির বৈষয়িক উন্নতিই সফলতার মাপকাঠি নয়। আল্লাহর কাছে সাফল্য হলো, ‘সেদিন যে ব্যক্তি শাস্তি থেকে রেহাই পাবে, আল্লাহ্‌ তার ওপর বড়ই অনুগ্রহ করবেন, আর এটাই হলো সুস্পষ্ট সাফল্য।’ (সূরা আন’আম : ১৬)

পরকালে মহাদিবসে প্রতিটি মানুষকেই তার দুনিয়ার কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। সেদিন প্রশ্ন করা হবে না কে গোল্ডেন এপ্লাস পেয়েছো, কে ডাক্তার হয়েছো, কে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছো বরং সেদিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর

না দেয়া পর্যন্ত কোনো মানব সন্তানকে এককদমও সামনে এগোতে দেয়া হবে না ।

এ প্রসঙ্গে ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদমও স্বস্থান থেকে নড়তে দেয়া হবে না । ১) তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে, ২) যৌবনের সময়টা কিভাবে ব্যয় করেছে, ৩) ধনসম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে, ৪) তা কিভাবে ব্যয় করেছে, ৫) সে দ্বীনের যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সেই অনুযায়ী আমল করেছে কি না ।

বর্তমানে যারা আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে কৃত্রিম সফলতা অর্জনের পথে যাবতীয় কিছু বিনিয়োগ করছে, তাদের অবস্থাও অনুরূপ । পরকাল হবে না এবং পৃথিবীর জীবনের কোনো কর্মের হিসাব কারো কাছে কখনোই দিতে হবে না । এই চিন্তা-বিশ্বাস অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করেছেন, বৈধ-অবৈধের কোনো সীমা এরা মানেনি । যে কোনো পথে ধনসম্পদ অর্জন ও ব্যয় করেছে, জীবন-যৌবনকে দ্বিধাহীনচিত্তে আকণ্ঠ ভোগ করেছে । এসব লোকই পরকালীন জীবনে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হবে ।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, প্রকৃতপক্ষে বড়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেসব লোক, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ সম্ভাবনাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে । (সূরা ইউনুস : ৪৫)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত হলো সেসব লোক, যারা আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হওয়ার খবরকে মিথ্যা মনে করেছে ।' (সূরা আনআ'ম : ৩১) আল্লাহ সুবহানা তায়ালার কাছে ঐ ব্যক্তিই সব থেকে সফলতা অর্জন করলো, যে ব্যক্তি তার গোটা জীবনকাল আপন স্রষ্টার অনুগত হয়ে নিজের জীবন পরিচালিত করলো ।

মোট কথা, পরকালে যারা সফলতা অর্জন করতে পারবে কেবলমাত্র তারাই সফল হবে আর পরকালে যারা ব্যর্থ হবে, তারাই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত এবং এটাই স্পষ্ট দেউলিয়াপনা ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'বলো প্রকৃত দেউলিয়া তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেকে এবং নিজের পরিবার, পরিজনকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ভালো করে শুনে নাও, এটিই হচ্ছে স্পষ্ট

দেউলিয়াপনা ।’ (সূরা আয্ যুমার : ১৫)

আবার শুধু আখিরাতের পিছনে ছুটে দুনিয়া পরিত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আবু বকর (রা:) বলেন, যারা আখেরাতের অন্বেষায় দুনিয়াকে একেবারে পরিত্যাগ করে বসে তারা সফলকাম নয়; বরং দুনিয়া ও আখিরাতে যারা সমভাবে অর্জন করতে সক্ষম হয় তারাই সর্বাপেক্ষা সফলকাম মানুষ।

ক্ষমা

আঁচলে মুখ চেপে কাঁদতে কাঁদতে বাবার বাড়ি যাচ্ছে সালমা। বাবার বাড়ির যাত্রাপথটা কত সুন্দর, সবুজ বিশাল মাঠ, সারি সারি ফসলের জমি, রাস্তার ধারে গা ছমছমে তেঁতুল গাছটা সবই সুন্দর। চোখ মুখে আনন্দের ছাপ আর বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বাপের বাড়ি যেত সালমা। কিন্তু আজ তার বুকটা গুমোট চাপা কষ্টের নিঃশ্বাসে ভরপুর। কষ্টের চেয়ে অস্থিরতাই বেশী কাজ করছে, সময় মতো পৌঁছাতে পারবে তো? তাকে যে কথাটা বলতেই হবে, সেই সময় পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকবেন তো? কথাটা না বলতে পারলে যে সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না। হায় ক্ষমা! কে চায় কার কাছে! মবিনের হাতের ছোঁয়া পেয়ে সালমার সম্বিৎ ফিরল।

‘চিন্তা কর না, আব্বা সুস্থ হয়ে যাবেন, শহর থেকে বড় ডাক্তার আনব আর আমরা তাকে ভালো অবস্থায় পাব।’

‘কত বছর পর যাচ্ছি বলো তো?’

‘হুম, তা প্রায় চার-পাঁচ বছর হবে মনে হয়।’

হাতের কড়ায় গুণতে থাকে সালমা, কত বছর হবে? চার বছর? না, তা প্রায় পাঁচ বছর হবে, ছোট ছেলেটা যেবার হলো, ঠিক তার আগের বছর, যে বছর আম্মা মারা গেলেন, আব্বা হজ্বে যাবার নিয়ত করলেন সেই বছর।

আম্মা মারা যাবার পর, হজ্বে যাবার আগে আব্বা সব সম্পদ ভাগ করতে চাইলেন। সালমারা চার বোন এক ভাই। আব্বা, বড় চাচা আর ভাই হেলাল মিলে কী সব যুক্তি বুদ্ধি করে সম্পদ ভাগ-বণ্টন করে। দলিলের খসড়া তৈরি করে চার মেয়ে আর জামাইদের ডাকে। সেবারই প্রথম ভাই হেলাল কে বোন আর বোন-জামাইদের খাতির-যত্ন করতে দেখেছিল। সব জামাইদের পছন্দের খাবার জোগাড় করেছিল, নতুন কাপড়-চোপড় কিনে এনেছিল, ভাগ্না-ভাগ্নিদের নতুন জামা-জুতা-সে এক এলাহী কাণ্ড, যেন বাড়িতে উৎসব লেগেছিল। ননদদের দেখলেই যার হাড় মড়মড় রোগ জেগে উঠে, ব্যথায় উঠতে বসতে পারে না, সেই ভাবিও ব্যথাহীন ফুরফুরে মেজাজে ঘুরে বেড়ায়, ছোট ননদের মাথায় তেল দিয়ে খোঁপা করে দেয়। রাতে ভোজ হয়, খাওয়া শেষে সবাই পান চিবোতে চিবোতে একত্রে বসে।

বড় চাচা প্রথম শুরু করলেন, 'তোমাদের আব্বা এবার হজ্বে যাবার চায়, যাবার আগে সব ভাগ বণ্টন করা ভালো, সারা জীবন ঐ আমার সাহায্য-পরামর্শ নিয়া চলছে। এবারো চাইল, আমি সাহায্য করলাম। ভাগ বণ্টন যেমনই হোক তোমরা খুশি মনে মাইনা নিও, কেউ ব্যাজার হইও না।'

ভাই হেলাল হালকা কাশি দিয়ে শুরু করে বললেন, 'ভাগা-ভাগিতে একটু উনিশ-বিশ হয়ই, এইটা মাইনা নিতেই হইব।'

ঘাড় ত্যাড়া মেজ জামাই এবার ভাইজানের কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন 'তা ভাইজান, উনিশ-বিশ হইতেই পারে। সব জমি তো আর সমান দামের নয়, দ্যাখেন খালি দশ-বিশ য্যান না হয়। এত কথা না বাড়িয়ে দলিলের খসড়াটা খুলেন, আমরা দেখি।'

খোলা মাত্রই শুরু হয় হইচই, চিৎকার চেঁচামেচি, আসলে দলিলের খসড়া হয় নি, দানপত্র সব রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে, মুসলিম আইন অনুযায়ী মেয়েদেরকে ছেলের অংশের অর্ধেক দেয়া হয়েছে, কিন্তু সব

ফাঁকিবাজি, যত নিচু আর কম মূল্যের জমি, নদীর ধারের অনাবাদী জমি মেয়েদেরকে দেয়া হয়েছে। উঁচু বসত ভিটা, উচ্চ ফলনশীল জমি, আমবাগান, রাস্তার ধারের জমি সব ছেলে হেলালের নামে দানপত্র করা হয়ে গেছে।

অবস্থা পড়ে যাওয়া বড় বোন শেফালী শুধু কেঁদে উঠে বলেছিল, 'অনেক আশা নিয়া আইছিলাম আব্বা, এইটা কেমন ইনসাফ হলো!'

সেই রাতেই মেজ জামাই আর বোন রাগ করে চলে গিয়েছিল। সালমার মুখচোরা ভদ্র জামাই অবশ্য সামনে রাগ দেখায় নি, নিজ বাড়িতে এসে ঠাণ্ডা মাথায় চিবিয়ে চিবিয়ে সালমা কে কথা শুনিয়েছিল, 'যে বাপ মেয়েকে ঠকাতে পারে, সে কোনো বাপই না, আর কোনো দিন বাপের নাম উচ্চারণ করবা না।'

সালমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল, আর কখনো অবশ্য সে তার বাবার কথা তোলে নি, কিন্তু তার বাবার কথা কেউ তাকে ভুলতে দেয় নি। শ্বশুরবাড়ির সবাই এটা নিয়ে উপহাস করা শুরু করেছিল, প্রথমে শাশুড়ি কথা শুনাত, তারপর জায়েরা, ননদেরা এমনকি ভাসুরের ছেলে মেয়েরাও তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত। আড়ালে তাকে 'বালুচরের রাণী' বলে ডাকত। সালমার কানে সবই যেত, আব্বার প্রতি ধিবকি ধিবকি ক্ষোভের আগুনটা জ্বলে উঠত, ক্ষোভটা কখন ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল সে টেরও পায় নি।

আব্বার অসুস্থতার কথা শুনে এতদিনের বরফ জমা সেই রাগ আর ক্ষোভ নিমিষেই গলতে শুরু করেছে। আব্বার পেট ফুলে গেছে, প্রস্রাব আটকে গেছে, খুব খারাপ অবস্থা, অনেক দিন ধরেই বিছানায় পড়া, তবুও কোনো মেয়েই তেমন দেখতে যায় নি। ছেলে আর ছেলের বউটাও তেমন দেখে না, তাদের অবস্থাও পড়ে গেছে। এখন দিন আনে দিন খায়। গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, ফলের বাগান আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, সব বিরানভূমি। বাপের বাড়ির সব খবরই তার কানে আসত, কিন্তু সে বিশ্বাস করতে পারত না। পাঁচ বছরে এত কিছু পাল্টে গেছে। যে বছর জমি ভাগ হয়, তার পরের বছর থেকেই নদীর গতিপথ একটু একটু করে পাল্টিয়েছিল। তার তিন বছর পর প্রলয়ংকারী ঝড় আর বন্যায় সব ভেসে যায়। সুন্দরী রুপসী নদী সেদিন রাক্ষুসী রূপ ধারণ করে, কী তার আক্রোশ, প্রতিশোধের নেশায় যেন মেতেছিল, এক রাতেই সব গ্রাস করে

নিয়েছিল। গঞ্জে একটা দোকান ছিল, সেটাও লস খেতে খেতে নাই হয়ে গেল। এখন শুধু ভিটে মাটি আর সামান্য কিছু জমি পড়ে আছে।

সালমা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। বাপ-ভাইয়ের দৈন্য দশা যেন চোখের সামনে দেখতে পায়।

'সালমা, আর কাঁদিও না, আব্বার চিকিৎসাতে যা লাগে আমি দেবো। বড় ডাক্তার আনব। তোমার আব্বাকে নিয়ে তোমাকে অনেক কথা শুনাইছি। আসলে আমারো লোভ ছিল। তোমার বাবার সম্পদে আমার বড্ড লোভ ছিল। তাই ওই রকম করছিলাম। তোমাকে আমি আব্বার কাছে যেতে না দিয়ে অন্যায় করছি। আমাকে মাফ করে দিও।'

সালমা এত কষ্টেও মৃদু হাসে, বিড়বিড় করে উঠে বলল, 'মাফ করব, কিন্তু মাফ করার সময় টুকু কি পাব?'

মবিন সালমার হাতটা আলতো করে ধরে বলল, 'এই তো, আমরা কাছাকাছি চলে আসছি, বড় বিলটা পার হলেই তোমাদের গ্রামটা, আন্ধার গ্রাম। কী বিদঘুটে নাম। কে এমন নাম রেখেছিল বলো তো? এত সুন্দর গ্রাম আর কী তার নাম! বিশাল বিল, কত আলো বাতাস! এর নাম হওয়া উচিৎ ছিল আলো গ্রাম, তাই না?'

মবিন একাই বকবক করে যাচ্ছে, সালমা যে তার স্মৃতির জলে ডুব দিয়েছে তা সে টেরও পায় না। এই বিলের গল্প শুনত আব্বার মুখে। বিলের ধারে একসারিতে তিনটা পুরাতন গাছ আছে। আব্বা যেদিন গঞ্জে যেত, রাত হয়ে যেত। ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে ফিরতেন। এই তিন গাছের সারি তিনি দৌড়ে পার হতেন। ওখানে নাকি ভুত-প্রেত বাস করে। আব্বার জানের দোস্ত করিম ব্যাপারী একদিন মিস্টি নিয়ে ফিরছিলেন। তখন সন্ধ্যে বেলা, জন মানবহীন বিলের ধার ঘেষে তিনি গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিলেন, পরের দিন শ্বশুর বাড়ি যাবেন মিস্টি নিয়ে। কারা যেন নাকি সুরে মিস্টির হাঁড়িটা চেয়েছিল। তিনি দিতে রাজি না হওয়ায় পরের দিন সকালে তার লাশ ভেসে উঠেছিল এই বিলের মাঝখানটায়। আরও কত গল্প ছড়িয়ে ছিল এই রহস্যময় বিল আর তিন গাছের সারি নিয়ে। কুপির আলোয় আব্বা ভাত খেতে খেতে সেই সব গল্প বলতেন।

প্রচণ্ড ভিতু ছিলাম, তাই সবসময় আব্বার গাঁ ঘেষে বসতাম। গরম ভাতের ধোঁয়া, কুপির কালচে ধোঁয়া আর আলো আধারিময় পরিবেশে এইরকম গল্প শুনে গা ছমছম করে উঠত। তবুও আব্বার মুখের সেই গল্প গুলো শুনতে ভালো লাগত। গল্প শেষে আমার ভয়ার্ত মুখ টা দেখে তিনি হেসে উঠতেন। তিনি খুব হাসি খুশী মানুষ ছিলেন। কখনো মুখ ভার করতে দেখি নি। একবার শুধু তাকে কাঁদতে দেখেছিলাম। দাদি মারা যাবার পর বড় চাচা কে জড়িয়ে ধরে বাচ্চাদের মতো কেঁদেছিলেন। ওটাই শেষ কান্না। আর কখনো তাকে কাঁদতে দেখিনি।

এখন নাকি আব্বার কান্না বাতাসে ভেসে বেড়ায়। রাত গভীর হলে সেই হুহু কান্নার ধ্বণি নাকি শোনা যায়। গ্রামের অনেক মানুষই শুনতে পায়। কেউ কেউ বলে রোগের তাড়নায় নাকি এভাবে কাঁদে আবার অনেকেই ফিসফিস করে বলে এটা নাকি নিজ কন্যাদের ঠকানোর যাতনার কান্না, অপরাধের কান্না, ক্ষমা চাওয়ার কান্না।

‘ক্ষমা, হায় ক্ষমা, সময় কি পাব?’ সালমা বিড়বিড় করে। গাড়িটা বাবার বাড়ির কাছে এগুচ্ছে। অনেক মানুষের ভিড় দেখে সালমার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠে। সালমা প্রার্থনা করতে থাকে ‘হে প্রভু, আব্বাকে একটু বাঁচিয়ে রাখ, তার মায়াবতী কন্যা যে তাকে ক্ষমা করেছে তা জানানোর সময়টুকু পর্যন্ত তাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখ।’

টিকাঃ ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালা হলেন গাফুরুর রহিম। আল্লাহ্ সুবহানা তায়ালার ভালোবাসা, করুণা ও ক্ষমা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত এসেছে। সুরা আন্ নিসার ১৪৯ নম্বর আয়াতে ক্ষমার ব্যাপারে বলা হয়েছে, ‘তোমরা যদি কল্যাণ কর প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে অথবা যদি

তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও তবে জেনে রাখ আল্লাহ নিজেও ক্ষমাশীল, মহাশক্তিমান ।'

রসুলুল্লাহ(সাঃ) এর অনেক হাদিস রয়েছে। তিনি মুসলমানদের যেসব মোনাজাত শিখিয়েছেন তার একটিতে বলেছেন, 'হে আল্লাহ্, আপনি সবচেয়ে বেশি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা করুন ।'

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ক্ষমাশীলতার ভিত্তিতে গড়ে তোলা প্রয়োজন। যারা আমাদের প্রতি অন্যায় করে, তাদের আমরা ক্ষমা না করা পর্যন্ত আমরা আল্লাহর তরফ থেকে ক্ষমা লাভের প্রত্যাশা করতে পারি না । পরস্পরকে ক্ষমা করে দেয়া, এমন কি শত্রুকে পর্যন্ত ক্ষমা করা হলো ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলোর একটি ।